শিরোনাম ঃ দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

GIFT

এম.ফিল.ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401843

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401843

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম
এম. ফিল.গবেষক
রেজি ঃ ১৬৭/১৯৯৫-৯৬
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৪

শিরোনাম ঃ দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম
এম. ফিল.গবেষক

401843

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

401843

আমার পরম শ্রদ্ধাষ্পদ মরহুম
পিতা-মাতার রূহের মাগফিরাত কামনায় .....

Dhaka University Institutional Repository

DR. A. F. M. ABU BAKAR SIDDIQUE
M. A., Ph. D., M. M.
CHAIRMAN

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 868803 (Res.)
9661900/ 4290 (Off.)

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক, নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে কোনো ভাষায় এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি। এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ব্যতিক্রম ও তথ্যবহুল। এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষকের এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

৩০.১২.০৪

(ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক)
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

হি. = হিজরি

খৃ. = খৃষ্টাব্দ

(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বি: দ্র: = বিস্তারিত দ্রষ্টব্য

দ্র: = দ্রষ্টব্য

প. দ্র. = পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য

ড. = ডক্টর, Ph. D.

মৃ. = মৃত, মৃত্যু

(রা) = রাদিআল্লাহু আনহু

(র) = রহমাতুল্লাহি আলায়হি

পৃ. = পৃষ্ঠা

সং = সংস্করণ

সম্পা. = সম্পাদিত

প্রাগুক্ত = পূর্বোল্লিখিত

জ. = জন্ম

ইং = ইংরেজি

খ. = খণ্ড

অনূ.= অনূদিত

তা. বি. = তারিখ বিহীন

Ed. = সম্পাদক অথবা সম্পাদিত

P. = পৃষ্ঠা,

Vol. = খণ্ড,

N. B. = বি : দ্র:

ঢা: বি: = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫ : ৫ = প্রথম সংখ্যা সূরার, ২য় সংখ্যা আয়াতের।

ই ফা বা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্য-অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবন যাপন করছে। দরিদ্রতার এ সুযোগে ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলিম জাতির উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। এমনকি তারা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত ও বিভ্রান্ত করছে। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

« اَلشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ج والله يعدكم مغفرة منه و فضلا ط والله واسع عليم »

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (স) একই সাথে কুফ্‌রী ও দরিদ্র্যতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন । তিনি বলেছেন:

"اللهم اني اعو ذ بك من الكفر والفقر"

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কুফ্‌রী ও দরিদ্র্যতা থেকে আশ্রয় চাই।"[২]

মহান রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণ করে তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

« ومامن دابة في الا رض الاعلي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ط كل في كتب مبين »

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"[৩]

---

১. আল- কুরআন, ২ ঃ ২৬৮।

২. সুলায়মান ইবনে আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি: সুনান আবি দাউদ (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী) কিতাবুল আদাব, বাব-মাইয়াকূলু ইযা আসবাহা,২.খ, তা.বি,পৃ. ৬৯৪।

৩. আল-কুরআন,১১ ঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন ঃ

«هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فا مشوا في منا كبها وكلو امن رزقه ط واليه النشور »

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"[১]

আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক তাঁরই বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। পৃথিবীর সকল সম্পদই আল্লাহ্‌র দান এবং তিনি সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«هوالذي خلق لكم ما في الارض جميعا»

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদে জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[২]

তিনি আরও বলেন ঃ

«كي لا يكون دولة بين الا غنياء منكم»

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।"[৩]

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হলো 'যাকাত'। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। একে ইসলমী অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় ও তা যথাযথ ভাবে বণ্টন করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط ولله عا قبة الامور »

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখ্‌তিয়ারে।"[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৬৭ ঃ ১৫।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৯।

৩. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৭।

৪. আল-কুরআন, ২২ ঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন ঃ

« خذ من اموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها »

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবেন,এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।"[১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

"اعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم فترد علي فقراء هم"

"তাদের জানিয়ে দাও ,আল্লাহ্ তাদের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"[২]

দারিদ্র্য বিমোচনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আদর্শে সুদভিত্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যেই এ ধরণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। মানব রচিত এ সকল অর্থব্যবস্থায় দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েই চলছে এবং ধনী হচ্ছে আরও ধনী। ফলে সন্ত্রাস-দর্নীতি, রাহাজানি-ছিনতাই, হত্যা-অপহরণ, নির্যাতন, ভিক্ষাবৃত্তি, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমাজ জীবনকে করে তুলছে দুর্বিষহ। এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এই গবেষণাপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র,অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের অন্যতম মৌল স্তম্ভ 'যাকাতের' ভূমিকা তুলে ধরা। দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত আদায় করে তা পরিকল্পিতভাবে বণ্টন করা হলে বেকার সমস্যার সমাধান, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ, সম্পদের সুষম বণ্টন, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আমি অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোকপাত করেছি।

প্রথম অধ্যায়কে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ, দারিদ্র্যের শ্রেণী বিভাগ, দারিদ্র্য রেখা, মানবউন্নয়ন সূচক, মানবউন্নয়নের হিসাব-নিকাশপত্র সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। ২য় পরিচ্ছেদে কুরআন ও হাদীসের আলোকে দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ৩য় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশসহ বিশ্ব-দারিদ্র্য পরিস্থিতি,গ্রাম ও নগর- দারিদ্র্যের প্রবণতা (সারণীসহ) এবং দারিদ্র্যের মাত্রা আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত ধারা ও কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। ৫ম পরিচ্ছেদে মানব সম্পদ, মানব উন্নয়ন,মানব উন্নয়নে শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণ,

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল: সহীহ আল-বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত), ১.খ,তা.বি,পৃ.১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান, জন-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে যাকাতের পরিচয়,ইসলামী শরী'আতে যাকাতের অবস্থান, যাকাত ভিত্তিক সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের করণীয় সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ২য় পরিচ্ছেদে আল-কুরআনে যাকাত প্রসঙ্গ, ৩য় পরিচ্ছেদে আল-হাদীসে যাকাত এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদে আল-কুরআনের আলোকে বিভিন্ন নবী ও রাসূলের শরী'আতে যাকাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়কেও চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে বিশেষ করে যাকাত আদায় ও তা বণ্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় পরিচ্ছেদে যাকাতের উৎস, নিসাব ও 'উশর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় পরিচ্ছেদে যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ ব্যয় ও বণ্টন করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের আটটি খাত সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত, দরিদ্রকে কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ২য় পরিচ্ছেদে যাকাত হিসাব করার অনুসরণীয় পন্থা, যাকাতের সম্পদ পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ৩য় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদে মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশে যাকাত আদায় ও বণ্টনব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়কেও চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, ২য় পরিচ্ছেদে মানব কল্যাণ ও যাকাত , ৩য় পরিচ্ছেদে সমাজ উন্নয়নে যাকাতের অবদান , ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব ও ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ করে এর মোকাবিলায় আল-কুরআনে বর্ণিত, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রদর্শিত, সমাজের বিত্তহীন দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সুফল সাবলীল ভাষায় আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করতে পেরে মহান রাব্বুল আ'লামীনের শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি। দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান আবু দাউদ,সুনান ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ শরীফের অন্যতম সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমির সম্মানিত সদস্য, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আধ্যাত্মিক সাধক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম.আবু বকর সিদ্দীক। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে যে নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের প্রফেসর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া- এর সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান আমার গবেষণার বিষয়টি নির্বাচনে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার বিভাগীয় সকল শিক্ষক মহোদয়কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার মুহাম্মাদ সাঈদুল হক, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড.মু. নজরুল ইসলাম খান আল মারুফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক মোহাম্মদ আতীকুর রহমান প্রমুখের পরামর্শ ও উৎসাহ সত্যিই আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে আমি এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, আল- আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় এবং আমার জীবন চলার পথে যাঁরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন আমার মেঝ মামা মওলানা আবদুস সালাম, বড় ভাই মো: জাকির হোসেন, বি. এম. উমার ফারুক নেছারী, মাওলানা এম.এ.মান্নান, সরকার আসাদুল্লাহ মাহমুদ, গাজী আবুল হোসেন, নেয়াজ আহমেদ খান, শামীম আহমেদ খান, মাহবুবুল আলম, হাবিবুর রহমান, এম. হুমায়ুন কবীর, মোঃ ইকবাল হোসাইন ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব নূর মোহাম্মাদ মিয়া। এছাড়াও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের প্রকাশনা কর্মকর্তা লেখক গবেষক ও সফল অনুবাদক আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসাকে । তাঁর ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষে দু:সাধ্য।

গবেষণা কাজ শুরু করার পর আমার আব্বা ও আম্মা এবং ভাগিনা মো: কাওসার ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে চলে যান, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। পরিশেষে যারা সার্বক্ষণিক আমাকে সঙ্গ দিয়ে উদ্দীপ্ত রেখেছে তারা হলো আমার সহধর্মিনীরেশমা বেগম এবং কন্যাদ্বয় তাসমিয়া ও মুনতাহা, এদেরকেও স্মরণ করছি।

যাদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আমি সহযোগিতা নিয়েছি, তথ্য সংযোজন করেছি, রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছি তাঁদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

৩০/১২/২০০৪

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম

Dhaka University Institutional Repository

সূচি বিন্যাস

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায় ঃ দারিদ্র্য পরিচিতি ও বর্তমান পরিস্থিতি ২-৫৩

পরিচ্ছেদ ১ ঃ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ
পরিচ্ছেদ ২ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ বিশ্ব-দারিদ্র্য পরিস্থিতি
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত ধারা
পরিচ্ছেদ ৫ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যাকাতের পরিচয় ও বিকাশধারা ৫৪-৭৫

পরিচ্ছেদ ১ ঃ যাকাতের পরিচয়
পরিচ্ছেদ ২ ঃ আল-কুরআনে যাকাত প্রসঙ্গ
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ আল-হাদীসে যাকাত প্রসঙ্গ
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ যাকাতের বিকাশধারা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ যাকাত আদায় ও বণ্টননীতি ৭৬-১০৭

পরিচ্ছেদ ১ ঃ যাকাত আদায়
পরিচ্ছেদ ২ ঃ যাকাতের উৎস
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ যাকাত বণ্টননীতি
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ যাকাত ও কর।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও যাকাত ১০৮-১৫৯

পরিচ্ছেদ ১ ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত
পরিচ্ছেদ ২ ঃ যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ বাংলাদেশে যাকাতের ব্যবহার
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ মুসলিম বিশ্বে যাকাতের ব্যবহার

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত ১৬০-১৮৬

পরিচ্ছেদ ১ ঃ যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন
পরিচ্ছেদ ২ ঃ মানব কল্যাণ ও যাকাত
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ সমাজ উন্নয়নে যাকাতের অবদান
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ সুদের বিলোপ সাধন ও যাকাত ভিত্তিক সমৃদ্ধি অর্জন

উপসংহার ঃ ১৮৭-১৯১

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১৯২-২০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দারিদ্র্য পরিচিতি ও বর্তমান পরিস্থিতি

পরিচ্ছেদ ঃ ১

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ

দারিদ্র্য/দারিদ্র একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। তাই দারিদ্র্যের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া দুরূহ ব্যাপার। দারিদ্র্যের চিরন্তন অথবা সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা নাই। তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ন্যূনতম পর্যায়ের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ন্যূনতম পর্যায়ে এসব মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিই সাধারণত দরিদ্র হিসাবে পরিচিত।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ

দারিদ্র্যের শাব্দিক অর্থ হল, দরিদ্র অবস্থা, অভাব-অনটন, দীনতা, দরিদ্র হওয়া, অভাবগ্রস্ত হওয়া, গরীব হওয়া, দৈন্য দশা, নির্ধনতা বা সম্পদহীনতা ইত্যাদি।[১]

সনাতন অর্থনীতিতে দারিদ্র্যের অর্থ হলো- বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর অভাব। সাধারণভাবে দারিদ্র্য বলতে সেই অবস্থাকেই বোঝায় যেখানে শুধু অব্যাহতভাবে বেঁচে থাকাই নয়, বরং স্বাস্থ্যবান ও উৎপাদনক্ষম জীবন যাপন করার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সহায়-সম্পদের অভাব বিদ্যমান। এতে 'আপেক্ষিক' ও 'চরম' এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। চরম দারিদ্র্য বলতে দারিদ্র্যের ঐ স্তর বা পর্বকে বোঝায় যেখানে মানুষ জীবন যাপনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। পক্ষান্তরে আপেক্ষিক দারিদ্র্য ঐ অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন অন্যজনের তুলনায় দরিদ্র। শেষোক্ত ধরনের দারিদ্র্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশ গুলোতেও বিদ্যমান। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, কোন ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপেক্ষিকভাবে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের মতো কোন দেশে সেইএকই ব্যক্তি যথেষ্ট ধনী বলে বিবেচিত হতে পারে। ইসলামী অর্থনীতি এই দুই ধরনের দারিদ্র্যকেই স্বীকার করে, তবে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণকেই অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু শ্রম বাজারে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে অথবা উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যে দারিদ্র্য উদ্ভূত হয় ইসলাম সেই দারিদ্র্যকে স্বীকার করে না।[২]

অতএব, দারিদ্র্যকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) অনপেক্ষ বা নিরংকুশ দারিদ্র্য ও (খ) আপেক্ষিক দারিদ্র্য।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ : ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃ. ৬০০ ; সম্পাদনা পরিষদ : সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০২, পৃ. ২৮।

২. এম.এ. হামিদ : ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী), খৃ.১৯৯৯, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) **অনপেক্ষ দারিদ্র্য ঃ** প্রতিদিন মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের এ শ্রেণীবিভাগ।[১] অনপেক্ষ দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা সেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো ও সম্ভব হয় না।

(খ) **আপেক্ষিক দারিদ্র্য ঃ** আপেক্ষিক দারিদ্র্য একটি অর্থনীতির আয় বণ্টনের বৈষম্যের প্রকৃতি। নিরংকুশ অর্থে দরিদ্র নয় কিন্তু প্রতিবেশী বা অন্যের তুলনায় দরিদ্র অবস্থাই হলো আপেক্ষিক দারিদ্র্য। জাতীয় আয় সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত না হওয়া আপেক্ষিক দারিদ্র্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। একটি দেশের আয় বণ্টন ব্যবস্থার উপর আপেক্ষিক দারিদ্র্যের দূরত্ব নির্ভরশীল। আয় বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কারণ বাস্তবে সকল দরিদ্র মানুষ একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যের শিকার হয়নি।

(১) **দীর্ঘকালীন দরিদ্র ঃ** যারা দীর্ঘ সময় ধরে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং নানাধরনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়ে দারিদ্র্যের অভিশাপে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে,তারাই দীর্ঘকালীন দরিদ্র। এরা একটি সমাজের সর্বনিম্নে অবস্থান করে।

(২) **প্রান্তিক দরিদ্র ঃ** বছরের বিভিন্ন সময়ে লাভজনক মৌসুম না থাকার কারণে যারা কর্মহীন হয়ে অভাব-অনটনের স্বীকার হয় তাদেরকেই প্রান্তিক দরিদ্র বলা হয়।

(৩) **নব পর্যায়ের দরিদ্র ঃ** বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে যেসব সরকারী কর্মচারী ও শ্রমিক চাকরিচ্যুতির মাধ্যমে অথবা অবসর গ্রহণের কারণে অথবা কর্মসংস্থানের অভাবে পূর্বের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে চলে যায়, তারাই হল নবপর্যায়ের দরিদ্র।[২]

অতএব বলা যায়, দরিদ্রতা একটি সামাজিক ব্যাধি। দারিদ্র্যর কষাঘাত ও ক্ষুধার নির্মম যাতনা মানুষকে যে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। দারিদ্র্যপূর্ণ সমাজে মানবতাবোধ লোপ পায়। হিংস্র আচরণ প্রসার লাভ করে। অন্যায় ও অনিয়ম বিস্তৃত হয়। কলিজার টুকরা সন্তানও মানুষ বিক্রয় করে, এমনকি হত্যা পর্যন্তও করতে দ্বিধা করে না এই নির্মম দারিদ্র্যের কঠোর যন্ত্রণার কারণে। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ জড়িয়ে যায় অসংখ্য অপকর্মের বেড়াজালে। এ কারণে মানুষ অনেক সময় তার আক্বীদা-বিশ্বাসও বিসর্জন দিয়ে বসে। দারিদ্র্যের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধর্মীরা মুসলমানদেরক ধর্মান্তরিত করতেও সক্ষম হচ্ছে। কাজেই দারিদ্র্যতা দেশ ও জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ।

---

১. প্রতিদিন মাথাপিছু ২২০০ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসাবে, যা দারিদ্র্য সীমার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮৫০ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হলো 'চরম দারিদ্র্য' সীমা। অবশ্য এ হিসাব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং সময়ের পরিবর্তনে এ পরিসংখ্যান পরিবর্তনশীল। (বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০১, পৃ. ১০৬)।

২. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯২, পৃ. ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

ত জীবন মানের একটি বিশেষ অবস্থা। সাধারণত দারিদ্র্য বলতে জীবনের হয়, যে অবস্থায় একটি মানুষ, পরিবার, সমাজ বা গোষ্ঠী তার/তাদের জীবন জন বা চাহিদাগুলো পূরণে অক্ষম। জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে মাণে খাদ্য, নিরাপদ পানীয়, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, মাথা গোজার মত বাসস্থান, ক্ষা গ্রহণের সক্ষমতা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় র বৈষম্য হ্রাস, আত্মমর্যদাবোধ, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বোঝায়। তবে ানের মধ্যে আয় ও কর্মসংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা বা উপকরণসমূহ নিশ্চিত করার জন্য একটি মিত আয়ের সংস্থান থাকা দরকার। যেমন, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি রাপেট খাদ্য, শরীর ঢাকার মত বস্ত্র, থাকার মত ঘর, অসুখে চিকিৎসা এবং ত করার জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক স্থিতিশীল একটি আয় ানে বিভিন্ন গবেষণা মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, একজন পরিপূর্ণ সুস্থ বাংলাদেশীর ক্যালোরী পরিমাণ ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু জনসংখ্যার প্রায় এই নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এই ২১২২কিলো ন্যান্য খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় যা বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, বিনোদন, সামাজিকতা রচ হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য বহির্ভূত সেবা ও সামগ্রিক অর্থমূল্য সাথে অতিরিক্ত ২৫% মূল্য সংযোজন করে উচ্চ ও নিম্ন দু'টি দারিদ্র্য রেখার হয়। এভাবে উচ্চ দারিদ্র্য সীমার ভোগব্যয় মাথাপিছু ১৯৯৬ সালে বাৎসরিক নিম্ন দারিদ্র্য সীমার ভোগব্যয় দাঁড়ায় ৫,২৮৯ টাকা। এভাবে গড়ে ৫ রিবারের ভোগব্যয় বছরে ৩৪,৪৮০ টাকায় এসে ঠেকে। তাই একটি পরিবার বা সামগ্রী পুরো বছর ধরে ভোগ করতে অসমর্থ হয় তা'হলে সেই পরিবার নবাস করছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।[১]

দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসের সূচনাতে হলেও দারিদ্র্যের প্রচলিত পদ্ধতিতে এখনও বেশ কিছু অসঙ্গতি এবং অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। অবশ্য াচীন হলেও দারিদ্র্য পমিাপের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক পরে। সংজ্ঞা ও দ্বিধা ও দ্বিমতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে দরিদ্র বাস্তব প্রতিফলন ঘটেনি।

ত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে 'একটি বঞ্চনার টি সামাজিক ধারণা যা কাল ও স্থান ভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে র সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি ষ্ট শ্রেণীর মানদণ্ডে নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

দ : পানি সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা) খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসাবে গণ্য করা যায়। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থ্যের প্রতিফলন। সাধারণত এই সীমিত সামর্থ্যের বহিপ্রকাশ হিসাবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মতো ক্রয় ক্ষমতার অভাবকে। অবশ্য এক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়।

প্রথমত, মৌলিক চাহিদা কি এবং এর উপাদানগুলোই বা কি। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। বিশেষত এই ন্যূনতম মান স্থির নয় এবং স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন একটি সামগ্রী কোন দেশে সৌখিন দ্রব্য বিবেচিত হতে পারে যা অন্য দেশে অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নির্ধারণে একটি অংশ আপেক্ষিক এবং দেশ বা কালভেদে পরিবর্তিত হয়। অপর অংশ যা মৌলিক চাহিদা নির্ধারণ করে (যেমন খাদ্য) তা অনেকাংশে অপরিবর্তনশীল। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক চরম দারিদ্র্যের ধারণাই প্রযোজ্য। এই ধারণাকে বাস্তবে ক্রিয়াশীল করার জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে দারিদ্র্য রেখা।[১]

দারিদ্র্য রেখা একটি সমাজের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে। বস্তুত এই রেখার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয় যার একাংশ গরীব এবং অপর অংশ গরীব নয়। যখন কোন ব্যক্তি গরীব বলে চিহ্নিত হয় তার অর্থ হচ্ছে, তার জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্য রেখা দ্বারা নির্দেশিত ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে কম।

দারিদ্র্য রেখার উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যায়, এই রেখা দু'টি ধারণার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ঃ (ক) জীবনযাত্রার মান এবং (খ) এই মানের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য স্তর। যেহেতু জীবনযাত্রার মানের বহুমাত্রিক নির্ধারক রয়েছে, তাই দারিদ্র্য রেখার জন্য এই প্রতিটি নির্ধারকের একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমারেখা প্রয়োজন। এই নির্ধারকগুলোর প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি। নীতিগতভাবে যদি কোন ব্যক্তি (বা পরিবার) এই মৌলিক চাহিদাগুলোর যে কোন একটির ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তবে তাকে দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রয়োগিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদার এই বহুমাত্রিক ধারণা বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। মৌলিক চাহিদার যে কোন একটি নিয়ামকের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর অক্ষমতা আয় স্বল্পতা বা দারিদ্র্য ছাড়াও ব্যক্তির রুচি বা পছন্দক্রমের তারতম্যের কারণে ঘটতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একজন ধনী ব্যক্তিও গরীব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তার অস্বাভাবিক পছন্দক্রমের কারণে, আয়স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট বঞ্চনার কারণে নয়। এই ধরনের জটিলতা এড়িয়ে দারিদ্র্য রেখা নির্ধারণ সহজবোধ্য করার জন্য একমাত্রিক নির্দেশকের ব্যবহার বেশী প্রচলিত।[২]

---

১. মোস্তফা কামাল মুজেরী : দারিদ্র্যের পরিমাণ পদ্ধতি ও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রবণতা (দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস., ঢাকা), খৃ. ২০০৪, পৃ. ৬৮।

২. মোস্তফা কামাল মুজেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিষয়ক গবেষণাতে যে দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে শুধু জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাকে ধরা হয়েছে। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য শুধু এসব চাহিদা পূরণ নয়। মানুষের সামাজিক জীবনে আরও অনেক কিছু প্রয়োজন, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ মোকাবিলা, খেলাধুলা, বার্ধক্যে ব্যয় সংকুলান, জরুরী সামাজিক প্রয়োজন ইত্যাদি।

দারিদ্র্য রেখাকে 'মানবিক দারিদ্র্য রেখা' বা 'কার্যকর দারিদ্র্য রেখা'তে পরিণত করতে হলে তা কোথায় থামবে এবং তার মধ্যে গুণগত কিছু বিষয়, যেমন সম্মান, নেতৃত্বের সুযোগ ইত্যাদি আসবে কিনা তাও ভাবতে হবে। শুধু আয় দারিদ্র্য রেখাটি এভাবে দেখা যেতে পারে যে, এটা সময়ের সাথে পরিস্থিতির পরিবর্তন বিধৃত করতে সাহায্য করবে। আরও যত ব্যয় তাতে যোগ করা হবে, দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা ও অনুপাত তত বেশি হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে আত্মশক্তির বিকাশ। একজন দরিদ্র ব্যক্তি কোনমতে দারিদ্র্য সীমার আয়ের উপরে উঠতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তা নয়। দারিদ্র্যের জন্য তার পক্ষে আত্মশক্তির বিকাশে যে বাধা ছিল তা থেকে মুক্তি লাভ করে সে নিজের এবং দেশ ও জাতির অধিকতর কল্যাণ করতে সক্ষম হবে।[১]

সব দরিদ্ররা আবার সমান নয়। কিছু কিছু দরিদ্র চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং তাদের আয় দারিদ্র্য সীমারেখার কাছাকাছি আয় থেকেও অনেক নিচে। তার উপর রয়েছে আবার অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা। এভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ শতাংশ চরম দারিদ্র্যের শিকার। এই অতি দরিদ্র শ্রেণীতে মহিলা, অনাথ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, রুগ্ন ও কর্মহীন লোকজন রয়েছে।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, দারিদ্র্যের বিভিন্ন রকমের প্রকারভেদ রয়েছে। দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করলে একদিকে দেখা যাবে গ্রামের প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ পরিবারই দরিদ্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান সময়ে অঞ্চল নির্বিশেষে শুধুমাত্র ৫ একর চাষের জমির উৎপাদন ভোগ করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার খুব সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। তাছাড়া গ্রামে যেহেতু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, টেলিফোনসহ অন্যান্য অনেক আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে তাই শহরের একজন মধ্যম আয়ের চাকরিজীবির তুলনায়, এমনকি অনেক নিম্ন আয়ের চাকুরিজীবির তুলনায়ও গ্রামে বসবাসকারী আমাদের অনেকের ভাষায় সচ্ছল মানুষটির জীবনমান অনেক নিম্ন স্তরে। তাই বলা যায়, ঐ পাঁচ একর জমির মালিকও এক অর্থে দরিদ্র। কিন্তু ঐ গ্রামের মাঝারী কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীনের তুলনায় নিশ্চয়ই বড় কৃষকটি ধনী। একইভাবে পুরুষ প্রধান একটি মাঝারি কৃষক পরিবারের তুলনায় একই পরিমাণ জমি নিয়েও একটি মহিলা প্রধান পরিবার অপেক্ষাকৃত গরীব। কোন জমির মালিক না হয়েও সক্ষম দু'টি পুত্র সন্তানসহ (যাদের গ্রামে মজুর খাটার সামর্থ্য আছে) একটি ভূমিহীন পরিবার অনেক প্রান্তিক চাষী পরিবার থেকে ভাল থাকতে পারে। তাই দারিদ্র্যকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় ঃ

---

১. রুশিদান ইসলাম : দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক এবং প্রাসঙ্গিক চিন্তাধারা (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা), একবিংশতিতম খণ্ড, খৃ. ২০০৪, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) অতি দরিদ্র/অসহনীয় ও মানবেতর পর্যায় মহিলা প্রধান দরিদ্র পরিবার/ভাসমান/ভবঘুরে/নিঃস্ব।

(খ) পরিষ্কারভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবারসমূহ।

(গ) দারিদ্র্য সীমার সামান্য উপরে কিন্তু সে ঝুঁকির মধ্যে আছ/আবার নিচে নেমেও যেতে পারে।

অতি দরিদ্র জনগণ খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সব সময় একমাত্র নিজের আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। সামাজিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, বহু দিনের আচার-অভ্যাস, প্রথা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বা ঢাল হতে পারে। যেমন গ্রামে যদি মুক্ত জলাশয়, পতিত জমি, বনভূমি ইত্যাদি থাকে, গরীব মানুষ সেসব সম্পদের ব্যবহার করে জীবনযাত্রার কিছু প্রয়োজন মিটাতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্মও তাদের অনেক সময় সহায়তা করে থাকে। যেমন মুসলিম সমাজ যাকাত, ফিৎরা, সাদাকাহ্, মিলাদ, জিয়াফত, ঈদুল-আজহার পশু কুরবানী ইত্যাদি মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের কাছে সরাসরি কিছু সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সরকারী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে দিতে পারলেও দরিদ্রদের সুরক্ষার জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা যায়। সর্বোপরি দরিদ্রদের সংগঠিত করে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তাতে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি হতে পারে।[১]

দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তার বেঁচে থাকার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ইংরেজীতে তাকে বলা হয় A situation of Deprivation. ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা, যার ফলে মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অনটন থাকে। অন্য কথায়, দারিদ্র্য এমন ধরনের জীবন যাপন যা কোন সুস্থ্য গ্রাসাচ্ছদনের পর্যায়ে পড়ে না। এটা ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যেখানে শুধু অব্যাহতভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নয়, বরং সুস্থ ও উৎপাদনমুখী অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদের অভাব রয়েছে।[২]

পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীসে দারিদ্র্যকে দু'টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো কঠিন বা চরম দারিদ্র্যসীমা (Hard Core Poverty) যার মধ্যে পড়ে 'ফকীর' ও 'মিসকীন'। ফকীর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নাই, যারা সর্বতোভাবে নিঃস্ব, পথের ভিখারী, তারাই 'ফকীর', অন্যথায় 'ফকীর' বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নাই। 'মিসকীন' হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌঁছেনি, তবে আশু ব্যবস্থা নেয়া না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব

১. ড. তোফায়েল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫।

২. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম : দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হবে না। মিসকীনদের আত্মমর্যাদা ও কৌলিণ্যবোধ তাদের রাস্তায় নামতে দেয় না, দেয় না কোথাও হাত পাততে।[১]

রাসূলুল্লাহ (স) মিসকীনের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন : "যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দুই-এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দুই-একটা খেজুর পেয়ে ফিরে আসে সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নাই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে, অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করবে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।[২]

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী (স:) মিসকীনদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন :

১. যার সম্পদশালী হওয়ার মত কোন অবস্থা নেই;

২.তার দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটে না;

৩.সে মুখ খুলে বা হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফিরা, করতে পারে না; যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে; তুমি তাদেরকে লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।"[৩]

উপরোক্ত আয়াতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট। তা হলো :

(ক) তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা এই যে, অজ্ঞরা তাদের সম্পদশালী বলেই জানে।

(খ) তাদের মুখমণ্ডল বা অবয়ব দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করা যায়।

(গ) তারা মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চায় না। অর্থাৎ যাদের কাজের ক্ষমতা থাকা সত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হয়। শত চেষ্টা করেও কাজ মিলছে না। এক কথায় একেবারেই বেকার যারা তারাও মিসকীন, সমাজের ঐসব লোক যাদের অবস্থা কিছু দিন আগেও ভাল ছিল হঠাৎ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বর্তমানে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। পূর্বে তারা যত বিত্তবানই থাকুক না কেন, আজ মিসকীনদের কাতারে নেমে এসেছে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন : আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা), খৃ. ২০০৪, পৃ. ৬০।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল : সহীহ আল-বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী),কিতাবুয যাকাত, বাব-লা ইয়াস্আলুনান্ নাসা ইলহাফা, ১.খ, পৃ. ১৯৯।

৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ দারিদ্র্য (General poverty), ইসলামের বিধান মোতাবিক যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নাই অর্থাৎ যিনি যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের মালিক নন তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হল এমন অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম। ইমাম শাতিবী ও ইমাম গাযালী (র) মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যাস করেছেন ঃ

(ক) জরুরীয়াত (Basic needs)

(খ) হাজিয়াত (Comforts)

(গ) তাহ্সিনিয়াত (Beautification)

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন ৬টি যেমন ঃ

১. **আক্বীদা /দ্বীন ঃ** ঈমান, দ্বীন, আদর্শ

২. **নফস ঃ** অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি।

৩. **নসল ঃ** পরিবার গঠনের ক্ষমতা

৪. **আকল ঃ** শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫. **মাল ঃ** ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ

৬. **হুররিয়াত ঃ** স্বাধীনতা[১]

দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন সূচক

১৯৯০ সাল থেকে 'ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ.এন.ডি.পি.)' প্রতি বছর 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (সংক্ষেপে ইউ.এন.ডি.পি'র এইচ. ডি. রিপোর্ট) প্রকাশ করছে। এই রিপোর্টে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থা বা গুণাগুণ সম্বন্ধে এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে বহু তথ্য ও মন্তব্য পাওয়া যায়।

মানব উন্নয়নের মাত্রা (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স) বিচার করে ইউ. এন. ডি.পি. সূচক নির্ধারণ করেছে। সেই সূচকের ভিত্তিতে গুণানুসারে ১৭৫টি দেশকে এরা একটি তালিকায় বিন্যস্ত করেছে। ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৪৪ নম্বরে। প্রথম স্থানে কানাডা, তারপর শিল্পোন্নত দেশগুলো। নিম্ন মানের দেশগুলো ১১৯ নম্বরে, ভারত ১৩৮ নম্বরে, রুয়ান্ডা ১৭ নম্বরে এবং সিয়েরা লিয়োন ১৭৫ নম্বরে। তবে সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকা কিন্তু ৯১ নম্বরে।[২]

---

১. আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-শাতিবী, Al Muwafaqat fi Usul al Shariah, vol.2, p. 177; আল-গাযালী, Al-Mustasfa (1937), vol. 1, P. 139-40; মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম(প্রাগুক্ত), পৃ. ৫০।

২. এম. এ. মান্নান, মানব উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পঞ্চাদশ খণ্ড), খৃ. ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের জন্য ইউ.এন.ডি.পি. কতগুলো মাপকাঠি গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং উপার্জনের অধিকারের ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন সূচকগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের সুযোগের জন্য প্রতি হাজারে নবজাতকের মৃত্যুর হার এবং প্রত্যাশিত আয়ু এবং শিক্ষার সুযোগের জন্য পনেরো বছর ও তদুর্ধ বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার হার এবং বৎসরের হিসেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের গড় পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। দৈনিক খাদ্যের যোগান, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ, শিশু মৃত্যুর হার ইত্যাদি অনেক হিসেবই এর মধ্যে জড়িত। সবার উপরে আছে একটা দেশের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের মাথাপিছু হার বা 'জিডিপি পার ক্যাপিটা'। এই সব হিসেবগুলোর আবার প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে অনেক রকম অংক কষে ১৭৫টি দেশের প্রতিটির মানব উন্নয়নের সূচক নির্ণয় করে গুন ক্রমানুসারে একটি তালিকায় তাদের বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১৭৫ দেশকে সূচক তালিকায় তিনটি স্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচক যাদের উপরের দিকে এমন ৬৪টি দেশ উচ্চবর্গে স্থাপন করে তাদের গড় সূচক হিসেব করে দেয়া হয়েছে। তেমনি মধ্যম বর্গে রাখা হয়েছে ৬৬টি দেশের এবং নিম্নবর্গে পড়েছে ৪৫ টি দেশ। এই তিনটি বর্গের গড় সূচকগুলো দেখলে অবস্থা তারতম্য বা বৈষম্যের একটি ছবি পাওয়া যায়।

মানব উন্নয়নসূচক তালিকা

	প্রত্যাশিত আয়ু (বৎসর)	বয়স্ক স্বাক্ষরতা (শতকরা)	শিক্ষালয়ের সাধারণ গড় (বৎসরে)	জিডিপি-র হার ১৯৯৪, পি,পি,পি (ডলারে)
উচ্চ বর্গ	৭৪.৬	৯৭.০	৯.৮	১৭,০৫২
মধ্যমবর্গ	৩৭.১	৮২.৬	৪.৮	৩৩৫২
নিম্নবর্গ	৫৬.১	৪৯.৯	২.০	১.৩০৮

উৎস ঃ ইউ.এন.ডি.পি, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৫, ১৯৯৭।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মানব উন্নয়নসূচকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪র্থ স্থানে, জাপান ৭ম স্থানে এবং বৃটেন পঞ্চদশ স্থানে। পর্যাপ্ত ধনসম্পদ না থাকলে একটা দেশের পক্ষে অধিবাসীদের মানবিক উন্নতির পর্যাপ্ত আয়োজন করা কঠিন, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ধন-সম্পদ থাকলেই তার সদ্ব্যবহার হবে, তার দ্বারা মানবিক উন্নতি সাধিত হবে এমনও কোন কথা নেই। তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক রাষ্ট্রিক বিশেষ দৃষ্টি ও সাম্যমূলক আর্থ-সামাজিক বন্দোবস্ত।[১]

১. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের মতো একটি হত-দরিদ্র দেশ মানব উন্নয়ন সূচক-এর ভিত্তিতে বিশ্বের ১৭৫টি দেশের মধ্যে এর অবস্থান ১৪৪ তম স্থানে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৬০ সালে ১৪৬ ডলারের স্থলে ১৯৯৪ সালে ২২০ ডলারে উন্নীত হয়েছে।। একই সময়কালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর থেকে ৫৬ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এতে আত্ম প্রসাদের কিছু নেই। কারণ এখনও আমাদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়ার তুলনায় প্রায় ১৫ বছর কম। ভারতের তুলনায় ৫ বছর এবং পাকিস্তানের তুলনায় ৬ বছর কম। বাংলাদেশের প্রায় ২৬ শতাংশ লোক এখনও ৪০ বছর পর্যন্ত বাঁচবার প্রত্যাশা করতে পারে না। শ্রীলঙ্কায় এই হার ৮ শতাংশ, চীনে ৯ শতাংশ এবং ভারতে ১৯ শতাংশ। বাংলাদেশে এখনও অর্ধেকের বেশী (৫৫%) লোক স্বাস্থ্য সেবার নাগালের বাইরে। ভারতে এই হার ১৫ শতাংশ, ভূটানে ৪৫ শতাংশ এবং চীনে ১২ শতাংশ। বাংলাদেশে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা এখনও ২০০০ ক্যালোরির কম, পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এর গড় ২৫০০ ক্যালোরিরও বেশী।

ইউ.এন.ডি.পি'র মতে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করার সময় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index-HDI) ও মানব স্বাধীনতা সূচক (Human freedom Index-HFI) কেও মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের সাথে যুক্ত করা উচিত। কথাটি এভাবে বলা হয়েছে, মানব উন্নয়ক সূচক এবং মানব স্বাধীনতা সূচককে যৌথভাবে মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে একত্র করলে বিশ্বস্ততার সাথে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মানব সূচকে আয়ুষ্কাল, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্রয়ক্ষমতাকে একীভূত করা হয়েছে।

নিম্নে উন্নতশীল, শিল্পায়িত দেশসমূহ এবং বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের হিসাব-নিকাশপত্র দেখান হলো।[১]

উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে মানব উন্নয়নের হিসাব-নিকাশপত্র

প্রত্যাশিত আয়ু

অগ্রগতি

বিগত ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল এই ৩০ বছরে এই দেশসমূহের গড় আয়ু পূর্বের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৩ বছর হয়েছে।

বঞ্চনা

প্রতি বছরে কমপক্ষে একটু বেশি বয়সের ১ কোটি শিশু ও যুবক এবং ১৪০ লক্ষ শিশু প্রতিষেধকযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করে।

---

১. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, ঢাকা, বাংলাদেশ), খৃ. ১৯৯২, পৃ. ২২-২৩ ও ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য

অগ্রগতি

জনগণের চিকিৎসা সুবিধা আগের তুলনায় ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঞ্চনা

১৫০ কোটি মানুষ এখনো চিকিৎসা সুবিধার বাইরে রয়েছে। ১৫০ কোটির অধিক জনগণ বিশুদ্ধ পানি পায় না এবং ২শ' কোটির বেশি লোক পয়ঃসুবিধা লাভ করেনি।

খাদ্য ও পুষ্টি

অগ্রগতি

১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ এই ২০ বছরে গড় ক্যালরি সরবরাহ ৯০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এখনো প্রতিদিন অনাহারে থাকে।

শিক্ষা

অগ্রগতি

বয়স্ক সাক্ষরতার হার ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৪৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

একশ' কোটিরও বেশি লোক এখনো নিরক্ষর। ৩০ কোটি শিশু এখনো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেনি।

আয়

অগ্রগতি

আশির দশকে মাথাপিছু জাতীয় আয় বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব এশিয়ার এই হার ছিল ৯ শতাংশ। আশির দশকে প্রতি চারজনে একের বেশি লোক এমন সব দেশে বাস করেছে যেখানে আয় বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের বেশি ছিল।

বঞ্চনা

একশ' কোটির বেশি লোক এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। গত দশকে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার উপসাহারীয় অঞ্চলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু

অগ্রগতি

গত ৩ দশকে পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হার আগের তুলনায় অর্ধেক হয়েছে। এদিকে আশির দশকে ১ বছরের শিশুদের টিকাদান কর্মসূচী নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঞ্চনা

প্রতি বছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি শিশু ৫ বছরে পৌছানোর আগেই মারা যায়। ৫ বছরের নীচে ১ কোটি ৮০ লক্ষ শিশু মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

গ্রাম ও নগর এলাকা

অগ্রগতি

পল্লী এলাকায় সুবিধাজনক পয়ঃ ব্যবস্থা আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। নগরবাসীদের ৮৮ শতাংশ চিকিৎসা সুবিধা এবং ৮১ শতাংশ বিশুদ্ধ পানির সুবিধা ভোগ করছে।

বঞ্চনা

পল্লীবাসীদের মাত্র ৪৪ শতাংশ চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করছে। বাসযোগ্য প্রতিটি ঘরে ২.৪ জন লোক থাকে যা উভয় গোলার্ধের তুলনায় তিনগুণ। নগরবাসীদের প্রতি ৫ জনে একজন লোক দেশের সর্ববৃহৎ শহরে থাকে।

শিল্পায়িত দেশসমূহে মানব উন্নয়নের হিসাব-নিকাশপত্র

প্রত্যাশিত আয়ু এবং স্বাস্থ্য

অগ্রগতি

* গড় প্রত্যাশিত আয়ু ৭৫ বছর
* সমস্ত জন্মই চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং প্রতি এক লক্ষ শিশুর প্রসবকালে মাত্র ২৪ জন মায়ের মৃত্যু ঘটে।
* মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ গণস্বাস্থ্য বীমার আওতায় রয়েছে।
* স্বাস্থ্য খাতে গড়ে মোট জাতীয় আয়ের ৮.৩% অংশ ব্যয়িত হয়।

বঞ্চনা

* প্রাপ্ত বয়স্করা গড়ে প্রতি বছরে ১৮০০ টি সিগারেট এবং ৪ লিটার খাটি মদ পান করে।

Dhaka University Institutional Repository

* বর্তমানে জন্মগ্রহণকারীদের অর্ধেকেরও বেশিজনের ভবিষ্যতে প্রদাহ ও শ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। কারণ তারা বেশির ভাগই কম খাটুনির কাজ করে এবং অতিমাত্রায় চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। এছাড়া ধুমপান ও মদ্যপান তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

* শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৮৯ সালে ১,৩৭,০০০ জনের ক্ষেত্রে এইড্‌স-এর লক্ষণ ধরা পড়েছে।

শিক্ষা

অগ্রগতি

* সরকারীভাবে গড়ে ৯ বছরের বাধ্যতামূলক পূর্ণ সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মোট স্নাতক সনদপ্রাপ্ত ছাত্রের দুই-তৃতীয়াংশই বিজ্ঞান বিভাগের।

* গড়ে মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়।

বঞ্চনা

* প্রতি দশজনে চারজনই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে না।

* ২০-২৪ বছর বয়সের যুবকদের মাত্র ১৫ শতাংশ পূর্ণ সময়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে।

আয় ও চাকরি

অগ্রগতি

* ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪৮৫০ থেকে বেড়ে ১২,৫১০ মার্কিন ডলার হয়েছে।

* শিল্পায়িত দেশগুলো প্রতি বছরে গোটা বিশ্বের ৮৫ শতাংশ দ্রব্য উৎপাদন করে।

বঞ্চনা

* সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ধনী ব্যক্তিবর্গের আয় দরিদ্রতমদের ২০ শতাংশ এর আয়ের সাত গুণ বেশি।

* মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬.৫ শতাংশ বেকার থাকে এবং এদের এক-তৃতীয়াংশ ১২ মাসেরও বেশি সময় কাজ পায় না।

সামাজিক নিরাপত্তা

অগ্রগতি

* মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১১ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে সামাজিক কল্যাণ খাতে।

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চনা

* ১৯৯০-এর হিসাবে প্রায় ১১ কোটি লোক এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো যুক্ত করা হলে তা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

নারী

অগ্রগতি

* পুরুষদের সংখ্যার সমসংখ্যক নারী উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।
* ২৫ বছরের উর্ধ্বে গড়ে প্রায় সকল নারীই ৯ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করেছে।
* মোট স্নাতক সনদপ্রাপ্ত ছাত্রীদের এক-চতুর্থাংশই বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করেছে।

বঞ্চনা

* নারীদের মজুরি এখনো পুরুষদের মজুরির দুই-তৃতীয়াংশ।
* ১৫-১৯ বছর বয়সের নারীদের প্রতি এক লাখে ৫০ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে।
* সংসদ সদস্যদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ নারী।

সামাজিক চিত্র

অগ্রগতি

* জনগণের যোগাযোগের সুবিধা খুবই উন্নত। প্রতি একজনের জন্য একটি টেলিভিশন ও একটি রেডিও ছাড়াও প্রতি দু'জনে একটি টেলিফোন ব্যবহার করে।
* গড়ে প্রত্যেক পরিবারের গাড়ি আছে।
* প্রতি তৃতীয় ব্যক্তি একটি করে দৈনিক পত্রিকা কিনে।
* পাঠাগারের বইয়ের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৬টি বই লভ্য।

বঞ্চনা

* একাধিক শিল্পায়িত দেশ দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সবচেয়ে নাটকীয় উদাহরণ হচ্ছে : ফিনল্যাণ্ডের এক জনক/জননী সম্পন্ন পরিবার (১০ শতাংশ) সুইডেনের অবৈধ সন্তান অনুপাত (৪২ শতাংশ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবাহ বিচ্ছেদের বৃদ্ধি (৮ শতাংশ)।
* বার্ষিক প্রতি লাখে প্রায় ৪৩৩ জন মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়।

জনসংখ্যা ও পরিবেশ

অগ্রগতি

* প্রতি বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ০.৫ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃসুবিধা ভোগ করে।

বঞ্চনা

* জনসংখ্যার নির্ভরতার হার অনেক বেশি। প্রায় ৫০ শতাংশের মত। * প্রতি ১০০ লোকের জন্য বাৎসরিক ৪২ কিলোগ্রাম প্রথাগত বিষাক্ত বায়ু কলুষক নির্গত হয়। * '৮৯-এর মধ্যে গ্রীনহাউস সূচক ৩.৫-এ দাঁড়িয়েছে।

মানব উন্নয়নের হিসাব-নিকাশপত্র : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

প্রত্যাশিত আয়ু

অগ্রগতি

১৯৬৫-১৯৯০ এই ২৫ বছরে বাংলাদেশের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ৪৫ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৮ বছর হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৯০ সালে ৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই প্রায় ৮,৮০,০০০ জন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে।

স্বাস্থ্য

অগ্রগতি

১৯৮৫-৮৭ সময়কালে মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশের স্বাস্থ্য সুবিধার প্রবেশাধিকার ছিল।

১৯৯০ সালে ৮০ শতাংশ গ্রামীণ পানীয় জলের জন্য নলকূপ ব্যবহার করেছে।

১৯৮০ সালের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় মোট শিশুর সংখ্যা ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার ৬৩.৪ শতাংশের স্বাস্থ্য সুবিধার প্রবেশাধিকার ছিল না এবং মাত্র ১২ শতাংশ গ্রামীণ জনগণ সকল প্রকারের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নলকূপের পানি ব্যবহার করেছে। ১৯৮৫-৯০ সময়কালে মাত্র ৬০ লক্ষ লোকের পয়ঃসুবিধায় প্রবেশাধিকার ছিল।

খাদ্য ও পুষ্টি

অগ্রগতি

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে জনগণের মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি ১৮৯৯ কিলো ক্যালরি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩০ কিলো ক্যালরি হয়েছে।

বঞ্চনা

মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ প্রতিদিন ১৫০০ কিলো ক্যালরির কম ক্যালরি ভোগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

অগ্রগতি

১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৯০ সালে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিরক্ষর ছিল।

চাকরি

অগ্রগতি

১৯৮৫-৯০ সময়কালের মধ্যে প্রায় ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার মিলিয়ন মনুষ্য-বছরের সমপরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বঞ্চনা

পুরুষদের মধ্যে ১৯৮৫ সালে অবেকারত্বের হার ছিল ২২ শতাংশ ও মহিলাদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ।

আয়

অগ্রগতি

মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৮৫ সালে ছিল ১৫০ মার্কিন ডলার এবং ১৯৯০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০ মার্কিন ডলার হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৯০ সালে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিরক্ষর ছিল।

শিশু

অগ্রগতি

১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রতি হাজারে জীবন্ত জন্ম গ্রহণকারী শিশুমৃত্যু হার ১৮৫ থেকে কমে গিয়ে ১১৬ হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৯০ সালে ৫ বছর বয়সের নিচে প্রায় ১.৩৫ মিলিয়ন শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার হয়েছে।

১৯৯০ সালে অপুষ্টি ৬০ শতাংশ শিশু মৃত্যুর কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল না।

নারী

অগ্রগতি

পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি হার শতাংশ হিসেবে ১৯৬০ সালের ৩৯ শতাংশ থেকে ১৯৯০ সালে ৮৭ শতাংশ হয়েছে। প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুর প্রসবকালে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৮০-৮৭ থেকে ১৯৮৭-৯০ সময়কালে ৬ থেকে কমে গিয়ে ৫.৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৮৭-৮৮ সময়কালে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তির হার পুরুষদের সংশ্লিষ্ট হারের ৪০ শতাংশ ছিল।

১৯৮০ সালে গড়ে নারীদের মজুরি হার পুরুষদের মজুরি হারের অর্ধেক ছিল।

গ্রামীণ ও নাগরিক এলাকা

অগ্রগতি

স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অংশ ১৯৭৮ সালে ১০ শতাংশ থেকে ১৯৮৮ সালে ৬০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে নগর এলাকায় স্থূল মৃত্যুহারের শতাংশ হিসেবে গ্রামীণ এলাকার স্থূল মৃত্যুহার ১৮৭ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ১৫৫ শতাংশ হয়েছে।

বঞ্চনা

১৯৮৮ সালে গ্রামীণ এলাকার প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৫৫.৪ বছর সেখানে নগর এলাকায় এর মান ছিল ৬০.৯ বছর। ১৯৯০ সালে গ্রামের ২০ শতাংশ লোকের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে প্রবেশাধিকার ছিল। নগরের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩৬ শতাংশ।

১৯৮৬ তে গ্রামীণ ৮২ শতাংশ লোক চরম পুষ্টিহীনতার শিকার হয়েছে। নগর এলাকায় এই হার ৬.৯ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বা জনসাধারণের জন্য দারিদ্র্য-অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত; বরং ইসলাম মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কারণ দারিদ্র্যতা মানসিক শান্তি বিনষ্ট করা ছাড়াও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিঘ্নিত করে। ফলে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এজন্যই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি বস্তুগত উন্নতির গুরুত্ব কখনও অস্বীকার করা হয়নি।

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত দানের মত ন্যূনতম আর্থিক অবস্থার অবিদ্যমানতাকে দারিদ্র্য বলা যায়। এক কথায় ইসলাম স্বীকৃত ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ব্যক্তিগণই দরিদ্র্য। যেমন ফকীর[১], মিসকীন[২] ইত্যাদি। ইসলাম দারিদ্র্যকে পছন্দ করেনি। পবিত্র আল-কুরআনে দারিদ্র্যকে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ج والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ط والله واسع عليم»[৩]

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

দরিদ্র্যতার সুযোগে শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়। দরিদ্র অবস্থা ও অভাবের সুযোগ নেয় শয়তান। দরিদ্র্যতার কারণে মানুষ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করে।

---

১. ফকীর (فقير) শব্দটি একবচন, বহুবচনে فقراء অর্থ গরীব, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, অভাবী ইত্যাদি। প্রয়োজন, আশ্রয়, ছিদ্র, ব্যথা, দুঃখ, দরিদ্র্য ইত্যাদি অর্থে ফাক্‌র (فقر) ব্যবহৃত হয়।

আলকুরআনে ফাকর (فقر) শব্দ ১ বার, ফকীর, (فقير) শব্দ ৫ বার, ফুকারা (فقراء) শব্দ ৭ বার এসেছে।

(বিঃ দ্রঃ ড. এম. এম. রহমান, কুরআনের পরিভাষা, আল মুনীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, খৃ. ১৯৯৮, পৃ. ২৪৮-৪৯)

২. মিসকীন (مسكين) শব্দটি একবচন, বহুবচনে মাসাকীন (مساكين) অর্থ হল নিঃস্ব, অসহায়, দীন, সর্বহারা ইত্যাদি।

আল-কুরআনে মিসকীন (مسكين) শব্দ ১১ বার, মাসাকীন শব্দ ১২ বার এবং মাসকানাহ (مسكنة) শব্দ ২ বার এসেছে। ইয়াতীম ও মিসকীন যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ৮ বার। ফকীর ও মিসকীন আরবীতে নানাভাবে ব্যবহৃত হয় , যেমন :

(ক) ফকীর ও মিসকীন সমার্থক। ইবনুল আরাবীর মতে- মিসকীন হল ফকীর। কেননা তার কোন সম্বল নেই; মিসকীন হল হীন ও অপমানিত জন, যদিও তার সম্পদ ও সম্বল থাকে।

(খ) মিসকীন হল নিঃস্ব, সর্বহারা জন। ফকীর হল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যার কিছু আছে।

(গ) 'ফকীর' অবস্থার দিক দিয়ে 'মিসকীন' অপেক্ষা উত্তম।

(ঘ) ফকীরের অবস্থা মিসকীন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

(বিঃ দ্রঃ ড. এম. এম. রহমান, কুরআনের পরিভাষা, আল মুনীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, খৃ.১৯৯৮, পৃ. ২৪৮-৪৯)

৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ط نحن نرزقهم واياكم ط ان قتلهم كان خطأ كبيرا »[১]

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা কর না, তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহা পাপ।"

দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া একটি ঘৃণিত কাজ। ইসলাম অনুমোদিত বৈধ নিকৃষ্ট কাজের অন্যতম হলো ভিক্ষাবৃত্তি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خيرله من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه" [২]

"তোমাদের কেউ তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা কারো নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।"

দারিদ্র্যের কারণে মানুষ নিজের স্রষ্টার 'কুফরী'[৩] করতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসে সেই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। আবু নাঈম তাঁর হিল্য়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ

"كاد الفقر ان يكون كفرا"[৪]

"দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর কাছাকাছি নিয়ে যায়।"

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (স) একই সাথে কুফ্রী ও দরিদ্রতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"اللهم إنى اعوذبك من الكفر والفقر"[৫]

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট থেকে কুফরী ও দরিদ্র্যতা থেকে আশ্রয় চাই।"

সহীহ্ আল-বুখারীতে দারিদ্র্যতা প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ আছে, যার শিরোনাম হলো ঃ

---

১. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ৩১।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী, (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, কিতাবুয্ যাকাত, বাব-আলইসতি'ফাফ আনিল মাসয়ালাহ), তা.বি., ১খ, পৃ. ১৯৮।

৩. কুফ্র (كفر) শব্দটি সাধারণভাবে গোপন করা ও আচ্ছাদিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরী ' আতের পরিভাষায় 'কুফ্র' ঈমান ও শুক্র-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করা, নবী-রাসূলদের অস্বীকার করাকে 'কুফ্র' বলা হয়েছে। আল-কুরআনে 'কুফর' শব্দটি বিযুক্তভাবে ২৫ বার এবং সর্বনামের সংগে যুক্ত হয়ে ১২ বার উল্লেখিত হয়েছে। (দ্রঃ ড. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৪)।

৪. ড.ইউসুফ আল-কারযাভী : মুশকিলাতুল ফাক্র অয়াকাইফা আলাজাহাল ইসলাম (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রো), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, হি: ১৪১৫/ খৃ. ১৯৯৫, পৃ. ১৩ ।

৫. সুলায়মান ইবনে আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি, সুনান আবি দাউদ (কিতাবুল আদাব, বাব-মাইয়াকূলু ইযা আসবাহা, মাকতাবা রাশিদিয়া, দিল্লী), ২. খ, পৃ. ৬৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

"التعوذ من فتنة الفقر"[১]

"দারিদ্র্যতার বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।"

এ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি প্রার্থনার কথা উল্লেখ রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

"اللهم انى اعوذبك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر "

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের সংকট ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের সংকট ও কবর-আযাব থেকে, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দ থেকে।"

যদিও কখনও কখনও ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যতা দারিদ্র্যের চেয়েও মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তথাপি দরিদ্রতার বিপর্যয় ও অভিশাপ উপেক্ষা করার মত নয়। উপরোক্ত হাদীসে সেই শাশ্বত সত্যই ফুটে উঠেছে।

ইসলামে মানব জীবনের বস্তুগত উন্নতির গুরুত্ব কখনও অস্বীকার করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله ط ان الله بكل شئ عليم»[২]

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।"

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

«وكاين من دابة لاتحمل رزقها ق الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم»[৩]

"এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন তাদেরক ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

সকল সম্পদই আল্লাহ্র দান এবং তিনি সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا»[৪]

"তিনি পৃথিবীরসব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এই সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার নাই। ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হতে হবে।

১. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, ২. খ, পৃ. ৯৪৪ ।
২. আল-কুরআন, ২৯ ঃ ৬২।
৩. আল-কুরআন, ২৯ ঃ ৬০।
৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل لا كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم»[১]

"আল্লাহ্ এই জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, স্বজনদের এবং য়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«للفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم»[২]

"এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের[৩] জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে।"

জনগণের প্রত্যেকের, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থদের মৌলিক চাহিদা পূরণ সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ আয় ও সম্পদ বন্টনের অন্যতম পরিচায়ক। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হতে শুরু করে। এ কারণেই ইসলাম জনগণের প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের গ্যারান্টির বিষয়টি সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। জনগণের প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের বিদ্যমান তহবিল থেকে ব্যয় সংকুলান যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অবশ্য প্রদেয় দান-সাদাকা ছাড়াও সম্পদশালীদের নিকট সম্পদ সংগ্রহের অধিকার সরকারের রয়েছে। ইবনে হাযম (র)[৪] সমাজের দরিদ্র ও দুঃস্থদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ধনীদের উপর

---

১. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৭

২. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৮

৩. মুহাজির (مهاجر) একবচন, বহুবচনে মুহাজিরুন (مهاجرون) । অর্থ হিজরতকারী, শরণার্থী, মুহাজির। পরিভাষায়- যে ব্যক্তি রাসূল (স:)-এর সঙ্গে কিংবা তাঁর দিকে স্বদেশ ছেড়ে চলে এসেছে। যারা তাঁর আদেশে জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়েছে তারাও এর মধ্যে শামিল। আল-কুরআনে মুহাজির শব্দ একবচনে ২ বার, বহুবচনে (পুং) ৫ বার, (স্ত্রী) ১বার এসছে। (বিঃ দ্রঃ ড. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১১)

৪. আবু মোহাম্মদ আলী ইবনে আবু ওমর আহমদ ইবনে সাইদ ইবনে হাজম আল-কুরতবী আল-আন্দালুসী বা সাধারণভাবে পরিচিতি ইবনে হাজম নভেম্বর মাসে স্পেন বা আন্দালুসিয়ার কর্ডোভা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪৬ হিজরীতে তিনি সিভেলির নিকটবর্তী তাঁর গ্রাম মান্টালিশামে ইন্তেকাল করেন। ইবনে হাজম তাঁর সময়ে আরব-মুসলিম সভ্যতায় মহান চিন্তাবিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বাগ্মী, আইনজ্ঞ, দার্শণিক ও ধর্মবেত্তা হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেন। আরবী ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। তাঁর সময়কালের মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি যেসব সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন তাকে মূলতঃ ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। মৌলিক চাহিদা ও দারিদ্র্য ২। যাকাত ৩। কর এবং ৪। ভূমিবন্টন পদ্ধতি। ইবনে হাজমের গ্রন্থাবলী ঃ ১। আল-মুহাল্লী শারহ আলা মিনহাজ আল-তালিবিন। ২। জামরাহ আনছাব আল-আরব। ৩। কিতাব আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল নিহাল। ৪। কিতাব আল-শারহ হাদীস আল-মুয়াত্তা। ৫। কিতাব আল-জামী ফি সহীহ আল-হাদীস ইত্যাদি। তিনি ৮০ হাজার পাতায় ৪শ' টি বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে- জুরিস প্রুডেন্স, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। অবশ্য এর মধ্যে অন্তত ৪০টি আজো বিদ্যমান রয়েছে। (বিঃদ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪.খ, পৃ. ২২২-৩৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তি কর আরোপের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুলমালে[১] মজুদ সম্পদ এজন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন।"[২]

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী[৩] বলেন ঃ

"الاسلام يجعل الغنى نعمة يمتن الله بها ويطالب بشكرها ويجعل الفقر مشكلة بل مصيبة يستعاذ بالله منها"

"ইসলাম সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করে, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং দারিদ্র্যকে মনে করে একটি বিপদ যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক।"[৪]

সুতরাং ইসলামে দারিদ্র্য কোন মঙ্গলজনক বিষয় নয়। দারিদ্র্য মানুষের সুষম চিন্তাশক্তিকে লোপ

---

১. **বায়তুল মাল ঃ** অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের ট্রেজারী বা কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স:)-এর যুগ থেকেই কোন না কোন রূপে বায়তুল মালের অস্তিত্ব ছিল। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগেই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বায়তুলমাল অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্বই বায়তুল মালের সম্পত্তি নহে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র আওতাভুক্ত অর্থই বায়তুল মালের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত সম্পত্তিকে মুসলিম উম্মাহ্‌র যে কোনও কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করতে পারেন।
(বি. দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ই ফা বা., ১৫শ খণ্ড, খৃ. ১৯৯৪, পৃ. ৫৯৪-৯৫)।

২. ইবনে হাযম আল-মুহাল্লী শারহু আলা মিনহাজ আত-তালিবীন, কায়রো : মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৯ এবং ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (কাজী পাবলিকেশনস্ : লাহোর, পাকিস্তান), খৃ. ১৯৮১, পৃ. ১১৯, ১৫৮, ১৫৯।

৩. ইউসুফ আল-কারযাভী, জন্ম ঃ ১৯২৬, মিসর, ১৯৫৩ সনে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৭৩ সনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মিসরের ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের" ইসলামী শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান, শরীয়াহ ফ্যাকাল্টির ডীন ছিলেন। তিনি রাবিতা আলম আল-ইসলামীর অধীন ফিক্‌হ্ একাডেমীর সম্মানিত সদস্য। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও ট্রাস্ট-এর তিনি অন্যতম সদস্য।তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ
(ক) ফিক্‌হুয যাকাত (২ খণ্ড)
(খ) মুশকিলাতুল ফাক্‌র ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম
(গ) অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা (বাংলায় অনূদিত)
(ঘ) ইসলামে হালাল ও হারামে র বিধান (বাংলায় অনূদিত)
(ঙ) মিন ফিকহিদ্ দাওলাহ্ ফিল ইসলাম ইত্যাদি।

৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

করে। হযরত আবু হানীফা (র)[১] বলেছেন ঃ

"لا تستشر من كيس فى بيته دقيق"

"যার বাড়ীতে আটা নাই তার নিকট কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতে যেয়ো না।" কেননা তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। একদা হযরত আবু হানীফার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসানকে তার গৃহ পরিচারিকা এসে খবর দিল যে, ঘরের আটা শেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন, এই সংবাদে আমার ৪০টি ফিক্হ[২] সম্পর্কিত মাসয়ালা উধাও হয়ে গেছে"।[৩]

দারিদ্র্য শিক্ষার্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যপূর্ণ সমাজের কাছে প্রবৃদ্ধির আশা করা যায় না। দারিদ্র্য অবস্থা মানুষকে নিজের মান-মর্যাদা উপেক্ষা করতে এবং খারাপ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য করে। তা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং পরিবারের কাঠামোকে নড়বড়ে করে দেয়।

মোটকথা দারিদ্র্য একটি অভিশাপ। তাই ইসলাম দারিদ্র্যকে লালন করাকে কখনো পছন্দ করে না। শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর। বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের কালজয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রণয়ন করে ইসলাম যে সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে, মানব রচিত কোন মতবাদ বা অর্থনীতিতে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা আল-নু'মান ইবনে ছাবিত ইবনে যূতী হি. ৮০/৭০০ খৃ. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাবিঈ। ইমাম আবূ হানীফা অন্তত সাতজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তিনজনের নিকট থেকে সরাসরি হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্হের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কূফায় গমন করেন। সেখানে তিনি কূফার শ্রেষ্ঠ আলিম হাম্মাদ (র)-এর নিকট ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বসরায় গমন করেন। পরবর্তীতে তিনি মক্কা ও মদীনায় গমন করেন এবং সেখানে অধ্যয়ন করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি ইমাম 'আজম হিসাবে খ্যাত। হানাফী, হানাফীয়্যা, আহ্নাফ বলতে ইমাম 'আজম আবূ হানীফা (র)-এর অনুগামীদের বোঝানো হয়। তার প্রতি আরোপিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। এর অধিকাংশই পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে ও গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। তিনি ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. কারাগারে ইন্তিকাল করেন।

(বি.দ্র. ইমাম আবূ হানীফা (র) আল-ফিকহুল আক্বার, ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ২০০২)।

২. ফিক্হ (فقه)-এর অর্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, অবহিতি, বুদ্ধি, বুঝ, অনুধাবন ইত্যাদি। বিশদ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'আতের ব্যবহারিক বিধিবিধানের জ্ঞান যে বিদ্যার মাধ্যমে অর্জন করা যায়, পরিভাষায় তাকে ফিক্হ বলে। আল-কুরআনে "ফিক্হ" ক্রিয়া বিভিন্ন রূপে ঃ ২০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

"وقد رووا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أن الجارية أخبرته يوما في مجلسه، أن الدقيق نفد، فقال لها: "قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي أربعين مسألة من مسائل الفقه"

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

বিশ্বে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্বের সকল দেশে কমবেশী বিরাজমান। মানব সভ্যতার সবচাইতে অভিশপ্ত ও ঘৃণিত শোষণের হাতিয়ার হলো সুদ। এই সুদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক অর্থনীতির বুনিয়াদ, যার কারণে বিশ্বের সর্বত্রই ধনী আরও ধনী হচ্ছে, পক্ষান্তরে দরিদ্রের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরক্ষরতা বিস্তার, কর্মোপযোগী দক্ষতার অভাব এবং আর্থিক সম্পদের অপর্যাপ্ততার দরুন তারা তাদের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে পারছে না। অর্থনীতিতে মানুষের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক বিকাশে যে কোন উপাদানের উপরে মানুষের স্থান। তার ভিতরে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি, উদ্যম ও সৃজনশীলতা। এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণকর ও শান্তিময় বিশ্ব নির্মাণ সম্ভব; একইভাবে জাগতিক সমৃদ্ধিও অর্জন করা যেতে পারে। মানুষ ও মানব সম্পদ বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সবদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন সমগ্র মানুষ ও সমাজকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শিক্ষা দান করে। এদিক থেকে ইসলামী অর্থনীতিতে মানব-সম্পদের উন্নয়ন সীমিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অংশত মানব উন্নয়ন না বুঝিয়ে একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশকেই বুঝিয়ে থাকে। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আখ্যায়িত করেছে, তাকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। মানুষের মর্যাদার এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম তার জন্য ইহলৌকিক মুক্তির পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির দিকনির্দেশনাও দিয়েছে। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হচ্ছে মানুষের তৈরী মতবাদ তথা সুদভিত্তিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে। যার কারণে মানবজাতির একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

দারিদ্র্য পরিস্থিতি

উন্নয়নশীল ও শিল্পোন্নত দেশসমূহে মানব বঞ্চনার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় ধনী ও দরিদ্র উভয় দেশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমভাবে প্রযোজ্য। বিষয়গুলো হলো দারিদ্র্য, অসমতা, মানব অস্তিত্ব রক্ষা ও পরিবেশের অবক্ষয়। এসব বিষয়ের সার্বজনীন প্রকৃতি ও গুরুত্বের কারণে এগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতিবেদনে বিশ্ব দারিদ্র্য পরিস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

পৃথিবীর ২৩ ভাগ লোক বিশ্বের ৮৫ শতাংশ আয় ভোগ করে। উত্তর গোলার্ধের মাথাপিছু আয় হলো ১২,১৫০ মার্কিন ডলার যা দক্ষিণ গোলার্ধের গড়পড়তা আয়ের (৭১০ মার্কিন ডলার) প্রায় ১৮ গুণ বেশী। ক্রমান্বয়ে এই দু'য়ের ব্যবধান বাড়ছে। একমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই প্রায় ১২০ কোটি দরিদ্র লোক বাস করে এবং এশীয় অঞ্চলে ৫০ কোটি দরিদ্র মানুষের বাস। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকা মহাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩০ শতাংশ লোক বাস করে। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রায় ১০ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

তৃতীয় বিশ্বের একশ' কোটিরও বেশি লোক সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র। এদের ৬৭ শতাংশ এশিয়ায়, ২৪ শতাংশ আফ্রিকায় এবং ১২ শতাংশ লাতিন আমেরিকায় ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে বাস করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত এই পনের বছরে আফ্রিকায় চরম দরিদ্রের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ বেড়ে গেছে। এ ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তিন-চতুর্থাংশ গ্রামে বাস করে।[১]

দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা

দক্ষিণ এশিয়ায়[২] মানবজাতির প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ লোক বাস করে এবং শুধুমাত্র এর বার্ষিক জনসংখ্যা জাতিসংঘভুক্ত ৫০টি ছোট দেশের মোট জনসংখ্যার বেশি। দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বাধিক বঞ্চিত অঞ্চল। বিশ্বব্যাংকের আনুমানিক হিসাবমতে, এখানকার ৫০০ মিলিয়নের[৩] কিছু বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার[৪] নিচে বেঁচে থাকে, যেখানে দরিদ্রতম এই অংশটির এমনকি মৌলিক মানবিক প্রয়োজনগুলোও মেটে না। এ অঞ্চলটি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু সৃষ্টি করে বিশ্ব আয়ের মাত্র ১.৩ শতাংশ তাছাড়া পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশ বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়।[৫]

উপরোক্ত পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় , দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দেশ পাকিস্তানের ৩৬ মিলিয়ন লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ দরিদ্র।[৬] অপরদিকে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ভারতে মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ, নেপালে ৪০ শতাংশ, শ্রীলংকায় ৩১ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাস।[৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বলা হয় স্বপ্নের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেখানেও দরিদ্র লোকের বাস রয়েছে। বিগত ২৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এই উন্নয়নের সুফল দেশের বহু লোক ভোগ করতে পারছে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩ কোটি ২০ লক্ষ লোক এখনও দরিদ্র, যা সে দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ। এছাড়া আরো প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক রয়েছে যাদেরকে প্রায় দরিদ্র হিসাবে বিবেচনা

১. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২. দক্ষিণ এশিয়া বলতে ৭টি দেশ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। দেশগুলো হলে ঃ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা, ভূটান এবং মালদ্বীপ। এদেশগুলো দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক-এর সদস্য।

৩. ৫০০ মিলিয়ন ৫০ কোটি।

৪. চরম দরিদ্র বলতে যারা ১ ডলারের কম আয় নিয়ে জীবন ধারণ করে।

৫. দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৭, পৃ. ৩।

৬. পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যা ১৩৩ মিলিয়ন।

৭. দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, ৪২, ৪৮, ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

করা চলে। সে দেশের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩৮ শতাংশ এমন দরিদ্র পরিবারের সদস্য যাদের মোট পারিবারিক আয় দারিদ্র্য আয়সীমার অর্ধেকের চেয়েও কম। এই অনুপাতটি ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৭৫ সালেও এটি ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। ৪০ শতাংশ দরিদ্রের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ১১ শতাংশ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। ১৯৭৩-এর পর থেকে শিশুরাই হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ। আর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ দারিদ্র্য আয় রেখার প্রান্তসীমায় রয়েছে। দরিদ্রদের প্রায় ৪০ ভাগ ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকায় বসবাস করে, যেখানে দারিদ্র্যের আপাতন উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে ৫০ ভাগ পরিবারেই মাত্র একজন লোক কাজ করে এবং এদের মাত্র ১৬ শতাংশ সারা বছর ধরে কাজ করতে পারে।[১]

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে এদেশ আত্মনির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। এজন্যই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এখানে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, নিম্ন শ্রম-উৎপাদনশীলতা ও স্বল্প হারের মজুরী।

সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের জন্ম হয় ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৭ সন থেকে প্রায় ২৫ বছর দেশটি পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল হিসাবে গণ্য ছিল এবং তৎপূর্বে এটি বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বাংলাদেশ ও আসাম প্রদেশের অংশবিশেষ ছিল। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন তারা এ রাজনৈতিক সীমারেখার বাইরেও ছড়িয়ে আছেন। পশ্চিম বাংলা, বিহারের বিশেষ এবং আসাম বহু কাল ধরে একই অর্থনৈতিক এলাকা হিসাবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময় অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ এ অঞ্চলে কার্যকরী করা হয়েছে। যখন যে রাজা এ অঞ্চল শাসন করেছেন তখন তার রাজ্যের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে। অনেক সময় বাংলাদেশের রাজাও আশেপাশের রাজ্য জয় করে বাংলার রাজনৈতিক সীমা বাড়িয়েছেন, কালে কালে আবার পরিবর্তনও হয়েছে। এ অঞ্চল ২০° - ৩০′ ও ২৬° - ৪৫′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮° ও ৯২°-৫′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৫৫,১২৬ বর্গমাইল। বাংলাদেশের জলবায়ু বিষুব মৌসুমী অর্থাৎ এখানে উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক শীতকাল। বছরে এখানে গড়ে প্রায় ৭০″ হতে ১১২″ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং দেশের গড় তাপমাত্রা স্থানবিশেষ সর্বনিম্ন ৬৯° (ফারেনহাইট) ও সর্বোচ্চ ৮৯° ডিগ্রীর মধ্যেই সাধারণত থাকে।[২]

১. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ ।

২. আবদুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস (ঢা: বি: গ্রন্থ সংস্থা), দ্বিতীয় সংস্করণ, খৃ. ১৯৮৩, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রতি বর্গমাইলে যত লোক বাস করে পৃথিবীতে আর কোন অনুন্নত দেশে এর তুলনা পাওয়া যায় না। উন্নত দেশেও এত ঘনবসতি কম দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন অনুসারে দেখলে একেবারেই অর্থহীন। যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হলো এবং কারিগরি প্রকৌশল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেল, তখন আমাদের দেশের কারিগর ও শিল্পীরা বাজার হারিয়ে কৃষিকার্যে ফিরে গেল। ইংরেজ শাসন শুরু হবার পূর্বে সৈন্য বিভাগে ও রাজস্ব আদায়ে মুসলমানগণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী কাজের মাধ্যমরূপে চালু করা হয়। ফলে বাংলার মুসলমানগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়ে এবং কলিকাতার হিন্দু কলেজে পড়া ছেলেরাই লাভবান হয়। কারণ ইংরেজী না জানলে অত:পর আর সরকারে বড় চাকুরী হতো না। ঢাকা কলেজের ১৮৫০-৫১ সনের ছাত্রের তালিকায় একজন মুসলমানও ছিল না। ১৮৫১-৫২ সনের তালিকায় ৭৭ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। মুসলমানগণ ক্রমশ অন্য কাজ না পেয়ে কৃষিকাজেই ঝুঁকে পড়ল এবং সেখানেও জমিদারের শোষণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই ইংরেজগণ মুসলমানদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত এ তাদের গোমস্তা, দালাল, বেনিয়া এসকলই অমুসলমান ছিল ও তাদের কার্যস্থল কলিকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে।[১]

বাংলাদেশে দারিদ্র্য যে ব্যাপক এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এজন্য এদেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টা মূলত দারিদ্র্য সমস্যাকে ঘিরে আবর্তিত। স্বাধীনতা পরবর্তী সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। এদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ মূলত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস.) পরিবারের ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ থেকে সংগৃহীত ব্যয় অথবা পুষ্টি ভিত্তিক নিয়ামকের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত এ ধরনের সমীক্ষা থেকে দারিদ্র্যের ভয়াবহ ব্যাপ্তি সম্পর্কে গবেষকবৃন্দ একমত হলেও দারিদ্র্যের প্রবণতা নিয়ে বেশ বিতর্ক বিদ্যমান। সত্তরের দশকে দারিদ্র্য পরিস্থিতি অপরিবর্তিত ছিল, এ ব্যাপারে মতৈক্য থাকলেও আশির দশকে দারিদ্র্যের নিম্নমুখী প্রবণতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সমীক্ষার পদ্ধতিগত অসামঞ্জস্যতা, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিভিন্নতা এবং দারিদ্র্য সূচকের সঙ্গে অসঙ্গতি।[২]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস.) পরিচালিত খানাভিত্তিক ব্যয় জরিপ দেশে দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য তথ্যের প্রধান উৎস। অবশ্য বি.বি.এস. সংগৃহীত তথ্যের সীমাবদ্ধতা সুবিদিত। স্মৃতিচারণ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, নমুনা আকারের পরিবর্তন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন, পণ্য মূল্য নির্ধারণে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সময় ভিত্তিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি তুলনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

এছাড়া একই তথ্য (খানাভিত্তিক জরিপ) ব্যবহার করে দারিদ্র্য মূল্যায়নে ভিন্ন ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। এর মূল কারণ, দারিদ্র্য রেখা নির্ধারণ সংক্রান্ত অনুমানের মধ্যে পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে মৌলিক চাহিদার খরচ এবং খাদ্য-কর্মশক্তি পরিমাণ এই দুই প্রধান পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে

১. আবদুল্লাহ ফারুক, প্রাগুক্ত ,পৃ. ২৩০-৩১।

২. মোস্তফা কামাল মুজেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

পারে। বলাবাহুল্য ন্যূনতম ক্যালোরি গ্রহণের যে দ্রব্যগুচ্ছ চয়ন করা হয় তার উপর দারিদ্র্য রেখা বিশেষভাবে সংবেদনশীল। তদুপরি দারিদ্র্য প্রবণতা মাথাপিছু অথবা পরিবারভিত্তিক বণ্টন ভিন্নতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারণত অভিন্ন আয় থাকা সত্ত্বেও স্বল্প সদস্যবিশিষ্ট পরিবার অপেক্ষা বেশী সদস্য সম্বলিত পরিবারের জীবনযাত্রার মান কম।

এজন্য পরিবার ভিত্তিক পরিমাপ দারিদ্র্যের প্রকোপ পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। বেশী আয় সম্বলিত পরিবারের সদস্য সংখ্যাও সাধারণত বেশী হয়।[১]

পারিবারিক ব্যয় জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক দারিদ্র্যের পরিমাপ থেকে দেখা যায় যে, একই বছরে দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ভিন্ন যা মূলত পদ্ধতিগত বিভিন্নতার কারণে সৃষ্ট (সারণী-১)।

সারণী-১

দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানরত জনসংখ্যা

অঞ্চল	১৯৭৩/৭৪	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	১৯৮১/৮২	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২	১৯৯৪/	১৯৯৫
আলমগীর (১৯৭৮) গ্রামাঞ্চল	৮৪.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৭৬.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নুরুতাল্লা (১৯৮৬) গ্রামাঞ্চল	৫৯.৯	৬৮.২	-	৬৮.৭	-	-	-	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৩৭.৮	৪০.৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইসলাম ও খান (১৯৮৬) গ্রামাঞ্চল	৪৭.৭	৬২.৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৩২.৩	৩৭.৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ওসমানী ও রহমান (১৯৮৬) গ্রামাঞ্চল	৬৫.৩	-	-	-	৭৯.১	৪৯.৮	৪৭.১	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৬২.০	-	-	-	৫০.৭	৩৯.৫	২৯.১	-	-	-	-
রহমান ও হক (১৯৮৮) গ্রামাঞ্চল	৫৫.৭	৬১.১	৬৭.৯	-	-	-	-	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	-	-	-	-	৪৮.৪	-	-	-	-	-	-
র‍্যাভিলিয়ন (১৯৯০) গ্রামাঞ্চল	-	-	-	-	৫৩.৮	৪৫.৯	৪৯.৭	৫২.৯			
শহরাঞ্চল	-	-	-	-	৪০.৯	৩০.৮	৩৫.৯	৩৩.৩	-	-	-
বিবিএস (১৯৯০/৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৬) গ্রামাঞ্চল	-	-	-	৭৩.৮	৬১.৯	৫৪.৭	৪৭.৮	৪৭.৬	৪৩.৫	৪৬.৮	-
শহরাঞ্চল	-	-	-	৬৬.০	৬৭.৭	৬২.৬	৪৭.	৪৬.৭	-	৪৩.৬	
মোট	-	-	-	-	৬২.৬	৫৫.৭	৪৭.৮	৪৭.৫	-	-	

উদ্ধৃতি : মোস্তফা কামাল মুজেরী, গ্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১. মোস্তফা কামাল মুজেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যের প্রবণতার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও ১৯৮৩/৮৪ সালের তুলনায় ১৯৯১/৯২ সালে তিনটি পরিমাপের ক্ষেত্রেই সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে বেশ উঠা-নামাও দেখা যায়। সকল পরিমাপের ক্ষেত্রেই ১৯৮৫/৮৬ সালের পর দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি লক্ষণীয়। ১৯৯১/৯২ সালের পর গ্রাম ও শহরাঞ্চল এই উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এ সময়ে গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্য সীমা থেকে দূরত্বের বর্গ পরিমাপের বৃদ্ধি অতি-দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার ক্রমানবতি নির্দেশ করে। এছাড়া শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও প্রচণ্ডতা যে বেশী তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এই তিন পরিমাপের সাম্প্রতিক তথ্য সারণী-২ এ দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালের তথ্য ও পূর্ববর্তী বছরগুলোর তথ্যের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে এই পরিসংখ্যান-এর সাথে আগের বছরগুলোর তুলনা দ্বারা দারিদ্র্য প্রবণতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

সারণী-২

বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রবণতা

অঞ্চল/বছর	মাথা গণনার অনুপাত	দারিদ্র্য সীমা থেকে দূরত্ব	দারিদ্র্য সীমা থেকে দূরত্বের বর্গ
গ্রামীণ			
১৯৯৪	৪৩.৫	১৬.৪	১.৪
১৯৯৫	৪৬.৮	১৬.৪	-
শহরাঞ্চল			
১৯৯৫	৪৩.৬	১৪.৭	৬.৫

উৎস ঃ বিবিএস, সিরডাপ ১৯৯৭।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে দারিদ্র্য শুধুমাত্র আয় ও পুষ্টির ঘাটতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। আয় এবং পুষ্টিভিত্তিক সূচক দ্বারা প্রকাশিত দারিদ্র্য প্রবণতা ও তাদের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ সম্যকভাবে উপলব্ধি এবং কিভাবে চলমান আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া দারিদ্র্যের স্তর ও পরিবর্তনকে প্রভাবান্বিত ও নির্ধারিত করে দারিদ্র্য বিশ্লেষণে ও নীতি প্রণয়নে তার অনুধাবন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে অনেক বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন সম্পত্তি ও জমির অসম বণ্টন, জমির ব্যবহারে অসমতা, ফসল উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ও সেচের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে অসম সুযোগ, অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও মজুরি, নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ও প্রবৃদ্ধির ফলাফলের অসম বণ্টন, সামাজিক সুবিধাসমূহে অসম প্রবেশাধিকার, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং

Dhaka University Institutional Repository

খামার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের পরিব্যাপ্তির অপ্রতুল প্রসার ও অসম বণ্টন। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়মিতভাবে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয় যা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করে এবং অর্জিত আয় স্তর ধরে রাখার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। এজন্য দরিদ্র্যের বিভিন্ন সূচককে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং পরিবারের কর্মপদ্ধতির আলোকে বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার কৌশল অনেকাংশে আনুষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণ অপেক্ষা সার্বজনীন সম্পদের উৎস প্রাপ্তি ও প্রবেশাধিকার, সামাজিক নির্ভরতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রভৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পারিবারিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে ভূমিহীনতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শ্রমশক্তির বণ্টন, বেকারত্ব ও মজুরির হার, শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি।[১]

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিশ্বখ্যাত। আবার বিশ্ব পরিচিত দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন উদ্যোগও এখানে বিদ্যমান। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গত দু'যুগের বহুমুখী যুদ্ধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের মুখ্য বাস্তবতাটি এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ এখনো দারিদ্র্যের শেকলে বন্দী। শুরু থেকেই আমাদের দারিদ্র্য পরস্থিতি বিশ্লেষণে একটি বড় রকমের ত্রুটি ছিল। এছাড়া ছিল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা। সর্বোপরি, ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাটিকে বছরের পর বছর ব্যর্থতার মূল নিয়ামক হিসাবে সংরক্ষণ করে চলেছি আমরা। বলা যায়, গত ২৫ বছর ধরে আমলাতন্ত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল কর্মোদ্যম এবং সমগ্র জাতির উন্নয়ন স্পৃহাকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করেছে।

শহরে মানুষ একটি আনুষ্ঠানিক পেশার উপর নির্ভর করে। কিন্তু গ্রামীণ পরিবারগুলো সেভাবে আয়ের একটি উৎসের ওপর নির্ভর করে না বা করতে পারে না। সেখানে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো স্বনিয়োজিত কাজ বা মজুরি শ্রমের কাজ করতে হয়। তাদেরকে মজুরি শ্রমিক হিসেবে যেমন খাটতে হয় তেমনি পারিবারিক জীবিকাতেও কাজ করতে হয়। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ঋতুর দ্বারাও প্রভাবিত হয়। প্রকৃতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক লোকের ভিত্তিতে গ্রামীণ দরিদ্র ও অদরিদ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব (সারণী - ৩)।

১. মোস্তফা কামাল মুজেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩

গ্রামীণ দরিদ্র ও অদরিদ্র পরিবারের কিছু বৈশিষ্ট্য

সূচক	অতি দরিদ্র		দরিদ্র		অদরিদ্র	
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৪
পরিবারের আকার	৬.৫	৫.৩	৬.০	৫.৪	৫.৯	৫.৩
গৃহকর্তার বয়স (বছর)	৪২.০	৪১.০	৪১.০	৪১.০	৪৩.০	৪২.০
পরিবারের সদস্য সংখ্যা (%)						
দশ বছরের নিচে	৩৪.৬	৩৮.৩	৩১.৬	৩৩.৯	২৪.২	২৭.৫
দশ বছরের বেশী (পুরুষ)	৩৩.৩	২৯.২	৩৫.০	৩১.২	৪২.৭	৩৭.১
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ (১৬+)	২৪.১	২৩.৮	২৬.৫	২৫.৬	৩৩.৪	৩০.৩
শিশু-মহিলা অনুপাত	৭৮.৭	৯০.০	৬৯.২	৬৪.১	৫৬.৯	৫৪.৬
শিক্ষা (%)						
৬-১৫ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রী	-	৫১.৪	-	৫০.৫	-	৫৩.৮
পুরুষ	৫২.৮	২৮.৩	৬৩.০	২২.৫	৭০.০	২৯.০
মহিলা	৪৩.২	২৩.১	৫৬.৫	২৮.১	৬১.৮	২৪.১
প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত	৮৫.৫	৭১.৯	৬৩.৬	৬৮.৭	৪৭.০	৬১.৫
প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত	৯.৭	২.৯	১৪.৪	৪.৩	২৪.৭	৯.৬
মালিকানাধীন জমি (জনপ্রতি) একর	১.০	০.৮	১.১	০.৪	২.২	২.৩
চাষের অধীন জমি (জনপ্রতি) একর	১.৬	০.৫	১.৯	০.৩	২.৭	১.৮
বর্গাচাষাধীন জমি (%)	২৩.১	-	২৫.০	-	২১.৫	-
উফশী ধানচাষের অধীনে জমি (%)	৩০.৯	-	৩৭.১	-	৪৫.১	-
সেচের অধীনে জমি (%)	২৪.২	-	২৬.০	-	৩৫.১	-

উৎসঃ হোসেন ও অন্যান্য১৯৯২, বিবিএস ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

তেরো কোটি মানুষের এদেশে দারিদ্র্য যে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় তাতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। তাই সংগত কারণেই বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয় যা একই সাথে স্থিতি (Status) ও প্রক্রিয়াকে বুঝায় (process-redirection of resources for proper growth)। গত তিন দশকের প্রয়াসে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ভয়াবহতা হ্রাস পেলেও এখনও এর ব্যাপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। দেশের সম্পদ পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার এ সমস্যা মোকাবিলা বিরাট একটি চ্যালেঞ্জও বটে। এ কারণে দারিদ্র্য বিমোচনকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'Millennium Development Goals' -এর প্রেক্ষাপটে সরকার 'প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল (A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction And Social Development) শীর্ষক একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে যা IPRSP নামে খ্যাত। এই কৌশলপত্রের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রণয়ন করা হচ্ছে মধ্য মেয়াদী আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা (The Medium Term Plan for Economic and Social Development) ও ত্রিবার্ষিক 'আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচি' (Rolling Investment Programme) যা হবে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি।

দারিদ্র্য হলো এমন এক পরিস্থিতি যখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি ইত্যাদি চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজন অপূর্ণ থাকে। দারিদ্র্যের মর্মার্থ বা সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ণীত হলে দারিদ্র্য বিমোচন বা দূরীকরণ সহজতর হয়। আপাতন ভিত্তিক (Incidence of Poverty) দারিদ্র্য নিরূপন পদ্ধতি (Head Count ratio based on Direct Calorie Intake - DCI and Cost of Basic Need -CBN Method) সরকারীভাবে অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপ করে থাকে। বিবিএস-এর সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপটি পরিচালিত হয় ২০০০ সালে। এ জরিপে দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ এবং মৌলিক চাহিদার ব্যয় উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানার ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবিএস খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করতো। ২০০০ সালের জরিপের পূর্বে ১৯৯৫-৯৬ সালের জরিপেই প্রথমবারের মত মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতিটিই এখন সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত।

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী দারিদ্র্যের পরিমাপ ঃ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) প্রতিবেদন অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাপে ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে অনপেক্ষ দারিদ্র্যের নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে চরম দারিদ্র্যও ১৮০৫ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাপে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮-৮৯ সালে নির্ণীত ২৮.৩৬ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ১৯.৯৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে পল্লী এলাকায় চরম দারিদ্র্য ১৯৮৮-৮৯-এর ২৮.৬৪ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ১৮.৭২ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৮৮-৮৯ সালের নিরিখে শহর অঞ্চলে অনপেক্ষ দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হলেও চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে শহর অঞ্চলে অনপেক্ষ দারিদ্র্য ছিল ৪৭.৬৩ শতাংশ কিন্তু ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২.৫০ শতাংশ। অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য যেখানে ছিল ১৯৮৮-৮৯-এর ২৬.৩৮ শতাংশ, ২০০০ সালে তা দাঁড়ায় ২৫.০২ শতাংশে।[১]

সারণি -৪

ক্যালরি গ্রহণ ভিত্তিক অনপেক্ষ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০
অনপেক্ষ দারিদ্র্য	জাতীয়	৬২.৬০	৫৫.৬৫	৪৭.৭৫	৪৭.৫২	৪৭.৫৩	৪৪.৩৩
	পল্লী	৬১.৯৪	৫৪.৬৫	৪৭.৭৭	৪৭.৬৪	৪৭.১১	৪২.২৮
	শহর	৬৭.৭০	৬২.৫৫	৪৭.৬৩	৪৬.৭০	৪৯.৬৭	৫২.৫০
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	৩৬.৭৫	২৬.৮৬	২৮.৩৬	২৮.০০	২৫.০৬	১৯.৯৮
	পল্লী	৩৬.৬৬	২৬.৩১	২৮.৬৪	২৮.২৭	২৪.৬২	১৮.৭২
	শহর	৩৭.৪২	৩০.৬৭	২৬.৩৮	২৬.২৫	২৭.২৭	২৫.০২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০০ (HIES-2000)

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে অনপেক্ষ ও চরম দারিদ্র্য রেখা যথাক্রমে ২২০০ ও ১৮০০ কিলো ক্যালরীর এবং ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে অনপেক্ষ ও চরম দারিদ্র্য রেখা যথাক্রমে ২১২২ ও ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণি-৫

মাথা পিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

জরীপ বর্ষ	জাতীয়	পল্লী	শহর
২০০০	২২৪০.৩	২২৬৩.২	২১৫০.০
১৯৯৫-৯৬	২২৫৪.০	২২৬৩.১	২২০৮.১
১৯৯১-৯২	২২৬৬	২২৬৭	২২৫৮
১৯৮৮-৮৯	২২১৫	২২১৭	২১৮৩
১৯৮৫-৮৬	২১৯১	২২০৩	২১০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০০ (HIES-2000)

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, পৃ. ১২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য রেখার নীচে জনসংখ্যা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে সারণি ৬-এ মাথা-গণনা হার ২০০০ উপস্থাপন করা হলো। এখানে দু'ধরনের গণনা হার উল্লেখ করা হয়েছে, একটি হচ্ছে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার জন্য এবং অপরটি হচ্ছে উচ্চ দারিদ্র্য রেখার জন্য। জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ হলো ৩৩.৭ শতাংশ, সেখানে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৪৯.৮ শতাংশ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য অনেক কম। অথচ প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চল বেশী দারিদ্র্য প্রবণ এলাকা। সারণি ৬-এ প্রশাসনিক বিভাগসমূহের মধ্যে যে দারিদ্র্য পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে, তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রকটতম (যথাক্রমে ৪৬.৭% ও ৩৫.৪%)। এ সকল পরিসংখ্যান সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের (প্রায় ৩৪.০০%) তুলনায়ও বেশী। অপরদিকে একই নিম্ন দারিদ্র্য রেখার অবশিষ্ট বিভাগগুলোতে মোটামুটি একই ধরনের দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিরাজ করছে। উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রেও রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অনেক বেশী দারিদ্র্যের প্রভাব লক্ষণীয় (যথাক্রমে ৬১.০% ও ৫১.৪%)। অন্যদিকে একই উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে কেবলমাত্র বরিশাল বিভাগে (৩৯.৮%) তুলনামূলকভাবে কম দারিদ্র্য লক্ষ্য করা যায়।

সারণি-৬

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্যের হার(মাথা-গণনার অনুপাত)

	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
জাতীয়/বিভাগ	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয়	৩৩.৭	৩৩.৪	১৯.১	৪৯.৮	৫৩.১	৩৬.৬
বরিশাল	২৮.৮	২৯.৬	১৯.৫	৩৯.৮	৪০.০	৩৭.৯
চট্টগ্রাম	২৫.০	২৫.৩	২৩.৩	৪৭.৭	৪৮.৪	৪৪.০
ঢাকা	৩২.০	৪১.৭	১২.০	৪৪.৮	৫২.৯	২৮.২
খুলনা	৩৫.৪	৩৬.৮	২৭.৫	৫১.৪	৫২.২	৪৭.১
রাজশাহী	৪৬.৭	৪৮.৮	৩২.৩	৬১.০	৬২.৮	৪৮.১

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০০০।

বিভাগওয়ারী দারিদ্র্যের হার ও দারিদ্র্য প্রবণতা

সারণি ৭-এ উভয় দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে নির্ণীত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রশাসনিক বিভাগ ভিত্তিক বণ্টন দেখানো হয়েছে। এখানে দরিদ্র হিসেবে সেই ব্যক্তিবিশেষকে আখ্যায়িত করা হয়েছে যার

Dhaka University Institutional Repository

মোট ব্যয় দারিদ্র্য রেখার চেয়ে কম তাকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ থেকে অন্যভাবে দারিদ্র্য বণ্টনের একটি ধারণা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা যেতে পারে, নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দেশের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১১.৩ শতাংশ শহরে বাস করে। রাজশাহী বিভাগের (জনসংখ্যার ৩২.৪% নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে এবং জনসংখ্যার ২৮.৬% উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে নিচে) পর ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র্য বসবাস করে। এটা গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রেও সত্য। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুসারে ঢাকা বিভাগে শহরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র বসবাস করে (৫.৮%)। নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রেও এটা সত্য (৩.৬%)। অপরদিকে বরিশাল বিভাগে নিম্ন ও উচ্চ উভয় দারিদ্র্য রেখা অনুসারে কম সংখ্যক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে।

সারণি-৭

আবাস অনুযায়ী দারিদ্র্যের শতকরা হার

	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
জাতীয়/বিভাগ	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয়	১০০.০	৮৮.৭	১১.৩	১০০.০	৮৫.২	১৪.৮
বরিশাল	৬.০	৫.৭	০.৪	৫.৬	৫.২	০.৪
চট্টগ্রাম	১৯.৬	১৬.৫	৩.১	২৫.৪	২১.৪	৩.৯
ঢাকা	২৯.৭	২৬.১	৩.৬	২৮.২	২২.৪	৫.৮
খুলনা	১২.৩	১০.৮	১.৫	১২.১	১০.৪	১.৭
রাজশাহী	৩২.৪	২৯.৬	২.৮	২৮.৬	২৫.৮	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০ (HIES-2000)

দারিদ্র্যের মাত্রাসমূহ

দারিদ্র্যের মাত্রাকে বৃহত্তর পরিসরে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত, (খ) শিক্ষা বঞ্চিত এবং (গ) পুষ্টি (খাদ্য নিরাপত্তাসহ) বঞ্চিত।

(ক) **স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত দারিদ্র্য** ঃ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১-৪ বছর বয়স শ্রেণীতে মেয়ে শিশু মৃত্যুর হার ছেলে শিশু মৃত্যুর হারের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশী এবং ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৯-২০০০ সালের ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে (DHS) অনুযায়ী এই পার্থক্য অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিশু (০-৫ বছর) মৃত্যুর হারের পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে এবং উক্ত সময়কালে এই হার ৩৪% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৬%-এ দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ধনী জনগোষ্ঠীর তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭০ শতাংশ বেশী। দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে জন্ম ও মৃত্যু হার সম্পর্কিত। নব্বইর দশকের মাঝামাঝি সময়ে টিএফআর ৩.৩-এ স্থির ছিল, বর্তমানে (২০০০ সালে) তা

Dhaka University Institutional Repository

২.৯। মাতৃমৃত্যু হারও দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু জরিপ ২০০১ (Bangladesh Maternal Mortality Survey, 2001) অনুযায়ী ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে ৩২০ জন।

(খ) **শিক্ষা বঞ্চিত দারিদ্র্য ঃ** নব্বইর দশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার যেখানে ছিল ৫৯ শাতংশ, ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ শতাংশে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেণ্ডার ভেদাভেদ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শ্রেণীতে জেণ্ডার ভেদাভেদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার এই ব্যবধান হ্রাসের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সার্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সমস্যা বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছে যা সম্ভাবনাময় মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে।

(গ) **পুষ্টি বঞ্চিত দারিদ্র্য ঃ** আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিশুদের পুষ্টির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ৬-৭ মাস বয়স শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির (Stunting) শিকার শিশুর হার ১৯৯০ সালে ৬৮.৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে ৪৯%-এ নেমেছে। একই সময়ের ব্যবধানে এই শ্রেণীর কম ওজনের শিশুর হার ৭২% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫১%-তে নেমেছে। পুষ্টি ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি শত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও উন্নত দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যাণ্ড হেলথ সার্ভে ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী অপুষ্টির শিকার এবং কম ওজনের। মারাত্মক অপুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলেদের ব্যবধান ১৯৯৬-৯৭ সালের ১০% থেকে বেড়ে ১৯৯৬-২০০০-এ ১৬%-তে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে চরম কম ওজন মাত্রার মেয়ে এবং ছেলেদের ব্যবধান হার ১৯% থেকে বেড়ে ২৬%-এ দাঁড়িয়েছে। গ্রাম ও শহরের শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। ১৯৯৯-২০০০ সালের DHS অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পুষ্টি বঞ্চিত শিশুর হার ৪৭% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৯%। এই হার শহরাঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ৩৫% এবং ৪০%। মাতৃ অপুষ্টি যা Body-Mass Index (BMI) দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং অপুষ্টির সীমা ১৮.৫-এর ভিত্তিতে বাংলাদেশে অপুষ্টির হার সূচক অনেক বেশী। DHS অনুযায়ী এই সূচকে ১৯৯৬-৯৭ সালে মাতৃ অপুষ্টির হার ছিল ৫২% যা ১৯৯৯-২০০০ সালে হ্রাস পেয়ে ৪৫% এ নেমেছে। এই সময় গ্রাম ও শহরের মাতৃ অপুষ্টির ব্যবধান ৫০% থেকে ৬৩%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আয়-দারিদ্র্যের প্রবণতা

উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পর্কটি বিশ্লেষণের জন্য দারিদ্র্যকে শহর ও গ্রাম এলাকার মধ্যে বিভাজিত করে দেখা হচ্ছে। তারপর এলাকাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারাকে দারিদ্র্য প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে এলাকা বিভাজিত প্রবৃদ্ধির তথ্য নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির ধারা একটি প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ ভিত হতে পারে।

দারিদ্র্য সীমা আয়ের ভিত্তিতে দারিদ্যের হার (HCR) সারণি-৮-এ উপস্থাপিত হয়েছে। দারিদ্র্য সীমা আয় নির্ণয় করা হয়েছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ ক্রয় করতে হলে কত খরচ (Cost of Basic Needs =CBN) পড়বে তার পরিমাণকে ভিত্তি করে। সারণিটি থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য-প্রবণতার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

- ১৯৮৮/৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার অনবরত কমেছে;
- অবশ্য ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বেড়েছে নগর এলাকার চাইতে বেশি হারে। গ্রামীণ এলাকায় এই বৃদ্ধির হার ছিল মোট ৮.১ শতাংশ পয়েন্ট এবং নগর এলাকায় ছিল মাত্র ২.০ শতাংশ পয়েন্ট;
- ১৯৯২ সালের পরের চার বছর গ্রামীণ এবং নগর এই উভয় এলাকায় দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে গ্রামীণ এলাকায় এই উন্নতি নগর এলাকার চাইতে অনেক কম দৃশ্যমান। দেখা গেছে, গ্রামীণ খানাগুলিতে যখন প্রতি বছর ১.১ শতাংশ পয়েন্ট দারিদ্র্য কমেছে তখন নগর এলাকার খানাগুলিতে দারিদ্র্য কমেছে ২.৫ শতাংশ পয়েন্ট;
- ১৯৯৬ সালের পরের বছরগুলিতে অর্থাৎ নব্বই-এর দশকের শেষার্ধে দারিদ্র্য অবস্থার একটি বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা গেছে। গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে নগর এলাকার তুলনায় অনেক বেশি হারে। দেখা গেছে, ঐ চার বছর সময়ে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ৩.৭ শতাংশ পয়েন্ট দারিদ্র্য কমেছে সেখানে নগর এলাকায় কমেছে মাত্র ১.৬ শতাংশ পয়েন্ট।

নমনীয় বা উচ্চতর দারিদ্র্য (moderate poverty) রেখার উপর ভিত্তি করেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া গেছে। অবশ্য একই ধরনের লক্ষণ পাওয়া যায় চরম দারিদ্র্য (extreme poverty) রেখার বিচারেও (সারণি-১০)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৮

গ্রাম ও নগর-দারিদ্র্যের প্রবণতা, ১৯৮৫/৮৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত

(উচ্চতর দারিদ্র্য রেখাকে ভিত্তি করে দারিদ্র্য হার মাপা হয়েছে)

সন	মৌলিক প্রয়োজনসমূহের মূল্যকে ভিত্তি করে দারিদ্র্য হার (সংখ্যাগুলি শতাংশে)		
	গ্রাম	নগর	জাতীয় (গ্রাম+নগর)
১৯৮৫/৮৬	৫৩.১	৪২.৯	৫১.৭
১৯৮৮/৮৯	৫৯.২	৪৩.৯	৫৯.১
১৯৯১/৯২	৬১.২	৪৪.৯	৫৮.৮
১৯৯৫/৯৬	৫৬.৭	৩৫.০	৫৩.১
২০০০	৫৩.০	৩৬.৬	৪৯.৮

উৎসঃ BBS (বিভিন্ন বছর), WB (1998, 1992)

সারণি - ৯

১৯৭৩/৭৩ থেকে ১৯৮১/৮২ এবং ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯৫/৯৬

সময়কালের দারিদ্র্য প্রবণতা পরিবর্তনের তুলনা

এলাকা	দারিদ্র্য হারের বাৎসরিক শতকরা পয়েন্ট পরিবর্তন	
	১৯৭৩/৭৪ - ১৯৮১/৮২	১৯৮৩/৮৪ - ১৯৯৫/৯৬
নগর-দারিদ্র্য	২.৯৭	২.৯৩
গ্রাম-দারিদ্র্য	১.১০	০.৪০
জাতীয় দারিদ্র্য	১.২৯	০.৯২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ১০

বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য হার : ১৯৮৪ থেকে ২০০০ (শতকরা)

সন	খানার শতকরা ভাগ		
	গ্রাম	শহর	উভয়
১৯৮৩/৮৪	৪২.৬	২৮.০	৪০.৯
১৯৮৫/৮৬	৩৬.০	১৯.৯	৩৩.৮
১৯৮৮/৮৯	৪৪.৩	২১.৯	৪১.৩
১৯৯১/৯২	৪৬.০	২৩.৩	৪২.৭
১৯৯৫/৯৬	৩৮.৫	১৩.৭	৩৪.৪
২০০০	৩৪.৫	১৬.৯	৩০.০

উৎসঃ BBS (various years)

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় ১৯৮৫/৮৬ অর্থ বছরের পূর্বের সময়কালের দারিদ্র্য অবস্থার প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ করে ১৯৮৫/৮৬-১৯৯৯/২০০০ সময় কালের মধ্যে। দীর্ঘ সময়ের দারিদ্র্য প্রবণতার সরাসরি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা পদ্ধতিগতভাবে সমস্যাবহুল। কেননা ১৯৭৩/৭৪ ও ১৯৯১/৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্য সরাসরিভাবে তুলনীয় নয়। কাজেই ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮১/৮২ সময়কাল এবং ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সময়কালের জন্য পৃথকভাবে দারিদ্র্য হার পরিবর্তন হিসাব করে তারপর তুলনা করা হবে। সারণি-৯-এ এই দুই সময়ের দারিদ্র্য হারের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারণিটিতে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা গেছে যে, প্রথম সময়কালে দ্বিতীয় সময়কালের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি দ্রুত দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে।[১]

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৪

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত ধারা

সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অভাব দূর হয় বা প্রয়োজন পূরণ হয়। কোন দেশে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় তাই হলো সেই দেশের মানুষের অভাব পূরণ তথা জীবন ধারণের ভিত্তি। অর্থনীতির পরিভাষায় এই সম্পদকে জাতীয় সম্পদ বা জাতীয় আয় বলা হয়। কোন দেশের জনগণের সার্বিক অবস্থা কেবল জাতীয় আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, বরং তা কিভাবে বন্টিত হয় ও কাদের মধ্যে বন্টিত হয় তার উপরও উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভর করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য সমস্যার উপস্থিতি জাতীয় আয়ের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম বন্টনেরই ফল। শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশই নয়, উন্নত দেশগুলোও দারিদ্র্য সমস্যায় পীড়িত। একদিকে সম্পদের পাহাড়সম প্রাচুর্য, অন্যদিকে আকাশ ছোঁয়া দারিদ্র্য অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। মানুষে মানুষে সম্পদের এ বৈষম্য সুষ্ঠুভাবে দূর করা না গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা কখনও সম্ভব নয়। এ কারণে সুষ্ঠু ও সুষম আয় বন্টনের মাধ্যমে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম ও পরম লক্ষ্য। দারিদ্র্য বিমোচন তথা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘোচানোর প্রধান ও পূর্বশর্ত হলো, ধনিক শ্রেণীর নিকট থেকে দরিদ্র শ্রেণীর নিকট সম্পদের নীট হস্তান্তর (Net transfer of wealth rich to poor)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে ধনীদের নিকট থেকে দরিদ্র শ্রেণীর নিকট সম্পদ নীট হস্তান্তরের কোন বন্দোবস্ত নাই। ধনীক শ্রেণীর উদ্বৃত অর্থ এরা দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তর করে শুধু এই আশায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের সস্তা শ্রম দিয়ে এই পুঁজি খাটাবে এবং পুঁজির সরবরাহকারী তথা N.G.O.[১] -কে সুদসহ পুঁজি ফেরত দিবে। সচরাচর দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত সংগঠনসমূহের ঋণের সুদ ২০% বলা হলেও গ্রহীতা কর্তৃক সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ফলে কার্যকর সুদের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপরও ঋণ প্রদানের উৎসে হাজার প্রতি ৫০ টাকা হারে ঝুঁকি ফান্ডে টাকা কেটে রাখার ফলে শেষ পর্যন্ত সুদের হার দাঁড়ায় প্রায় ৫০% এর-কাছাকাছি।[২]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একদিকে যেমন নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা ও অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলেও জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন সম্ভব হয়নি, তেমনি অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্র সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপকরণ করায়ত্ত করে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং জনগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীনতা হরণকারী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নৈতিকতা বিবর্জিত সুদ ও শোষণ ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৈষম্য মোটেই দূর হয়নি, বরং বিশ্বের দেশে দেশে দারিদ্র্য ও

১. N.G.O. = Non Government Organigation (বেসরকারী সংস্থা)।

২. মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম : অর্থনীতি গবেষণা (দারিদ্র্য বিমোচন ঃ প্রচলিত কৌশল বনাম ইসলামী কৌশল, ঢাকা), মার্চ ২০০২, সংখ্যা ২, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আয়-বৈষম্য এখন এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত কৌশল ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে কিছু কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বেশ কিছু কর্মসূচী রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

১. নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী

২. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী

৩. গৃহায়ন তহবিল

৪. কর্মসংস্থান ব্যাংক

৫. দু:স্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী

৬. দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচী

৭. আশ্রয়ন প্রকল্প

৮. একটি বাড়ী একটি খামার

৯. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১০. খাদ্য সহায়ক পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (আরএমপি)

১১. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

১২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক)

২. আশা

৩. প্রশিকা

৪. স্বনির্ভর বাংলাদেশ

৫. গ্রামীণ ব্যাংক

৬. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ইত্যাদি।

দারিদ্র্য বিমোচনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ সরবরাহ করছে এবং সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।[১]

উপরোক্ত কার্যক্রমের বাইরেও সুদবিহীন এবং ইসলামী মডেলে কিছু কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে যা অত্র অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

১. বি. দ্র. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

মানবজাতি সৃষ্টির সেরা জীব এবং কর্মক্ষম। নিজ ভাগ্য গড়ার কারিগর। সে নিজে দায়িত্ব নিলেই একটি মর্যাদাপূর্ণ ভবিষৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। পৃথিবীতে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠতম সত্তা বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

«وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ» [১]

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বললো, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জান না।"

দুনিয়ার মানুষের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

«وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ق وَاِنَّه لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ» [২]

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর এবং ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ঃ

«هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه ط وَلاَ يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلاَّ مَقْتًا ج وَ لاَ يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلاَّ خَسَارًا» [৩]

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"

পৃথিবীর সকল সম্পদ মানুষের অধীন করা হয়েছে। মানুষকে সামর্থ্যবান করার লক্ষে অন্যরা শুধুমাত্র সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। যাতে সে সফলকাম হয়।

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩০।

২. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৬৫।

৩. আল-কুরআন, ৩৫ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে পুরোপোরি অবহিত। তাই মানুষের প্রয়োজন ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দিতে তিনি সক্ষম। আল্লাহ্ তাঁর অসীম রহমতে মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক আইনকে সন্নিবেশিত করে তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে একের পর এক বিধান নাযিল করেছেন। যদিও মানুষ সেই বিধান গ্রহণ কিংবা বর্জন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন, তবুও এই বিধানকে তারা ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক এ দুনিয়াতে জীবন যাপন করেছে কি না, তদনুযায়ী মানুষ পরজগতে পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভ করবে।[১]

মানুষ বাস্তব জীবনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে আল-কুরআনে প্রদত্ত নীতিমালা অনুসারে তাঁর দেয়া সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে জীবনকে সৌন্দর্যময় করে গড় তুলবে। তারা আল্লাহ্র দেয়া বিধানের মধ্য থেকেই সম্পদ আহরণ ও উপভোগ করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দেয়া বিধানের খেলাপ করে সম্পদ অপচয় করে, তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের তাতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার আছে। সম্পদ ব্যবহারে ব্যক্তির অধিকার সীমিত করার প্রধান যুক্তি হলো, আল্লাহ্ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন সকল মানুষের জন্য। যাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য আল্লাহ্ বেশি দিয়েছেন তারা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করে অথবা সৎপন্থায় সম্পদ অর্জন করেও তা নিজ ইচ্ছামত বিলাসে এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারে না। কারণ ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত।[২]

জনসংখ্যাকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, সম্পদ হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, সমস্যা হিসাবে। সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় , কোন দেশের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, শ্রমিক বা জনশক্তির উৎস হচ্ছে সেই দেশের জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত, দায়িত্ববান, সচেতন এবং কোন না কোন উৎপাদনশীল কাজে দক্ষ ও নিপুণ হয় তাহলে এই জনসংখ্যাকে জনশক্তি বা মানব সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে এরূপ জনশক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে কোন দেশের জনসংখ্যা যদি অশিক্ষিত, অদক্ষ ও সম্পদের সদ্ব্যবহারে অনুপযুক্ত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ঐ দেশের জনসংখ্যা জনশক্তি বা মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং এরূপ জনসংখ্যা দেশের জন্য দায় বা সমস্যা হিসেবে দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, কোন দেশে জনসংখ্যা থাকলেই যে তা জনশক্তি বা মানব সম্পদ তা বলা যায় না। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অভাব নাই। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এ দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ১৪/১৫ কোটি লোকের বাস। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭ ভাগের ১ ভাগ লোক এদেশে বাস করে এবং এদিক দিয়ে পৃথিবীতে দেশটির

১. এম. উমর চাপরা : ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (অনু: ড. মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), হি. ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ২৪।

২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩য় সংস্করণ, হি. ১৪২৪/খৃ. ২০০৩/ পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান ৯ম। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অন্যতম। দেশটিতে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। তাই বলে এই জনসংখ্যাকে জনশক্তি বা জনসম্পদ বলার অবকাশ নেই। কেননা এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে এখনো জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ, উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের সুষম ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলে এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা অন্যতম জাতীয় প্রধান সমস্যা হিসাবেই বিবেচিত হচ্ছে।[১]

উন্নয়ন, উন্নয়নের সংজ্ঞা ও গতিধারা

গ্রীকদের ব্যবহৃত 'ফিসিস' (Physis) শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে বৃদ্ধি উন্মোচিত বা বিকশিত হওয়া। গ্রীকরা 'ফিসিস' অভিধাটি সব ধরনের জীবন্ত জিনিস যেমন গাছ, প্রাণী, মানুষ বা সমাজের বেলায় রূপক হিসাবে ব্যবহার করতো। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়নের বহু মতবাদ, তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন।

সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা, মতবাদ ও তত্ত্বের আলোচনায় উন্নয়ন অভিধাটি নানাভাবে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি আসলে একটি চলমান ধারণা যা সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তবে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে বলতে হয় ঃ উন্নয়ন হচ্ছে বিদ্যমান অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যা বিভিন্ন মাত্রায় পরিব্যপ্ত (desireable change of existing situaion encompassing different dimensions)। তবে যে কোন পরিবর্তন উন্নয়ন নয়। কোন পরিবর্তন ইতিবাচক বা কাঙ্খিত হলে তাকে উন্নয়ন বলে গণ্য করা হয়।

উন্নয়নের সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'উন্নতি', 'অগ্রগতি'। এছাড়া বৃদ্ধি, ইতিবাচক পরিবর্তন, বিবর্তন, আধুনিকায়ন ইত্যাদি শব্দ ও উন্নয়নের অর্থ বহন করে। উন্নয়ন বিভিন্ন মাত্রায় পরিব্যপ্ত বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা বোঝানো হয়েছে।[২]

জনগণই হচ্ছে একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। দীর্ঘ, সুস্থ্য ও সৃষ্টিশীল জীবন উপভোগের উদ্দেশ্যে জনগণের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করাই উন্নয়নের আসল উদ্দেশ্য। কথাটিকে একটি সহজ সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পণ্য ও আর্থিক সম্পদ পুঞ্জীভূত করার আশু তাকিদের কারণে এ সত্যটি প্রায়শ ভুলে যাওয়া হয়। সাম্প্রতিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা পণ্য ও সম্পদ যে একটি পন্থা মাত্র এ সত্যের একটি শক্তিমান অনুস্মারক। উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ।[৩]

উন্নয়ন বলতে সাধারণত কোন কিছুর অনুকূল পরিবর্তন বুঝানো হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা একই অবস্থায় থেমে থাকেনি। মানুষ তার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আদি যুগ থেকে প্রতিনিয়ত চিন্তা-ভাবনা

১. পরিবেশ শিক্ষা সমাজ (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২২৪-২২৫।

২. আবু হামিদ লতিফ : শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (প্যাপিরাস, বাংলাবাজার, ঢাকা), খৃ. ২০০৩, পৃ. ৯-১০।

৩. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী বাংলাদেশ), খৃ. ২০০৩, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার-উদ্ভাবন ইত্যাদিতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এভাবে ক্রমপরিবর্তন ও বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের উত্তরণ বা উন্নয়ন ঘটেছে। বস্তুত কোন কিছুর পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশে ক্রম উন্মোচন ঘটানোর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়ন প্রত্যয়টি বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বস্তুগত উন্নয়ন বলতে শিল্পায়ন, শহরায়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি বুঝানো যেতে পারে। আবার অবস্তুগত উন্নয়ন বলতে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে বুঝানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত উন্নতির সঙ্গে অবস্তুগত সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিধান করা এবং সার্বিকভাবে সমাজে সকলের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি আনয়ন এবং মানব কল্যাণে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার উন্নয়নের লক্ষ্য।[১]

মানব উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যই হলো মানব সম্পদের উন্নয়ন। ব্যাপক অর্থে মানব উন্নয়ন হলো জনসাধারণকে দীর্ঘ, সুস্বাস্থ্যময় এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবন মান উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপকরণ। সামাজিক খাতে ব্যয়ের অর্থ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করা।[২]

অপরদিকে মানুষের কাম্য নির্বাচনী সুযোগের পরিসীমা বিস্তৃত করার প্রক্রিয়ার নামই মানব উন্নয়ন। নীতিগতভাবে এসব সুযোগের সংখ্যা অসীম এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব সুযোগ বদলে যায়। কিন্তু উন্নয়নের সকল স্তরে মানুষের জন্য এসব সুযোগের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয় হচ্ছে ঃ একটি দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন উপভোগ, জ্ঞানার্জন এবং একটি সুন্দর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহের প্রবেশাধিকার। যদি এসব অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ লাভ না হয়, তাহলে অন্য অনেক সুযোগই দুর্লভ থেকে যাবে।

কিন্তু মানব উন্নয়ন এখানেই শেষ হয়ে যায় না। এর বাইরেও একাধিক সুযোগ রয়েছে যা বহু মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এসব সুযোগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনশীলতার সুযোগ এবং ব্যক্তিগত আত্মসম্মান ও সুনিশ্চিত মানবাধিকার পর্যন্ত বিস্তৃত মানব উন্নয়নের দুটো দিক আছে : মানুষের সক্ষমতা গঠন, যেমন উন্নত স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা এবং তাদের অর্জিত সক্ষমতার ব্যবহার-বিশ্রাম, উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড অথবা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয়তার জন্য। যদি মানব উন্নয়নের তুলাদণ্ড খুব সূক্ষ্মভাবে এ দু'টো দিকের ভারসাম্য রক্ষা না করে, তাহলে উল্লেখযোগ্য মানব হতাশার জন্ম হতে পারে।

---

১. পরিবেশ শিক্ষা-সমাজ (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২২৩ ।

২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৩ (অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়), জুন ২০০৩, পৃ. ১১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়নের এ সংজ্ঞা অনুসারে আয় সুস্পষ্টভাবে অনেকের মধ্যে শুধু একটি জনকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এটি হয়তো গুরুত্বপূর্ণও। কিন্তু এটিই মানবজীবনের সামাগ্রিক সমষ্টি নয়। সুতরাং উন্নয়নকে অবশ্যই আয় ও সম্পদের বিস্তার প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করতে হবে। এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে মানুষ।[১]

(ক) শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের মুখ্য উপকরণ। সুতরাং একটি সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গুণসম্পন্ন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা উপকরণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষাকে জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[২]

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় গোটা জাতীয় সত্তার কাঠামো। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্রগঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিভাগে নেতৃত্ব দানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ হিসাবে যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের যোগ্য হতে হলে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে জ্ঞান ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনের সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চালাতে হয়, এক কথায় তারই নাম শিক্ষা।

উন্নয়নে শিক্ষা

বহু কাল আগে থেকেই মনে করা হতো, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটা সম্পর্ক আছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সামাজিক পরিকল্পনাবিদ ও বিদ্বজ্জনের একটা সাধারণ ঐকমত্যে পৌছান যে,সামাজিক অগ্রগতি ও ধারাবাহিক উন্নয়নে শিক্ষা একটি মুখ্য পরিবর্তন সাধক (change agent)।

একটি জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু নিমিত্ত স্বরূপই (instrumental) নয়, খুবই প্রয়োজনীয়। একটা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী। সুতরাং শিক্ষায় বিনিয়োগ মানে উৎপাদনশীলতায় বিনিয়োগ, সমাজ পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও

১. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩ (অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিজ্ঞান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়), পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা যে একটা অসামান্য ভূমিকা পালন করে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১]

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যে কোন সমাজে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। কুড়িটি দেশের কৃষি শিক্ষার ওপর গবেষণা কর্মের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ৪ বছর স্কুলে লেখাপড়ার ফলে কৃষি উৎপাদন ৭.৪ শতাংশ বেড়েছে।[২]

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা ও উন্নয়নের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বেশ জটিল। কিন্তু মানুষকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনায় আনলে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মানব সম্পদ/মানব পুঁজির বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠে। উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সঠিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং যথাযথ প্রযুক্তি নির্দিষ্টকরণ ও প্রয়োগের জন্য দক্ষ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক, নিষ্ঠাবান, সৎ ও উৎপাদনশীল মানুষ প্রয়োজন। দেশের জনসম্পদকে মানব পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই।[৩]

(খ) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে মানব উন্নয়ন। টেকসই ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে দেশের যুব সমাজকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরে এবং উন্নয়নে যুব শক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও অনুদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, ইয়াতীম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া দরকার।[৪]

অপরদিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো দেশের সামগ্রিক আর্থিক মধ্যসত্তায়নের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে সচল রাখার মূল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানতকে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে রূপান্তরিত করে অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে

---

১. আবু হামিদ লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১।

২. World Bank, Education Sector Policy Paper. Washigton DC 1980 a : 50 (cited Fagerland Saha in Education and National Development 1985 : 77).

৩. আবু হামিদ লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ ।

৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, পৃ. ১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদান করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উন্নয়নে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়।[১]

ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِى كِتبٍ مُّبِيْنٍ»[২]

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত ; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"

আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, সাথে সাথে জীবিকা অন্বেষণের ও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

«هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِه وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ»[৩]

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ঃ

«وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَ كَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ»[৪]

"তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।"

আল্লাহ্ তা'আলা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের পাশাপাশি তাঁর অনুগ্রহ তথা জীবনোপকরণ অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

«فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»[৫]

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী (মুখবন্ধ থেকে), খৃ. ২০০২ - ২০০৩।

২. আল-কুরআন, ১১ : ৬ ।

৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫ ।

৪. প্রাগুক্ত, ৪১ : ১০।

৫. প্রাগুক্ত,৬২ঃ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর্মবিমুখতার কোন স্থান নেই। ইসলামের নীতি হলো,পরনির্ভরতা পরিহার করে সচ্ছলতা অর্জন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«انَّ اللّٰهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ»[১]

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

«وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى»[২]

"আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে।"

মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে তিনটি প্রধান জিনিস দিয়েছেন : একটি দীন বা জীবন-ব্যবস্থা, আরেকটি সম্পদ, আর তৃতীয়টি হলো জ্ঞান। আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম করে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে যদি মানুষ অগ্রসর হয়, তবে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব। সম্পদ এবং আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে সে সম্পদ ব্যবহারের দায়িত্ব বা খিলাফত আল্লাহ্র এক পবিত্র আমানত। মানুষ আল্লাহ্র খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ এই পবিত্র আমানতের দায়িত্ব আসমান ও পর্বতমালার সমুদয় শক্তিকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনটিই সেই খিলাফতের পবিত্র আমানত গ্রহণ করতে সাহস করেনি। একমাত্র মানুষই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মানুষ আল্লাহ্র দীন ত্যাগ করে বসে এবং আল্লাহ্র দেয়া বণ্টন ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে সম্পদ বণ্টনের নিজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করে।[৪]

(গ) **দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান ঃ**

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নেই। শিল্পায়নের গোড়ার দিকের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য কমাতে সহায়ক হয়নি। তার কারণ হচ্ছে, শিল্পায়নের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যেমন পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তি, অযৌক্তিক আমদানি ইত্যাদি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এমন পন্থা বেছে নেয়া যায় যে, প্রবৃদ্ধির অর্জন দারিদ্র্য লাঘব করতে সহায়ক হবে। তবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে এটাও স্বচ্ছ যে, দরিদ্রদের জন্য প্রবৃদ্ধির সুফল তখনই বেশী হয়, যখন কোন দেশে সম্পদ বণ্টনে অসাম্য কম থাকে। এই উপযুক্ত ধরনের প্রবৃদ্ধির

১. আল-কুরআন, ১৩ঃ১১।

২. আল-কুরআন, ৫৩ ঃ ৩৯।

৩. এ জেড.এম. শামসুল আলম : ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা (ই ফা বা, ৩য় সংস্করণ), হি, ১৪২৪/খৃ. ২০০৩, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নিবেদিত প্রচেষ্টা আছে কিনা তার উপর নির্ভর করবে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, এই উভয় দিকের সাফল্য।[১]

(ঘ) **জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন**

ঘনবসতিপূর্ণ যে কোন দেশে বৈষয়িক সম্পদ সংরক্ষণে শিক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার যথার্থ ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমেও শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী একটি দেশের সম্পদ। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য-সেবা, বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ (প্রতি জনে ২২০০-২৫০০ ক্যালরি) এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগানোর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা গেলে, জনগণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, আয়ুষ্কাল বাড়ে এবং জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয় একটির উন্নতি হলে অপরটির ওপর এর প্রভাব পড়ে। এক কথায় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি যোগান মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২]

অপরদিকে পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের আচরণই প্রধানত প্রকৃতির ক্ষতির কারণ। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা জীবনের গুণগত মান বজায় রাখার একটি অপরিহার্য শর্ত। উন্নয়নশীল দেশে অপর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশনের দুরবস্থা, দূষণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মাটি ক্ষয়, লবণাক্ততা, বন উজাড় ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সাথে এসব দেশের গণ-দারিদ্র্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক আচরণ গড়ে তুলতে পারলে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সরকার ও সমাজ পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব। মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পরিবেশ।[৩]

(ঙ) **সাংস্কৃতিক উন্নয়ন**

সংস্কৃত শব্দটি 'সংস্কার' শব্দ থেকে গঠিত। মার্জিত ও পরিশীলত মানসিকতাই সংস্কৃতি। মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, ইংরেজীতে তা-ই কালচার এবং আরবীতে তাই হলো ছাক্বাফাত (ثقافة)। আরবী তাহযীব (تهذيب) শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ছাক্বাফাত-এর

১. রুশিদান ইসলাম রহমান : দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৭, পৃ. ০২।

২. আবু হামিদ লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

শাব্দিক অর্থ হলো : চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ- সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবী 'ছাক্বাফা' অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া। আর আস-ছাক্বাফ বলতে বুঝায় তাকে যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবী হাযযাবা (هذب) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজী Culture মানে কৃষিকাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন-পালন করা। এর আর একটি অর্থ হলো : Intellectual Development, Improvement by (mental or physical) Training : অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) প্রশিক্ষণের সাহায্যে মানবিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।[১]

একটি সমাজ ব্যবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো রূপান্তরশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। সংস্কৃতি হলো গতিসম্পন্ন। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত না থাকলে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সুপরিচিত মানবগোষ্ঠীই জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও কর্মকাণ্ড দ্বারা।[২]

সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন সত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সামগ্রিক রূপ। শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবন ও জগত সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাবে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা জীবন দর্শন। ব্যক্তি বা সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী জীবনবোধের যে প্রভাব পরিলক্ষিত তা-ই হলো ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন। যদি ইসলামকে পার্থিব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে ভীষণ ভুল হবে। কারণ ইসলাম বস্তুকে অস্বীকার করে না বরং পার্থিব জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একে অপরিহার্য উপাদান রূপে গণ্য করে। তবে বস্তুকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে যদি মানুষ নিজেকে বস্তুর কীটে পরিণত করে ফেলে এবং নিজের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যায়, তাহলে তার সঙ্গে ইসলামের আপোষ নাই। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইসলাম কোন দিনই আত্মাকে নিষ্পিষ্ট করতে পারে না। আত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিকের কল্যাণই ইসলামের লক্ষ্য। চরম বস্তুবাদ তাই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ।[৩]

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম : শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় প্রকাশ), হি: ১৪২৩/খৃ. ২০০২, পৃ. ২৫২; Hanswehr : A Dictionary of Modern Written Arabic (Macdonald Events Ltd. London). 1980, p. 104.

২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, পৃ. ১২৪।

৩. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা : সাংস্কৃতিক রূপরেখা, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা), ১৯৬৬, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) রাজনৈতিক উন্নয়ন

একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো রাজনৈতিক উন্নয়ন। রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে উন্নয়নের গতিধারা এগুতে পারে না। এছাড়াও রাজনৈতিক স্তিতিশীলতা না থাকলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে উৎসাহ পায় না। যার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। বিনিয়োগের অভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সকল স্তরে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

আধুনিক সমাজে রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজজীবন, এমনকি ব্যক্তিজীবনের সর্বত্র রাজনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সমাজ দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ একমত যে, একটি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সার্বিক উন্নয়ন ঐ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত।

সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক, বিশেষ করে যোগ্য, দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রয়োজন। এরিস্টোটলের মতে যোগ্য ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি সদ্‌গুণের অধিকারী, সৎ, ন্যায়বান ও মিতাচারী এবং নিজের স্বার্থ অপেক্ষা সমাজের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এছাড়া বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র চালনার জন্য সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের লোক তৈরীর যথার্থ স্থান হতে পারে যদি এসব শিক্ষায়তনে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও মানবিক শিক্ষাদানের, সত্য সন্ধানের ও যথার্থ জ্ঞান চর্চার সুযোগ থাকে। বস্তুত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জাতিসত্তা, জাতীয়তা, ভাষা, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক ঐকমত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১]

১. আবু হামিদ লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাতের পরিচয় ও বিকাশধারা

পরিচ্ছেদ ঃ ১

যাকাতের পরিচয়

যাকাত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিধানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই যাকাতের স্থান। ঈমান ও নামায কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায় করেই কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين ط ونفصّل الايات لقوم يعلمون»[১]

"এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই ; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।"

যাকাত অর্থনৈতিক ইবাদত। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিধানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মেরুদন্ডও বলা হয়। মহানবী (স) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন বলে উল্লেখ করেছেন। যাকাত একদিকে দরিদ্র, অভাবী, অক্ষম ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি, অপরদিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্ব মানবতাকে এক বৈষম্যহীন আদর্শ সমাজ গঠনের সুষম পরিবেশ সৃষ্টি করে এ যাকাত ব্যবস্থা। তাই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অতি ব্যাপক ও সুবিস্তৃত।

❒ যাকাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ ঃ "যাকাত" আরবী শব্দ, এর আরবী উচ্চারণ হল زَكَاةٌ বা زَكٰوةٌ যা একবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে زَكَوَاتٌ (যাকাওয়াতুন)। শব্দটি মূলত زكو এবং زكى মূলধাতু থেকে গঠিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে শব্দটি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া ও পরিমাণে বেশী হওয়া বোঝায়। যেমন বলা হয়,

"زَكَا فُلَانٌ" অমুক যাকাত আদায় করেছে। অতএব যাকাত শব্দটি একত্রে পরিমাণে বেড়ে যাওয়া, প্রবৃদ্ধি অর্জন, পবিত্রতা ও শুচীতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রশংসা, কোন জিনিসের উত্তম অংশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী অভিধানে শব্দটি النماء، الطهارة، البركة، المدح এ চারটি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২]

---

১. আল-কুরআন ৯, ঃ ১১।

২. মো'জামুল ওয়াসীত, দারুল ইলম, দিল্লী, ১. খ, পৃ. ৩৯৮; আল-হোসাইন ইবন মোহাম্মাদ আল-ইসফাহানী ঃ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মুস্তফা আলবানী আলহালাবী ওয়া আওলাদুহু, মিসর), হি. ১৩৮১, পৃ. ২৩১; জিবরান মাসউদ ঃ আররাইদ (দারুল ইসলাম লিল মালাঈন, বৈরূত), ১. খ, খৃ. ১৯৮১, পৃ. ৭৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত একদিকে যাকাত দাতার মন ও আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং তার ধন-সম্পদকেও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ; অন্যদিকে তা দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম লোকদের অভাব পূরনে সহায়তা করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদে ক্রমবৃদ্ধি বয়ে আনে। বস্তুতঃ যাকাতের দ্বারা ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয় তা নয়; বরং যাকাত দানকারীর মানসিকতা ও ধ্যান-ধারনা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمط ان صلوتك سكن لهم ط والله واسع عليم»[১]

"তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন, আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির বাহক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

যাকাতের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। এজন্য যে, যাকাত আদায়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত আদায়কারীর সম্পদ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله ج وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فالئك هم المضعفون»[২]

"মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না ; কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক, তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধিশালী।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«يمحق الله الربوا ويربى الصدقت ط والله لايحب كل كفّار اثيم»[৩]

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"

যাকাতের অর্থ পবিত্র হওয়া। এজন্য যে, সম্পদের আধিক্য অনেক সময় মানব মনে সম্পদের প্রতি লোভ লালসা বৃদ্ধি পায়। এ লোভ লালসাকে বিদূরিত করাই যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনন্তর যাকাত দাতার সম্পদের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ যাকাত রয়েছে, তার মালিক মূলত যাকাত পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব সে তার সম্পদ থেকে অন্যের অংশ (যাকাত) পৃথক করে দিয়ে তাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»[৪]

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।"

---

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

২. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৩৯।

৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৬।

৪. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«والذين فى اموالهم حق معلوم ـ للسائل والمحروم»[১]

"আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের।"

অতএব যার উপর যাকাত ফরয, সে যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে অপরের হক নষ্ট করার কারণে তার গোটা সম্পদ অপবিত্র হয়ে যায়। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি ও তার সম্পদ পবিত্র হয়। তাই যাকাত গরীবদের উপর ধনীদের কোন দয়া নয়, বরং তা ধনীদের সম্পদে গরীবদের ন্যায্য অধিকার। তবে শব্দটি মূলত ঃ «التطهير والطهارة» (পবিত্রতা) অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

«قد افلح من زكها»[২]

"সেই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করবে।"

যাকাত শব্দটি যে المدحُ (প্রশংসা) অর্থে ব্যবহৃত হয় তার প্রমাণ কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ

«فلا تزكوا انفسكم ط هو اعلم بمن التقى»[৩]

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কর না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।"

মোটকথা অভিধানে যাকাত (زكوة) শব্দটি–

النماء – ক্রমবৃদ্ধি

البركة – কল্যাণ

الطهارة – পবিত্রতা

المدح – প্রশংসা

النفقة – ব্যয়-খরচ, ভরনপোষণ

الحق – অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে প্রতিটি শব্দই যাকাত অর্থ দান করে, তবে কখনো কখনো শব্দটি যাকাত আদায় করা, সাদাকাহ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব অর্থ দান করে।[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৭০ ঃ ২৪-২৫।

২. আল-কুরআন, ৯১ ঃ ৯।

৩. আল-কুরআন, ৫৩ ঃ ৩২।

৪. আবুল ফজল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মানজুর ঃ লিসানুল আরব (দারু সাদির, বৈরূত, তা.বি.) ২ .খ, পৃ. ৩৬; মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল-ফিরূজাবাদী ঃ আলকামূস আলমুহীত (আল মুয়াস্সাসাতুল আরাবিয়া, বৈরূত, তা.বি)., ৪. খ, পৃ ৩৪১; মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ্শাওকানী ঃ নাইলুল আওতার শারহু মুনতাকিল আকবার (মাকতাবাতু দারিত্ তুরাছ, কায়রো, তা.বি.), ৪. খ, পৃ. ১১৪; হাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-কাহলানি ঃ সুবুলুস্ সালাম শারহু বুলুগিল মারাম মিন জামঈ আদিল্লাতিল আহকাম (দারু ইহ্য়াইত্তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত), ২. খ, হি. ১৩৭৯/খৃ. ১৯৬০) পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

পারিভাষিক অর্থ

শরী'আতের পরিভাষায় 'যাকাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝানোর জন্য ; যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ঐ ফরযকৃত সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান করাকেও যাকাত বলে।[১]

যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আরো উল্লেখ্য যে, "নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে, নির্দিষ্ট পরিমাণ, নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ একটি শ্রেণীকে, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, আত্মশুদ্ধি ও সম্পদের পবিত্রতার জন্য যে সম্পদ আদায় করা হয় তা হলো যাকাত।"[২]

মাওলা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম[৩] বলেন ঃ

"যাকাত বলা হয় সেই আর্থিক ইবাদতকে, যা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার হক আদায় করার উদ্দেশ্যে, ধন সম্পদ পবিত্র ও শুদ্ধ করার জন্য, নিজের নফ্স ও সমাজ পরিবেশকে সকল প্রকার লোভ, কৃপণতা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং দারিদ্রতা মোচনের জন্য সমাজের সামর্থ্যবান লোকদের উপর তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র, অভাবী ও সাহায্য প্রার্থীকে প্রদান করা"।[৪]

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ ফিকহুয্ যাকাত (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রো : ২১তম সংস্করণ), হি. ১৪১৪/খৃ. ১৯৯৪, ১.খ, পৃ. ৫৩। "تطلق على الحصة المقدرة من المال التى فرضها الله للمستحقين . كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة"

২. আবদুর রহমান আল-জাযিরী ঃ কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়া (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা), হি. ১৪০৬/ ১.খ, খৃ. ১৯৮৬), পৃ. ৫৯০ ; আল-হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল্ ফাররা আল-বাগাবী ঃ কিতাবুয্ যাকাত মিনাত্ তাহ্জীব (বারিদ, দারুল, বুখারী, হি. ১৪১৩/খৃ. ১৯৯৩, পৃ. ৩৯; লিসানুল আরব (প্রাগুক্ত), ১৪. খ, পৃ. ৩৫৮ ।

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ঃ বাংলা ১৩২৫ সনের ৮ ফাল্গুন, (ইংরেজী ১৯১৮ সালের ২ মার্চ) সোমবার বাংলাদেশের বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তার প্রায় ৬০ টিরও বেশী অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে– 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', সুন্নাত ও বিদয়াত', পরিবার ও পারিবারিক জীবন', আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার' ইত্যাদি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করেও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীকৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান', (দুই খন্ড) ও 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান', মুহাম্মাদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহ্কামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির উর্দ্ধে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি.)-র অন্তর্গত ফিক্হ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সৃচিত 'আলকুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। এই যুগ স্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজী ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন।
(বিঃ দ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ: ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২১. খ, পৃ, ১০)।

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম: ইসলামের অর্থনীতি (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা), ৭ম প্রকাশ ঃ হি. ১৪১৯/খৃ. ১৯৯৮, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী বলেন ঃ

"ركن الزكاة هو اخراج جزء من النصاب الى الله تعالى وتسليم ذالك اليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه اليه او الى يد من هو نائب عنه وهو المصدق"[১]

"যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্তর্ভক্ত। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিসাবভুক্ত সম্পদ থেকে মালিকানা ত্যাগ পূর্বক কোন দরিদ্রকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া অথবা তাকে সম্পদের প্রতিনিধি নিয়োগ করা।"

এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে– কোন মুসলিম ব্যক্তির আয়ত্বাধীন ও অর্জিত ধন-সম্পদের যদি এক বছর পূর্ণ হয় এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ উদ্ধৃত থাকে তবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করে দেয়া বাধ্যতামূলক। এ দান করাকে যাকাত বলে।

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি।[৩] যাকাত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত করে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে বিশুদ্ধ পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখার অন্যতম শর্ত হিসাবে অশ্লীলতা, নগ্নতা মুক্ত করার জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগতথাকার সাথে যাকাত ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ আকরাম খান যাকাতের সংজ্ঞায় বলেন ঃ

Zakah is an obligatory financial levy on all surplus wealth and agricultural income of the Muslims, it is charged at varying rates and can be collected by the state. Its objective is to provide financial support to specified categories of people such as the poor and the needy.[২]

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি।[৩] যাকাত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্তকরে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে বিশুদ্ধ পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখার অন্যতম শর্ত হিসাবে অশ্লীলতা, নগ্নতা মুক্ত করার জন্য নামায প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত থাকার সাথে যাকাত ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

«وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلوة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا»[৪]

"এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে ; প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িওনা। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান কবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে ; হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

১. আল-ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী: বাদাইউস্ সানাইউ (মাকতাবদা রশীদিয়াহ, পাকিস্তান), ২.খ, ১ম সংস্করণ, হি. ১৪১০/খৃ. ১৯৯০, পৃ. ৩৯।

২. Muhammad Akram Khan : An Introduction to Islamic Economics (International Institute of Islamic thought. Islamabad, Pakistan), 1994. P. 81.

৩. Zohurul Islam, Islamic Economics (Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka) 1997, Ist Ed, P. 183.

৪. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বাস্তবিকপক্ষে শুধু দুঃস্থ মানবতা প্রতিপালনের একটি উপায়ই নয়, বরং যাকাত নামাযের পরপরই একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত ও ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন মানুষ নিজের প্রিয় সম্পদ স্বেচ্ছায় খুশী মনে ব্যয় করে, তখন মানুষের অন্তরে এক আলোর সৃষ্টি হয়, অভ্যন্তরীণ মলিনতা ও পার্থিব মোহ থেকে মন পবিত্র হয়, অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা উৎকর্ষ লাভ করে এবং হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসা নিবিড় ও প্রগাঢ় হয়। অবশ্য যাকাত প্রদান এ কথাও প্রমাণ করে যে, যাকাতদাতার মনে আল্লাহ্‌র ভালবাসা বিদ্যমান এবং যাকাত প্রদান আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধিতেও এক ফলদায়ক কার্যকরী উপায়। এ বাস্তবতার আলোকেই আল্লাহ্ তা'আলা 'যাকাত'-এর জন্য সাদাকা ও 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্'-এর মত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'সাদাকা' শব্দ 'সিদ্‌ক' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো– অকপটতা ও সত্যবাদিতা। অর্থাৎ সাদাকা প্রদান এ কথা প্রমাণ করে যে, সাদাকা প্রদানকারীর মনে সত্যবাদিতা ও ঐকান্তিকতা বিদ্যমান। সাদাকা প্রদান অবশ্য তা বৃদ্ধিরও উপায়। ইন্‌ফাক ফী সাবীলিল্লাহ্-এর অর্থ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়। শব্দটি যাকাতের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে তুলছে। যেহেতু কুরআন চায় বাস্তবতা ও মূল বস্তু। এ কারণেই কুরআন এই তিনটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেছে এবং এ তিনটির মধ্যে কোন পার্থক্য রেখা টানছে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা ব্যয় করে, তা যাকাত, সাদাকা ও 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্'ও বটে। প্রাণশক্তির দিক থেকে এ তিনটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে ফিক্‌হের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য রয়েছে। (ফিক্‌হের দৃষ্টকোণ থেকে যাকাত এবং নফল সাদাকাত ও খয়রাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফিক্‌হের পরিভাষায় যাকাত হলো, যা বিধিবদ্ধভাবে বান্দার উপর ফরয এবং তা আদায় করা না হলে বান্দা গুনাহগার হবে এবং আখিরাতে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।) যাকাত ব্যতীত বান্দা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করে, তা শরী'আতে বড়ই ভাল কাজ, নিজের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধির জন্য জরুরী। কিন্তু তা ফরয নয়। স্বেচ্ছায় জনহিতকর কাজের জন্য এ ধরনের ব্যয়ের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং একে ক্ষমা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১]

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস এবং একটি সমাজ সেবামূলক অপরিহার্য বিধান।[২] যাকাত ব্যবস্থাকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের এক মহামাধ্যম হিসাবে নির্ধারন করেছেন। যাকাত প্রদানের ফলে যাকাত দাতার অবশিষ্ট সম্পদ ও সেই সঙ্গে তার আত্মারও পরিশুদ্ধি ঘটে।[৩]

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে মালিকানা ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান। এই ব্যবস্থা সম্পদের মালিককে তার সম্পদের একটি অংশ নিঃস্বার্থভাবে অপরের মালিকানায় হস্তান্তর করাতে বাধ্য করে। ফলে সমাজে অর্থের প্রবাহে ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধন-সম্পদ

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী : আলকুরআনের শাশ্বত শিক্ষা (অনূ. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ই ফা বা, ঢাকা), খৃ. ২০০৩/হি: ১৪২৪, পৃ. ২১৭।

২. Salem Azzam:Islam and Contemporary Society (London : Islamic Council of Europe), 1982, P. 102.

৩. আবদুল খালেক: অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ই ফা বা, ঢাকা), খৃ. ১৯৮৭, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে, ব্যক্তিকে তার যেভাবে ইচ্ছা আয় ও যে খাতে ইচ্ছা ব্যয় করার এখ্‌তিয়ার প্রদান করে এবং এভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে অত্যাচারী ও স্বার্থপর সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ করে দেয়। তাতে দরিদ্র দুঃস্থ সর্বহারা মানুষকে না খাইয়ে মারার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা মালিকানা জাতীয়করণ তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাত্র ৫০ ভাগ পলিটব্যুরো ও প্রেসিডিয়ামের হাতে ন্যস্ত করে প্রান্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি চালু করার প্রয়াস পেয়েছে।

ইসলামী শরী'আয় মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক যাকাত ফরয করার মধ্যে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর ধন-সম্পদ তথা সমগ্র সৃষ্টির একচ্ছত্র মালিক ও সার্বভৌম শক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তাঁর মালিকানাধীন ধন-সম্পদ ভোগ করতে অবশ্যই সাহেবে নিসাবকে তাঁরই নির্দেশ মুতাবিক নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করতে হবে।[১]

প্রকৃতপক্ষে যাকাত শুধু কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বৈষম্য দূরীকরণের সেতুবন্ধনই নয়। কোন মুসলিম জনপদে যদি যাকাত নেয়ার মত কোন দরিদ্র না থাকে, তবে অপর মুসলিম জনপদের দরিদ্র ও মিসকীনদের মধ্যে তা বিতরণ করতে হবে। এভাবে যাকাত ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সমস্যা সংকুল দু:খ-বেদনা ও দারিদ্র্য মোচনের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত কার্যকর পন্থা, বাংলাদেশ তথা গোটা মুসলিম বিশ্বে যাকাত, 'উশর (কৃষি উৎপাদনের যাকাত), খনিজ সম্পদ, গচ্ছিত সম্পদ, গানীমা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ), সাদাকা, মানত, গবাদি পশুর যাকাত শরী'আত নির্ধারিত নিয়মে বাধ্যতামূলকভাবে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে খুব বেশী নয়, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব।

আজকের পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া, পুঁজিপতিদের জন্য লাইফ ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে সর্রহারা দু:খী দরিদ্রদের জন্য কোন প্রিমিয়াম ছাড়াই সুনিশ্চিত আর্থিক ব্যবস্থা রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব।

আজকের প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং আফ্রিকার অনেক মুসলিম জনপদ দারিদ্র্য সীমার নিচে অসহনীয় দু:খ-যাতনার মধ্যে জীবন যাপন করছে। তার অনাহারে অর্ধাহারে বস্ত্রহীন হয়ে বাস্তুহারা জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

মুসলিম বিশ্ব যদি ইসলামের বিশ্বজনীন চিরন্তন আদর্শের বুনিয়াদে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতো,

---

১. মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্ : যাকাতের শর'য়ী গুরুত্ব ও অবদান (ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ইফাবা, ঢাকা), খৃ. ২০০৩/হি: ১৪২৪, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করে দুস্থের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো, তাহলে সমাজ কিছুতেই এমন পর্যুদস্ত হতো না এবং এ ধরনের দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হতো না। মূলত ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা ইয়াতীম, ফকীর, মিস্কীন ও দুঃস্থের পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা প্রদান করে বিস্ময়কর অবদান রেখেছে।[১]

যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আত্মার পরিশুদ্ধির (তায্কিয়া-ই-নাফ্স) মাধ্যমে কৃপণতা, লোভ ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে দেহ-মনকে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - وصلّ عليهم ط ان صلوتك سكن لهم ط والله سميع عليم»[২]

"তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তাদের জন্য স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«فاما من اعطى واتقى - وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى - واما من بخل واستغنى - وكذب بالحسنى - فسنيسره للعسرى»[৩]

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ।"

অত্র সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وسيجنبها الاتقى - الذي يؤتى ماله يتزكى - وما لاحد عنده من نعمة تجزى - الاابتغاء وجه ربه الاعلى - ولسوف يرضى»[৪]

"আর তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় ধন সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়, সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।"

যাকাত প্রদানকারীগণ অবশ্যই এটাকে আল্লাহ্র নৈকট্য, সান্নিধ্য ও রাসূলুল্লাহ(স)-এর দোয়া' লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়।

---

১. মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬২।

২. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

৩. আল-কুরআন, ৯২ ঃ ৫-১০।

৪. আল-কুরআন, ৯২ ঃ ১৭-২১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ماينفق قربت عند الله وصلوت الرسول ط الا انهاقربة لهم ط سيد خلهم الله فى رحمته ط ان الله غفور رحيم» [১]

"মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-মাল কেবল তার ভোগের জন্যই নয়, বরং তাতে সমাজের নিঃস্ব, বঞ্চিত, হতভাগ্য, গরীব ও প্রার্থীর অধিকার রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হলো, তাদের প্রাপ্য তাদের হাতে দিয়ে তারপর তা ভোগ করা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়ে এজন্যই ব্যয় ও সাদাকার উৎসাহ প্রদান করেছেন যেন আমরা নি:স্ব, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্তদের প্রতিপালন করি। অর্থাৎ যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গরীব ও বঞ্চিতের প্রতিপালন।[২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«والذين فى اموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم»[৩]

"আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبين ج واتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ج واقام الصلوة واتى الزكوة ج والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ج والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس ط اولئك الذين صدقوا ط واولئك هم المتقون»[৪]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম -সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"

---

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৯৯।
২. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।
৩. আল-কুরআন,৭০ ঃ ২৪-২৫।
৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৭৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের নের্তৃত্ব কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকবে তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, সালাত কায়েম করা ও যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা। ইসলামী সমাজের ভিত্তি সালাত ও যাকাত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজ ব্যবস্থায় ও দু'টো চালু থাকবে না, তা ইসলামী সমাজ নামে অভিহিত হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

«الذين ان مكنهم فى الارض واقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط ولله عاقبة الامور»[১]

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে।"

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাদের বন্ধু বলা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم ركعون»[২]

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ –যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে যাকাত দেয়।"

ইসলামী সমাজে মসজিদ হলো বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও কল্যাণের কেন্দ্রস্থল। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মসজিদ হলো আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফের প্রতিচ্ছবি। যারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তার মধ্যে যাকাত প্রদান হলে অন্যতম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين»[৩]

"তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদসমুহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, তাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।"

অনুরূপভাবে যারা ব্যবসায়ী তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয়ে মগ্ন থাকায় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে তারা অমনযোগী হয়ে পড়ে। তবে যারা মু'মিন এবং পরকালে বিশ্বাসী তাদের কথা ভিন্ন। বিশেষ করে ইসলামী সমাজের এক বিশেষ চিত্র এবং আল্লাহ্ভীরু লোকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে যাকাত প্রদানের কথা বলা

---

১. আল-কুরআন, ২২ ঃ ৪১।
২. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৫৫।
৩. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة ص يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والابصار» [১]

"সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রাদন থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"

যাকাত ব্যবস্থাকে ইসলাম এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ করেছে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু অয়া তা'আলা সালাত কায়েমের সাথে যাকাত প্রদানকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে একীভূত করে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الله ورسوله ط والله خبيربما تعملون»

"অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।"

দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা ও অবদান বিশেষভাবে বিবেচ্য ও আলোচ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনে যে কোন কালে যে কোন সমাজে যে কোন ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বিত হোক না কেন, তা সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে কখনও সফল হতে পারবে না। বিশেষ করে মুসলমান জনগণের দারিদ্র্য সমস্যার কোন সমাধানই আজ পর্যন্ত অন্য কোন আদর্শ বা প্রক্রিয়া দ্বারাই করা সম্ভব হয়নি— পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করেও নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও নয়। বর্তমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদে বেশী বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই এ সমস্যার 'সর্বরোগ নিবারক' panacea- বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও 'ইনস্টিটিউশন'গুলো নীতিগত ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করে খুব বেশী বেশী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ বহু ধরনের ও রকমের কর্মকৌশল গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেছে। কিন্তু তার সবগুলোই ব্যর্থ ও অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনগণকে খুব সামান্য ফায়দাই দিতে পারে বা দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তার ফলে গড়পড়তা হিসাবে মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে— তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। বিগত দশ বছরে তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বের তুলনায় অনেক অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত মতের লোকেরা তা স্বীকার না করলেও তা এক বাস্তব সত্য।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তার বিপুল মুনাফা সত্ত্বেও আয়ের ভারসাম্যপূর্ণ

---

১. আল-কুরআন, ২৪ঃ ৩৭।

২. আল-কুরআন, ৫৮ ঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বণ্টনের (Balanced distribution of wealth) ব্যাপারে কোন অবদানই রাখতে পারেনি। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, এ সবের ফল বিপরীত হচ্ছে। এতে বিরাট জাতীয় আয় খুবই অল্পসংখ্যক লোকের মুষ্টির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে।

এ ধরনের প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসাধ্য বানিয়ে দিয়েছে। কেননা যেসব ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক এককেন্দ্রিকতা (concentration) বৃদ্ধি করে তা সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও আর্থিক চরম দুরবস্থাকে সুদৃঢ় করে এটাকে ললাট-লিখন বানিয়ে দেয়। একথা অর্থনীতিবিদদের ভাল করেই জানা আছে। তাই এ কথায় কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্য সমস্যার কোন সমাধানই এসব উপায়ে কোন দিনই পাওয়া যাবে না। সেজন্য ভিন্নতর পন্থা উদ্ভাবন বা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।

আমাদের বিবেচনায় এ উদ্দেশ্যে 'যাকাত'ই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র- এ দু'টি প্রান্তিক পর্যায়ের শোষণ ও বঞ্চনামূলক অর্থ-ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম মধ্যমপন্থা ও বাস্তববাদী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ধার্য করেছে। তা ফরয, একান্তই বাধ্যতামূলক। দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা বিরাট অংশ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রজনদের হাতে চলে যায়। এরই মাধ্যমে দরিদ্র অক্ষম অভাবগ্রস্থ লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়। সেই সাথে তাদের জীবনমান উন্নীত করা এবং সর্বপ্রকার শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করাও সম্ভব। তাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি ও শিল্পে নতুন জীবনের সঞ্চার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর সাধারণ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পে নিত্যনতুন তৎপরতাই তো কাম্য হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যয় করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সুদভিত্তিক ঋণ দেয়ার কোন প্রয়োজনই থাকবে না। বরং ঋণগ্রস্থ লোকেরা যাকাতের অংশ পেয়ে ঋণ ফেরৎ দিতে সক্ষম হবে। অতঃপর এ অর্থ শিল্প বা কৃষির উৎপাদনে ও উন্নয়নে মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও যাকাত

এ প্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিবেচ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই কাম্য। কিন্তু তা কখনও বিচ্ছিন্ন ও একক বা একদেশদর্শী হতে পারে না। সেই সাথে মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব দিকের উন্নয়নও অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে একদেশদর্শী উন্নয়ন প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের তথা মনুষ্যত্বের পতন হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশী ও দ্রুতগতিতে। আর মনুষ্যত্বের পতন অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দুর্নীতি তথা আত্মসাৎ ও চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে শত শত নয় বরং হাজার হাজার কোটি টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আমাদের দেশে তো স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটাকে অর্থনীতি বলা হচ্ছে তা আসলে নিছক অর্থনীতি নয়,

Dhaka University Institutional Repository

মানবনীতির সাথে তা রক্ত-মাংসের মত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানুষ থেকে তাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। তাই সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।

ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে নিহিত রয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়ন। ইট পুড়িয়ে পাকা না করা হলে তা দিয়ে পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না। এটা বিজ্ঞান সম্মত কথা যেমন, ইসলামেরও নীতি তাই। ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়নের ইসলামী ভিত্তি হচ্ছে চারটি ঃ তাওহীদ, রবুবিয়াত, খিলাফত ও তায্কীয়া। এ চারটি মৌল নীতির উপর ভিত্তি করে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হবে, তা সব দিক দিয়ে একসাথে ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে মানুষের উন্নয়ন সাধন করবে। আর এ চারটির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে তায্কীয়া অর্থাৎ যাকাত ও সত্যপরায়ণতা। এ উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যমানভিত্তিক এবং মানুষই হচ্ছে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু।[১]

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম: ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা (ই ফা বা, ঢাকা), হি: ১৪২৪/খৃ. ২০০৩, পৃ. ৩৯-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

আল-কুরআনে যাকাত প্রসঙ্গ

যাকাত শব্দটি আল-কুরআনুল কারীমের বহুল ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা। যাকাতের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব বোঝাতে অধিকাংশ লেখক ও গ্রন্থকারই সাধারণভাবে বলে থাকেন যে, কুরআনুল কারীমের ৮২টি আয়াতে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য সঠিক নয়। এ ব্যাপারে ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন ঃ

কুরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি বারবার উল্লেখিত হয়েছে একটি সর্বজন পরিচিত শব্দ হিসাবে ৩০টি আয়াতে। তন্মধ্যে ২৭টি আয়াতে নামাযের সঙ্গে একত্রে। একটি আয়াতে নামাযের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো ঃ

«والذين هم للزكوة فاعلون»[১]

"এবং যারা যাকাত দানে সক্রিয়।"

এর পূর্বের আয়াতটি হলো ঃ

«الذين هم فى صلاتهم خشعون»[২]

"যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।"

তিনি আরো বলেন ঃ যে ৩০টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে ৮টি মক্কী সূরার এবং ২২টি মাদানী সূরার আয়াত। যেসব লেখক কুরআনের ৮২টি আয়াতে যাকাত শব্দটি সালাত শব্দের সাথে উদ্ধৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের এই উল্লেখকে তিনি বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন।[৩]

আল-কুরআনুল কারীমের ৬টি সূরায় ৬টি আয়াতে যাকাত শব্দটি এককভাবে এসেছে।[১]

---

১. আল-কুরআন, ২৩ ঃ ৪ নামাযের সঙ্গে অবশিষ্ট ২৬টি আয়াত হলো :
সূরা বাকারার ৫টি আয়াত, ২ ঃ ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭।
সূরা নিসার ২টি আয়াত, ৪ ঃ ৭৭ ও ১৬২।
সূরা মায়িদার ২টি আয়াত, ৫ ঃ ১২, ৫৫ ।
সূরা তাওবার ৪টি আয়াত, ৯ ঃ ৫, ১১, ১৮ ও ৭১।
সূরা মারয়ামের ২টি আয়াত, ১৯ ঃ ৩১ ও ৫৫।
সূরা আম্বিয়ার ১টি আয়াত, ২১ ঃ ৭৩।
সূরা হাজ্জ-এর ২টি আয়াত, ২২ ঃ ৪১ ও ৭৮।
সূরা নূর এর ২টি আয়াত, ২৪ ঃ ৩৭ ও ৫৬ ।
সূরা নামল-এর ১টি আয়াত, ২৭ ঃ ৩ ।
সূরা লুকমান-এর ১টি আয়াত, ৩১ ঃ ৪।
সূরা আহযাব-এর ১টি আয়াত, ৩৩ ঃ ৩৩ ।
সূরা মুজাদালার ১টি আয়াত, ৫৮ ঃ ১৩।
সূরা মুযযাম্মিল-এর ১টি আয়াত, ৭৩ ঃ ২০ এবং সূরা বায়্যিনার ১টি আয়াত, ৯৮ ঃ ৫।

২. আল-কুরআন ২৩ ঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনুল কারীমের মোট ১৯টি সূরায়[২] 'যাকাত' (زكوة) শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই ১৯টি সূরার মধ্যেই ৩২টি আয়াতে যাকাত শব্দটি উল্লেখ আছে। যাকাত শব্দ সম্বলিত ১৯টি সূরার মধ্যে ১০টি মাক্কী এবং ৯টি সূরা মাদানী।[৩] যদিও মক্কী মাদানী সম্পর্কে তাফসীকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মাক্কী সূরার আয়াতসমূহে «واتوا الزكوة» 'এবং তোমরা যাকাত প্রদান কর' বলে মুসলমানদের কোন ধরনের আদেশ করা হয়নি। কোন আয়াতে এটি মু'মিনের গুণাবলীর মধ্যে যাকাত দান একটি বিশেষ গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন আয়াতে পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতেও যে যাকাতের বিধান ছিল তা বলা হয়েছে এবং কোন কোন আয়াতে যাকাত শুধুমাত্র 'পবিত্রতা' অর্থে এসেছে। মাক্কী যুগের আয়াত সমূহে যাকাত প্রদানের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তা হলো, সম্পদশালী লোকদের সম্পদ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব মিটানো বা প্রয়োজন পূরণের জন্য অংশ রয়েছে এবং সেই কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে হৃদয়-মন ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত ইসলামী দাওয়াত যে আদর্শ নিয়ে এসেছে তা যেমন– দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র হক প্রতিষ্ঠাকারী, তেমনি জনমানুষের হকও প্রতিষ্ঠাকামী। সেই সাথে দরিদ্র জনগণের মধ্যে এই আশ্বাসও জাগিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয় এবং শিরক-এর প্রাধান্য রয়েছে বলেই জনগণের চরম দুর্দশা। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হলে নিশ্চয়ই এ অবস্থার অবসান হবে। তখন যেমন শিরক-এর মূলোৎপাটন হবে, তেমনি জনগণের অধিকার হরণও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মাক্কী পর্যায়ে যাকাত ফরয হয়নি। তবে মাক্কী আয়াতসমূহে বিভিন্নভাবে 'যাকাতের, উল্লেখ করে ঈমানদার লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের তাওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্য মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও চিন্তাকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা, শিরক থেকে মুক্ত করে তাওহীদে দীক্ষিত করা এবং সেই সাথে সমাজের দরিদ্র জনগণের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হয়ে তাদের অভাব মোচনের জন্য নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকার জন্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা।[৪]

---

৩. ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৫৬।
সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ৮১।
সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ১৩।
সূরা মু'মিনূন, আয়াত ঃ ৪।
সূরা রূম, আয়াত ঃ ৩৯।
সুলা হা-মীম-আস্‌সাজদা, আয়াত ঃ ৭।

২. (১) সূরা বাকারা; (২) সূরা নিসা; (৩) সূরা মায়িদা; (৪) সূরা আ'রাফ; (৫) সূরা তাওবা; (৬) সূরা কাহ্‌ফ; (৭) সূরা মারয়াম; (৮) সূরা আম্বিয়া; (৯) সূরা হাজ্জ ; (১০) সূরা মু'মিনূন; (১১) সূরা নূর; (১২) সূরা নাম্‌ল; (১৩) সূরা রূম; (১৪) সূরা লুকমান; (১৫) সূরা আহ্‌যাফ; (১৬) সূরা হা-মীম-আস্‌ সাজদা; (১৭) সূরা মুজাদালা; (১৮) সূরা মুয্‌যাম্মিল এবং (১৯) সূরা বায়্যিনা।

৩. মাক্কী সূরাসমূহ ঃ সূরা আ'রাফ, সূরা কাহ্‌ফ, সূরা মারয়াম, সূরা আম্বিয়া, সূরা মু'মিনূন, সূরা নাম্‌ল, সূরা রূম, সূরা লুকমান, সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা, সূরা বায়্যিনা।
মাদানী সূরা সমূহ ঃ সূরা বাকারা, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা তাওবা, সূরা হাজ্জ, সূরা নূর, সূরা আহ্‌যাব, সূরা মুযাদালা, সূরা মুয্‌যাম্মিল।

৪. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম যাকাত-এর প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (আল-কুরআনে অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা), ১ খ ই ১৪১০/খ ১৯৯০ পৃ ৫৭১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

আল-হাদীসে যাকাত প্রসঙ্গ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-হাদীস। আল-কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করছে, আর হাদীস সেই নীতিমালাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও রূপায়ন করছে। তাই হাদীস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা।

ইসলামের 'যাকাত' ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল-কুরআনে যাকাত ফরয হওয়া ও তা ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিস্তারিতরূপ হাদীস থেকেই অবগত হওয়া যায়। যেসব সম্পদে যাকাত ফরয হয় কিংবা ফরয হওয়ার শর্ত কি, এ পর্যায়ে কুরআন নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি, এমনকি কোন সম্পদে কি পরিমাণ যাকাত ফরয, সে ব্যাপারেও কুরআন নীরব। এর বিস্তারিত দিকনির্দেশনা হাদীস থেকে জানা যায়। বস্তুত কুরআনে যা মোটামোটিভাবে বলা হয়েছে, হাদীসে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ও তার বাস্তব কর্মরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনে যা সাধারণভাবে বলা হয়েছে, হাদীসে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে; তার বাস্তবায়নের পন্থা নির্দেশ করেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-ই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের বাস্তব ব্যাখ্যা দানের জন্য দায়িত্বশীল। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون»[১]

"এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে"।

বস্তুত ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের ক্ষেত্রে যাকাত যেমন মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান, দুনিয়ার বঞ্চিত মানবতার দারিদ্র্য মুক্তির জন্য তা এক অনন্য ও অনবদ্য ব্যবস্থা। এ বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ হাদীস থেকেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"من اتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعًا اقرع له زبيتان يطوقه يوم القيمة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى بشدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا «ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرلهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة»[২]

"আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে– যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পেঁচানো হবে। অতঃপর সাপটি

১. আল-কুরআন, ১৬ ঃ ৪৪।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল : সহীহ-আল বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত বাব– ইছমু মানিইয্ যাকাত), তা.বি. ১. খ, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে ঃ আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার। তারপর নবী (স) এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

"এবং আল্লাহ্ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। বস্তুত এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে।"

উপরোক্ত হাদীসে যাকাত না দেয়ার পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী (স) মুয়ায (রা) কে ইয়ামান প্রদেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ্ প্রত্যহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তাদের ওপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগহ করে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।[১]

হাদীস গ্রন্থসমূহে 'যাকাত অধ্যায়' শিরোনামে যাকাত সংক্রান্ত হাদীস সমূহ একত্র করা হয়েছে। যেখান থেকে যাকাতের বিধিবিধান, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, যাকাতের পরিমাণ, শর্তাদি, যাকাত আদায় ও বন্টন সহ যাবতীয় নীতিমালা জানা যায়। দারিদ্র্য ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি কঠিন সমস্যা। দারিদ্র্যের ফলে সমাজে অশিক্ষা, হতাশা, সংঘাত ও সামাজিক সংকট দেখা দেয়। মাদকাশক্তি, সন্ত্রাস ও অপরাধ প্রবণতার অন্যতম কারণ হল দরিদ্রতা। এ সকল সমস্যা সমাধানে হযরত মুহাম্মাদ (স) বিধানের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রদর্শন করেছেন। মহানবী (স)-এর সময়ে যাকাত প্রাপকদের তালিকা তৈরী করা হত এবং তদনুযায়ী যাকাতের অর্থ বন্টন করা হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমেই যাকাত ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

১. প্রাগুক্ত, বাব-উযুবুয্ যাকাত, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

যাকাতের বিকাশধারা

যাকাত ও নামায হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরী'আতেই ফরয করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ও পদ্ধতিতে বিদ্যমান ছিল। কোন নবী রাসূলের শরী'আতই এ দু'টো ফরয থেকে মুক্ত ছিল না। আল-কুরআনের আলোকে কয়েকজন নবী ও রাসূলের শরী'আতে 'যাকাত' প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলো ঃ

❒ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আতে যাকাত

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশের নবীদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে তাদেরকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

«وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوة وايتاء الزكوة ج وكانوا لنا عبدين»[১]

"এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত (নামায) কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করত।"

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর শরী'আতে যাকাত প্রসঙ্গ

হযরত ইসমাঈল (আ) নিজ পরিবার পরিজনকে সালাত (নামায) ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وكان يأمر اهله بالصلوة والزكوة ص وكان عند ربه مرضيًا»[২]

"সে তার পরিজনবর্গকে সালাত (নামায) ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।"

হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতে যাকাত

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলেন, 'আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি।' আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ

«عذابى اصيب به من اشاء ج ورحمتى وسعت كل شيء ط فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمنون»[৩]

১. আল-কুরআন, ২১ ঃ ৭৩।

২. আল-কুরান, ১৯ ঃ ৫৫ ।

৩. আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া– তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।"

বনী ইসরাঈল থেকে কৃত অঙ্গীকারে যাকাত প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈল থেকে কৃত অঙ্গীকারের কথা আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারায় সবিস্তারে সে অঙ্গীকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لاتعبدوا الا الله ط وبالوالدين احسانًا وّذى القربى واليتمى والمسكين وقولوا للناس حسنًا واقيموا الصلوة واتوا الزكوة»[১]

"স্মরণ কর, যখন ইস্রাঈল সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত (নামায) কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।"

আল-কুরআনের আরেকটি আয়াতে বনী ইসরাঈল থেকে নেয়া অঙ্গীকারের কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তাদের গুনাহ সমূহের ক্ষমা পাওয়া, আল্লাহ্র সাহায্য লাভ ও পরকালে জান্নাত প্রাপ্তি এসব কিছু নির্ভর করছে তাদের পরবর্তী নবীর উপর ঈমান এনে তার সহযোগিতা করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়ার ওপরে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

«لئن اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة وامنتم برسلى وعززتموهم واقرضتم الله قرضًا حسنًا لاكفرنّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنت تجرى من تحتها الانهار»[২]

"তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।"

হযরত ঈসা (আ)-এর শরী'আতে যাকাত

হযরত ঈসা (আ) নিজের পরিচয় পেশ করতে গিয়ে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, আমার মহান প্রভু আল্লাহ্ আমাকে জীবনব্যাপী নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وجعلنى مبركا اين ماكنت ص واوصنى بالصلوة والزكوة مادمت حيا»[৩]

"যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত (নামায) ও যাকাত আদায় করতে।"

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ৮৩।

২. আল-কুরআন, ৫ ঃ ১২।

৩. আল-কুরআন, ১৯ ঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সন্দেহাতীত ভাবে জানা যায় যে, সকল নবী রাসূলের শরী'আতেই নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করার নির্দেশ ছিল। যাকাত প্রদান ছাড়া হেদায়াত লাভ অসম্ভব। কোন জাতিকেই এ মৌলিক কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি। সংকীর্ণমনা, কৃপণ, অর্থলিপ্সু ও সম্পদের গোলাম, যে নিজের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছুই ত্যাগ করতে রাজী নয়, সে হেদায়াত লাভে যোগ্য নয়। বরং যে উদারমনা, দাতা, অপরের হক বা অধিকার প্রদানে মুক্ত হস্ত এবং আল্লাহ্‌র দেয়া ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যয় করতে সর্বদা প্রস্তুত সে-ই দেহায়াত লাভে ধন্য হবার যোগ্য।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শরী'আতে যাকাত

সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থাপিত শরী'আতে নামায ও যাকাতকে পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র আল্‌কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

«الم - ذلك الكتاب لاريب فيه ج هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون»[১]

"আলিফ্-লাম-মীম, এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত (নামায) কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين»[২]

"তোমরা সালাত (নামায) কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।"

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم ركعون»[৩]

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ– যারা বিনত হয়ে সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত দেয়।"

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই যাকাতের স্থান।

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ১–৩।

২. প্রাগুক্ত, ২ ঃ ৪৩।

৩. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان"[১]

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ এবং রমযানের রোযা।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ এক বেদুঈন নবী (স)এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী (স) বললেন ঃ

"تعبد الله ولا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلوة المكتوبة وتؤدى الزكوة المفروضة وتصوم رمضان"[২]

"তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।"

উপরোক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (স) নামায ও যাকাত পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। ইসলামী শরী'আত ঈমানের পরপরই নামায ও যাকাত কে স্থান দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

«فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم»[৩]

"যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين»[৪]

"অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত (নামায) কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে ভাই।"

তিনি আরো বলেন ঃ

«انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله»[৫]

---

১. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ১.খ, তা. বি, পৃ. ৬ ।

২. প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত,পৃ. ১২৮৭।

৩. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৫।

৪. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১১।

৫. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত (নামায) কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দেখা যায়, নামাযের পরই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্তেকালের পর এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে। আবু বকর (রা) বললেন ঃ যদি তারা যাকাত না দেয় তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আপনি কিরূপে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله فمن قالها فقد عصمة منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله"[১]

"আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর যে ব্যক্তি এটা বলবে, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করবে। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর উপর।"

তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ

"والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها"[২]

"আল্লাহ্‌র শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (স) কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী যাকাত হলো ইসলামরে তৃতীয় স্তম্ভ।

---

১. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৮৮।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাত আদায় ও বণ্টননীতি

পরিচ্ছেদ ঃ ১

যাকাত আদায়

যাকাত বাধ্যতামূলক আর্থিক ইবাদত। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান না করলে তার নিকট থেকে ইসলামী রাষ্ট্র তা বলপ্রয়োগে করে আদায় করতে পরে। যাকাত প্রদান কোন অনুগ্রহ নয় যা দরিদ্র, প্রার্থী ও ভিখারীকে দয়া করে দেয়া হয়, বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে দরিদ্রের সুনির্দ্ধারিত প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وفى اموالهم حق للسائل والمحروم»[১]

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক"।

সূরা আল-মাআরিজে মু'মিনদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »[২]

"আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের।"

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"اعلمهم ان الله افترض عليهم فى اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم"[৩]

"তাদের জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

সুদীর্ঘকাল থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত পরিসরে যাকাত প্রদান করা হয়, কিন্তু অপরিকল্পিত, অনিয়মিত, ত্রুটিপূর্ণ আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে যাকাত ব্যবস্থা থেকে তেমন কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দরিদ্র পরিবারগুলো দীর্ঘ দিন যাবৎ যাকাত, ফিৎরা, সাদাকাহ্ ইত্যাদি ভোগ করলেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা) থেকে এ সকল মানুষ বঞ্চিত। কর্মসংস্থানের অভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিকৃষ্ট পেশা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনভিপ্রেত। অথচ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান যাকাতের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান সম্ভব। কারণ বর্তমানে যেভাবে যাকাত প্রদান ও বণ্টন করা হয় তাতে যাকাত গ্রহীতা স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের

১. আল-কুরআন, ৫১ ঃ ১৯।

২. আল-কুরআন, ৭০ ঃ ২৪-২৫।

৩. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্নে ইসমাঈল ঃ সহীহ আল- বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, কিতাবুয যাকাত) ১.খ, তা.বি., পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশে কোন পেশা বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না। তাই সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাত আদায় ও তার যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমাজের দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের স্থায়ী কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

যাকাত আদায় করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

যাকাত আদায় এবং তার যথোচিত ব্যবহার সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যারা প্রকৃতই বিত্তহীন, মুসাফির, ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নওমুসলিম। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা নাই। খুলাফায়ে রাশেদা (রা) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্য আটটি দপ্তর বা Directorate ছিল।[১] রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা ও তা উপযুক্ত উপায়ে বণ্টনের জন্য।[২] মূলত সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় ও তা যথাযথভাবে বণ্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মৌলিক কাজ।

মহানবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত আদায় করার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। তারা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা রীতিমত বণ্টন করা হতো। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের বিশেষত্ব হচ্ছে তা আদায় করে নিতে হয়, সংগ্রহ করতে হয়; যাকাত প্রদানের দায়িত্ব দাতাদের উপর এককভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি।[৩]

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন, শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এভাবে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরীর পর যাকাতকে ধনীদের জন্য অবশ্য দেয় এবং গরীবদের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন ; আর এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ দরিদ্রদের অধিকারকে তার নিজের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা হিসাবে বলপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[৪]

---

১. রাসূলুল্লাহ (স) ও খুলাফায়ে রাশেদার (রা) সময়ে যাকাতের অর্থ, সামগ্রী ও গবাদি পশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। এরা হলো ঃ
   (ক) সায়ী = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক,
   (খ) কাতিব = যাকাতের হিসাবপত্র লেখার করণিক,
   (গ) কাসাম = যাকাত বণ্টনকারী,
   (ঘ) আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী,
   (ঙ) আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী,
   (চ) হাসিব = যাকাতের হিসাব রক্ষক,
   (ছ) হাফিজ = যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক,
   (জ) কায়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী।
   (বি. দ্র. ড: মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকি:রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো (ই ফা বা, ঢাকা), ২য় সংস্করণ, খৃ.২০০৪,পৃ. ২৮৯-৩০৩)।

২. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ (দি রাজশাহী ট্রাস্টিজ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন), নভেম্বর ২০০১, পৃ. ৪১।

৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : যাকাত কি ও কেন, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ২০-২১।

৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

যাকাতের উৎস

যাকাতের নিসাব

কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে তার উপর যাকাত প্রদান অপরিহার্য হয়, সেই সম্পদকে 'নিসাব'বলে। বিভিন্ন সম্পদের নিসাব বিভিন্ন হারে। যেমন রূপার নিসাব "বায়ান্ন তোলা", সোনার নিসাব "সাড়ে সাত তোলা" এবং নগদ অর্থের নিসাব সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রূপার বাজার দরের "সম-পরিমাণ"। উক্ত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদেয়। এই হিসাবে অতিরিক্ত সম্পদের উপরও যাকাত ধার্য হবে। যাকাত নগদ অর্থ দ্বারাও পরিশোধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ দ্বারাও পরিশোধ করা যায়। বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকা জরুরী। মাঝখানে কোন সময় তা বিদ্যমান না থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। বৎসরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকলে এবং শেষে না থাকলে অথবা এর বিপরীত হলে যাকাত ফরয হয় না।[১]

যে সকল সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে

ইসলামী শরী'আত অনুসারে যে সকল সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সঞ্চিত বা জমাকৃত নগদ অর্থ
২। সোনা, রূপা বা এসব ধাতু থেকে তৈরী অলংকার পত্র ইত্যাদি
৩। ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী
৪। কৃষি পণ্য
৫। খনিজ সম্পদ এবং
৬। গবাদি পশু।[২]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ: ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২১. খ, আগষ্ট ১৯৯৬, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

২. ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর বিন মাসউদ আলকাসানী আল-হানাফী : বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারায়িই (দারুল কিতাব, বৈরূত), ২. খ, হি. ১৯৮২/খৃ. ১৪০২ , পৃ. ২; ডঃ এম. এ. হামিদ : ইসলামী অর্থনীতি ঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী), ১৯৯৯, পৃ. ২২৪; শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী, ৩য় সংস্করণ ২০০১, পৃ. ৪৬-৪৭; ড. এম.এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), ১৯৮৩, পৃ. ২১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১। সঞ্চিত নগদ অর্থ ঃ

কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদ তার নিজ মালিকানায় রক্ষিত থাকলে উল্লিখিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হয়। স্বহস্তে মওজুদ বা ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ অর্থ বলে গণ্য হয়। এছাড়া পূর্বের বকেয়া পাওনা ঋণ, চলতি বছরে দেয়া ঋণ এসবকেও নগদ অর্থের মধ্যে ধরে যাকাত হিসাব করতে হয়। যেসব ঋণ ফেরত পাবার আশা নাই সেগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। তবে এসব ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে তখন এর যাকাত দিতে হয়। প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় যেহেতু সুদ আছে সেজন্য ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়, জীবন বীমা এবং সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থের মধ্য থেকে সুদ পৃথক করে দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে এবং বাকী মূল অংশের যাকাত দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ ও মূল অর্থের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থও হিসাবে ধরতে হবে। ব্যাংক বা অন্যান আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেভিংস হিসাবে রক্ষিত অর্থের যাকাত প্রদান বছর শেষে বাধ্যতামূলক হয়। প্রাইজবন্ড, বীমা পলিসি, পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম ও অনুরূপ নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রতি বছর যথানিয়মে পরিশোধ করতে হয়। এজাতীয় অর্থ বা সম্পদ মালিকের মালিকানাধীন আছে বলে গণ্য হয়।[১]

২। সোনা-রূপার যাকাত

সোনা-রূপা, দু'টিই অতি উত্তম খনিজ সম্পদ। আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টির মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন। ইসলামী শরী'আতে এ দু'টি সম্পদ বর্ধনশীলরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। তাই শরী'আত এর উপর যাকাত ফরয করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ»[২]

"যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব দেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে সেদিন বলা হবে,এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।"

---

১. ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী : ফিকহুয যাকাত (বাংলা অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম), ১.খ., পৃ. ৬১৭-৮ (যাকাত অধ্যায়); মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী : ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), দ্বিতীয় সংস্করণ, হি ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ২৩৭-৩৮; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ ।

২. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৩৪-৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدّى منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحتْ له صَفَائِحُ من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جَنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار"[১]

"প্রত্যেক সোনা- রূপার অধিকারী ব্যক্তিই যে তাতে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয় তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সেগুলো দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং সেগুলো দ্বারা তার পাঁজর, কপাল এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, পুনরায় তাকে গরম করা হবে। এরূপ শাস্তি অব্যাহত থাকবে সেই দিন পর্যন্ত যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে পর্যন্ত না লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে, অত:পর তারা তাদের পথ হয় জান্নাতের দিকে দেখবে, নতুবা দেখবে জাহান্নামের দিকে।"

সোনার যাকাত ও তার নিসাব

গিনি আকারে, গলানো অবস্থায় কিংবা মুদ্রা আকারে যেভাবেই থাক কমপক্ষে বিশ মিছক্বাল বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ থাকলে এর উপর শতকরা আড়াই ভাগ স্বর্ণ বা এর বাজার মূল্য যাকাত হিসাবে প্রদান ফরয হবে। স্বর্ণালংকারও এ পরিমাণ বা তার বেশী হলে এর উপরও যাকাত ফরয হবে। গহনা ব্যবহৃত হোক বা না হোক কিংবা ব্যাংকে গচ্ছিত থাকুক, সব অবস্থাতেই এর যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"فاذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يعنى فى الذهب تكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذالك"[২]

"তোমার যখন দুইশত দিরহাম হবে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন তা থেকে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। আর স্বর্ণের বিশ দীনার না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যখন বিশ দীনার হবে ও তার উপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন তা থেকে অর্ধ দীনার দিতে হবে। এর সাথে অতিরিক্ত সম্পদ যোগ হলে (নিসাবভুক্ত) গণ্য হবে।"

রাসূল (স) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,

---

১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব), হি: ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ৮৩৩।

২. সুলায়মান ইবনুল আশ্‌য়াস : সুনান আবূ দাউদ (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব, হি, ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ১৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ايديهما سواران من ذهب فقال لهما تؤديان زكوته قالتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكوته"[১]

"দু'জন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো তাদের হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর যাকাত আদায় কর ? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ তোমরা কি ভালবাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (কিয়ামতে) দু'টি আগুনের বালা পরাবেন? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তা'হলে তোমরা এর যাকাত আদায় কর।"

রূপার যাকাত ও তার নিসাব

রূপার নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা। অলংকার আকারে হোক আর গলানো আকারেই হোক কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে। অবশ্য এক বছর থাকা শর্ত। তার উপর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা মোট মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم وليس فى تسعين ومأة شئ فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"[২]

"তোমরা রূপার যাকাত দাও প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। এক শত নব্বইতেও যাকাত নেই। কিন্তু রূপা যখন দুই শত দিরহামে পৌঁছে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ

"ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة"[৩]

"পাঁচ উকিয়ার (দুই শত দিরহাম/সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা) কমে যাকাত নাই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের (২৬ মন ২২ সের ১৫ ছটাক) কমে যাকাত নাই।"

৩। কৃষি পণ্যের যাকাত ও তার নিসাব

কৃষি পণ্য তথা ফসলের যাকাতকে ইসলামী পরিভাষায় 'উশর (عشر) বলা হয়। 'উশর (عشر)

১. আবু ঈসা মুহাম্মাদ আত্-তিরমিযী, জামে আত্-তিরমিযী : মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম রিয়াদ, সৌদী আরব), হি. ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ১৭০৯।

২. আবু ঈসা মুহাম্মাদ আত্তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০৭।

৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব), হি. ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী শব্দ। এর অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। 'উশরের অর্ধেককে আরবীতে نصف عشر (বিশ ভাগের এক ভাগ) বলে। কৃষি জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُه وَالزَّيْتُوْنَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِه اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ»[১]

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তূন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না। কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

«يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ»[২]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ করো না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত; প্রশংসিত।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر"[৩]

"যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ); আর যেসব ভূমিতে পানিসেচ করতে হয় তাতে অর্ধ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ)।"

'উশর' ও যাকাতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

১। যাকাত হলো প্রধানত গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে একজন মুসলমান কর্তৃক তার প্রকৃত আয়ের একটি অংশ ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে প্রদান করা। অপরদিকে 'উশর' হলো প্রধানত গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে যাকাতের মত একজন মুসলমান কর্তৃক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্য থেকে শতকরা ১০ ভাগ (কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ) ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে প্রদান করা।

১. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৪১।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৭।

৩. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২। যাকাত আদায়ের জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত কিন্তু 'উশর আদায়ের জন্য তা শর্ত নয়। উৎপাদিত ফসল কেটে তোলামাত্র 'উশর' আদায় করা ফরজ।

৩। সোনা-রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য ও নগদ অর্থের বছরে একবার মাত্র যাকাত দিতে হয়, কিন্তু বছরে যদি কয়েকবার ফসল উৎপাদিত হয়, তা'হলে প্রতিবারই আলাদা আলাদাভাবে ফসলের যাকাত বাবদ দেয় 'উশর' আদায় করতে হবে।

৪। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত কিন্তু 'উশর' ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়।

৫। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হতে হবে বা ঋণের অর্থ বাদ যাবে, পক্ষান্তরে 'উশর' ফরজ হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়া শর্ত নয়।

৬। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগলের উপর যাকাত ফরয নয়, কিন্তু 'উশর' ফরজ।[১]

'উশরী ফসল'

ইসলামী শরী'আতে নগদ অর্থ ও ধন-সম্পদের পাশাপাশি জমিতে উৎপাদিত ফসলেরও যাকাত ফরজ করা হয়েছে। ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه فى الارض وانا على ذهاب به لقدرون - فانشأنا لكم به جنت من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين . وان لكم فى الانعام لعبرة ط نسقيكم مما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون»[২]

"এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অত:পর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম। অত:পর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা আহার করে থাক; এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আমে গবাদি পশু; তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা থেকে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে ভক্ষণ কর।"

---

১. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন : ইসলামের দৃষ্টিতে 'উশর' বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৯/হি, ১৪১৯, পৃ.২৭।

২. আল-কুরআন, ২৩ ঃ ১৮-২২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

« يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ص ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ط واعلموا ان الله غنى حميد »[১]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে দেখা যাচ্ছে, ফসলের যাকাত মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফরজ করেছেন। তবে কোন্ কোন্ ফসলের যাকাত দিতে হবে হাদীসের মাধ্যমে তা বিস্তৃতভাবে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر"[২]

"যাতে আকাশ অথবা প্রবহমান ঝর্ণ পানি দান করে অথবা যা নালা দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে 'উশর' (অর্থাৎ দশভাগের এক ভাগ)। আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ 'উশর' (অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ)।"

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, জমিতে উৎপন্ন এমনসব ফসলের উপরই কেবল 'উশর' আরোপিত হবে যা মানুষের নিকট সঞ্চিত ও সংরক্ষিত করে রাখা যায়। যেসব জিনিস সঞ্চিত করে রাখা যায় না, যেমন শাক-সব্জী, চারা এবং জ্বালানী, এসবের উপর 'উশর' নেই। যেসব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় না (নষ্ট হয়ে যায়), যেমন তরমুজ, কাঁকরল, খিরা, লাউ, বেগুন, গাজর, বিভিন্ন তরিতরকারী, তুলসী পাতা, নানারূপ সুবাসিত চাড়া গাছ এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিসে 'উশর' নাই।[৩]

যেসব জিনিস মওজুদ করে রাখা যায় (নষ্ট হয় না) এবং ওজনের পাত্রে ও পল্লায় মাপা যায়, যেমন গম, যব, ভুট্টা, ধান-চালসহ অন্যান্য খাদ্যশস্য, পাট, বাদাম, চাল,গুড়া, আখরোট, পেস্তা, জাফরান, যয়তুন, ধনিয়া, জিরা, মিঠাজিরা, পেঁয়াজ, রসুন এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস জমিতে পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার অধিক উৎপন্ন হলে তার 'উশর বা 'উশরের' অর্ধেক দেয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে আলু, মসুর, বুট, খেসারী প্রভৃতি ডাল, খেজুর, কিশমিশ, মনাক্কা প্রভৃতি শুকনো ফল, এসবের উপরও যাকাত ফরয হবে। অনুরূপভাবে আঁখ ও বাঁশ 'উশরী জমিতে উৎপন্ন হলে তাতে 'উশর' দিতে হবে। কেননা আঁখ খাদ্য জাতীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। বাঁশ খাদ্য জাতীয় না হলেও মূল্যবান ও উপকারী জিনিস।

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৭।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৩. সম্পাদনা পরিষদ : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (ই ফা বা), ১. খ. ২য় ভাগ, হি. ১৪১৭/খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৫৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

'উশরী' ফসলের নিসাব

'উশরী' ফসলের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ

"ليس فيما خسة اوسق صدقة "[১]

"পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে যাকাত নেই।"

৫ ওয়াসাকের হিসাব

আরবী ১ ওয়াসাকে ৬০ সা'। ইরাকী১ সা' = ৩২৯৬ গ্রাম। অতএব ৬০ সা'তে হয় ৩২৯৬ x ৬০ = ১৯৭৭৬০ গ্রাম। 'উশরের নিসাব যেহেতু ৫ ওয়সাক, সুতরাং ৫ ওয়াসাকে ১৯৭৭৬০ x ৫ = ৯৮৮৮০০ গ্রাম। এতে হয় ৯৮৮ কে.জি. ৮০০ গ্রাম। বাংলা মাপে ১০০০ গ্রামে হয় ৮৬ তোলা। অতএব ৯৮৮.৮ কেজিতে হয় ২৬ মন ২২ সের ১৫ ছটাক। তাই 'উশরের নিসাব সাড়ে ২৬ মন ধরা যায়।

অন্যদিকে হিজাজি ১সা' = ২১৭৫ গ্রাম। এক ওয়াসাক হয় ৬০ সা'-তে। নিসাব হলো ৫ ওয়াসাক। সুতরাং ২১৭৫ x ৬০ x ৫ = ৬৫২৫০০ অর্থাৎ ৬৫২.৫০০ কেজি।

বাংলাদেশের জমিতে উৎপাদিত ফসলের 'উশর'

বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর অন্তত ৭৫ লক্ষ টন সচ্ছল কৃষকগণ উৎপাদন করে থাকেন। যদি এই ৭৫ লক্ষ টনের উপর অর্ধ 'উশর' (৫%) আদায় করা হয় তার পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, যার মূল্য ন্যূনপক্ষে ৬০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা। এতে শতকরা ৫ ভাগ হারে ৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।[২]

উপরোক্ত অর্থ সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্টিত হলে অতি কম সময়ের মধ্যে এদেশের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। বাস্তব সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে যাকাত ব্যবস্থাকে কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

৪। খনিজ সম্পদ

মহান রব্বুল 'আলামীন ভূমির অভ্যন্তরে অসংখ্য খনিজ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন। এর মধ্যে তাম্র, লৌহ, তৈল, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি অন্যতম। যা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরী'আত খনিজ সম্পদের যাকাত দেয়াকে আবশ্যক করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা

১. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী, কিতাবুল হুজ্জাত আলা আহলিল মদীনা, হায়দ্রাবাদ, হি ১৩৮৫, পৃ.৪৯৭।

২. শাহ্ আবদুল হান্নান : ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কৌশল (আল আমীন প্রকাশন, ঢাকা), খৃ. ২০০২, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«يايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض»[১]

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"

জমির উৎপাদন দুই প্রকারঃ 'কানয' বা পুঁজিকৃত গুপ্তধন এবং অপরটি হলো 'মায়াদিন' তথা খনিজ দ্রব্য। আর এ দু'ধরনের সম্পদকেই 'রিকায' (ركاز) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"فى الركاز خمس"[২]

"রিকাযে (খনিজ সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ দেয়া আবশ্যক।"

বর্তমান কালে পৃথিবীর সব দেশেই খনিজ সম্পদের মালিকানা সরকারের। অর্থাৎ এটি এখন সরকারী সম্পদ। সরকারী সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে সরকার ইচ্ছা করলে এর এক-পঞ্চমাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারে।

৫। গবাদি পশু

যেসব গবাদি পশু কৃষিকাজ, আরোহণ বা বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর যাকাত নাই। কিন্তু যে সব পশু দুধ বা প্রজননের মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করে এবং বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশে বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে মুক্ত প্রতিপালিত হয় সেগুলোরও যাকাত দিতে হয়। যে সকল পশু গৃহে সরবরাহকৃত খাদ্যে বছরের অন্তত ছয় মাস প্রতিপালিত হয় সেগুলোর যাকাত দিতে হয় না। কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশে পালিত হয়ে থাকলে পন্যদ্রব্য হিসাবে এদেরও যাকাত দিতে হবে । যাকাত কার্যকর হওয়ার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর পশুর সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ হতে হবে। যে কোন শ্রেণীর পশুর সংখ্যা নেসাবের কম হলে তাতে যাকাত ধার্য হবে না। অন্যান্য ধন-সম্পদের মত পশুর এক বছর বিদ্যমান থাকতে হবে। তার কম সময় বিদ্যমান থাকলে যাকাত কার্যকর হবে না। এমন কি বছরের শেষ প্রান্তে নেসাবের সামান্য ঘাটতি হলেও যাকাত ধার্য হবে না।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৭।

২. বুখারী,যাকাত অধ্যায় ; আবূ দাউদ, ইমারাহ অধ্যায় ; মুসলিম, হুদূদ অধ্যায়; তিরমিযী, আহকাম অধ্যায়; ইব্ন মাজা, যাকাত অধ্যায়; মুসনাদ আহমাদ থেকে গৃহীত।

৩. আবদুল খালেক : অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ই ফা বা, ঢাকা) খৃ. ২০০৩, পৃ. ৮১; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে যাকাতের সামগ্রী, নেসাব ও হার বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	যাকাত সামগ্রী	নেসাব	যাকাতের হার
১.	হাতে নগদ, ব্যবসায়িক পণ্য সম্পদ বা ব্যাংকে মওজুদ	৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান	নগদ অর্থ বা দ্রব্য মূল্যের ২.৫%
২.	সোনা, রূপা বা এসব হতে তৈরী অলংকার	৭.৫ ভরি সোনা বা ৫২.৫ ভরি রূপা	দ্রব্য বা মূল্যের ২.৫%
৩.	কৃষি পণ্য	৫ ওয়াসাক (৯৪৮ কেজি) বা ১৫৬৮ কেজি বা ৪০ মন ৩২ সের	সেচবিহীন ১০% সেচমুক্ত ৫%
৪.	গবাদি পশু (ক) গরু ও মহিষ	৩০টি	(১) প্রতি ৩০টির জন্য ১ বছর বয়সী ১টা বাছুর (২) প্রতি ৪০ টার জন্য ২ বছর বয়সী ১টা বাছুর (৩) ৬০ এর উপরে প্রতি ১০টিতে ২ বছরের ১টি বাছুরের ১/৪ মূল্যমান।
	(খ) ছাগল ও ভেড়া	৪০টি	(১) প্রথম ৪০টির জন্য ১টি (২) ১২০টির জন্য ২টি (৩) ৩০০ টির ৩টি (৪) পরবর্তী প্রতি শত বা তার অংশের জন্য ১টি করে।
	(গ) উট	৫ – ৯ টি পর্যন্ত ১০ – ১৪ টি পর্যন্ত ১৫ – ১৯ টি পর্যন্ত ২০ – ২৪ টি পর্যন্ত ২৫ – ৩৫ টি পর্যন্ত ৩৬ – ৪৫ টি পর্যন্ত ৪৬ – ৬০ টি পর্যন্ত ৬১ – ৭৫ টি পর্যন্ত ৭৬ – ৯০ টি পর্যন্ত ৯১ – ১২০টি পর্যন্ত ১২০ – এর অধিক	১ টি বকরী ২ টি বকরী ৩ টি বকরী ৪ টি বকরী ১ বছরের ১টি মাদী উট ২ বছরের ১টি মাদী উট ৪ বছরের ১টি মাদী উট ৫ বছরের ১টি মাদী উট ২ বছরের ২টি মাদী উট ৪ বছরের ২টি মাদী উট প্রতি ৪০টিতে ২ বছর বয়সের ১টি মাদী উট; প্রতি ৫০টি উটে ৪ বছর বয়সের ১টি মাদী উট।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	যাকাত সামগ্রী	নেসাব	যাকাতের হার
৫.	খনিজ সম্পদ	যে কোন পরিমাণ	উত্তোলনকৃত দ্রব্যের ২০% বা তার মূল্যমান।
৬.	ব্যবসায়িক পণ্য	৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান	পণ্যের মূল্যের ২. ৫%
৭.	শেয়ার, ষ্টক ইত্যাদি	৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান	সমমূল্যের ২. ৫%
৮.	মুদারাবা বা শরিকানা ব্যবসা	৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান	প্রথমে মোট সম্পদের উপর যাকাত ২.৫ % দিয়ে লভ্যাংশ বন্টন করা হবে। তারপর ব্যক্তিগতভাবে আয়ের যাকাত দিবে। এতে ২ ভাগ দিবে সম্পদের মালিক এবং ১ ভাগ দিবে মুদারিব (ব্যাবসায়ী)।[১]

১. এম. এ. হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯; সম্পাদনা পরিষদ, থটস অন্ ইসলামিক ইকোনমিক্স, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্স ব্যুরো, ঢাকা, খৃ. ১৯৮০, পৃ. ১২৫; বাদাইউস্ সানাই, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭, ১৮, ১৯; আবদুর রহমান আল-যাযিরী, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ: দারুল কুতুব, বৈরূত, ১. খ, হি. ১৪০৬ / খৃ. ১৯৮৬, পৃ. ৬০১; ড. ইউসুফ আল-কারযাভী: ফিকহুয্ যাকাত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, ১. খ, হি. ১৪০৬ / খৃ. ১৯৮৫, পৃ. ১০৯, ১৯৩, ১৯৪, ২০৪, ২০৭, ২০৮, ৩১৩, ৩২০, ৩৩৩, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৩ (ইমাম ইবনে তায়মিয়া : ফিকহুয্ যাকাত ওয়াস-সিয়াম, দারুল ফিকর আল-আরাবী, বৈরূত, হি. ১৪১২ / খৃ. ১৯৯২, পৃ. ১৫, ১৮, ৩০, ৩৬, ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

যাকাত বণ্টন নীতি

ইসলামে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাকাত সংগ্রহের তুলনায় যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় ও বণ্টন করার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জনসাধারণের নিকট থেকে যাকাত আদায় ও বণ্টনকারী কর্তৃপক্ষ হলো রাষ্ট্র বা তার প্রতিনিধি। মহনবী (স) ও খুলাফায়ে রাশেদার শাসনমাল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাকাত আদায় ও তা যথায ভাবে বণ্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط ولله عاقبة الامور» [১]

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখ্তিয়ারে।"

এ থেকে দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, "যাকাত নামাযের ন্যায় একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা, সামষ্টিকভাবেই তা আদায় ও বণ্টন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যাকাতের ব্যয় ও বণ্টন খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

যাকাত বণ্টনের নীতিমালা প্রসঙ্গে

ইসলাম শুধুমাত্র যাকাত প্রাপকদেরকেই নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করে দেয়নি, বরং কিভাবে তা বণ্টন করতে হবে সেই বিষয়েও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রদান করে দিয়েছে। নিচে সে সবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) যাকাতের অর্থ আদায় হওয়ার সাথে সাথে তা বিতরণ করতে হবে। কারণ যাকাত গ্রহীতাদের সম্পদের খুবই প্রয়োজন। তাদের অভাব দ্রুত মোচনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

(খ) যে এলাকা থেকে যাকাত সংগৃহীত হয় সেখানেই তা খরচ করা কাম্য। এর ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

(গ) অর্থ-সম্পদ এমনভাবে বিতরণ বা ব্যবহার করতে হবে যেন গ্রহীতা বা গ্রহীতাদের সর্ব্বোচ্চ সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয়। এটা জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করতে সহায়তা করে, এর মাধ্যমে তারা যাকাত গ্রহীতা না হয়ে শেষ পর্যন্ত যাকাতদাতা হিসাবে উন্নীত হতে পারে।"[২]

উপরোক্ত তিনটি নীতির শেষ নীতিটি বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্রদের দু'ভাবে ভাগ করা যায়।

---

১. আল-কুরআন, ২২ ঃ ৪১।

২. এম. এ. হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) কর্মরত দরিদ্র ও (খ) কর্মহীন দরিদ্র।

কর্মহীন দরিদ্র তারাই যারা আসলেই বেকার, তাদের করার মতো কিছুই নেই। এদেরকে 'মজুরী নির্ভর দরিদ্র'ও বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর লোকদেরই যাকাতের অর্থ দরকার সবচেয়ে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করা দরকার যে, এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার ফলে তারা সামান্য দ্রব্য-সামগ্রী কিনতে সক্ষম হবে যা তাদের শুধু বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। এদের জন্য অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হলে কোনভাবেই এরা দারিদ্র্য সীমার উপর উঠে আসতে পারবে না।

অন্যদিকে কর্মরত দরিদ্রদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, তারা কোন না কোন কাজে নিযুক্ত রয়েছে। যেমন কৃষিপণ্য উৎপাদন, ছোট দোকান বা ক্ষুদে ব্যবসা পরিচালনা অথবা হাতের কাজ বা নিতান্তই স্বল্প আয়ের চাকরি ইত্যাদি। যে কোন কারণেই হোক তারা তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে কোনক্রমেই আর সামনে এগুতে পারছে না। এসব লোকের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের সাহায্য, যেন তারা স্ব স্ব পেশায় উৎপাদনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। যে পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা এদের প্রয়োজন তাতে হস্তান্তরিত আয়ে এদের প্রয়োজন পূরণ হবে না। এদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, তৈরী পণ্য বিক্রয়ে সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দিতে হবে।[১]

যাকাতের অর্থসম্পদ বন্টনের নির্ধারিত খাতসমূহ

ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ 'যাকাত' ব্যবস্থায় যেমনিভাবে যাকাত বাবদ প্রাপ্ত আয়ের কতিপয় সুনির্দিষ্ট খাত রয়েছে, তেমনিভাবে তা ব্যয়েরও কতকগুলি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ বন্টনের খাতসমূহ আল-কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«انماالصدقت للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ط فريضة من الله ط والله عليم حكيم»[২]

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

বস্তুত অত্র আয়াতে উল্লেখিত আট-খাতই যাকাত ব্যায়ের জন্য নির্দ্ধারিত। এ খাতসমূহের বাইরে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করার অধিকার কোন সরকারের নেই। এক নজরে আট শ্রেণী নিম্নরূপ

ক. দরিদ্র জনসাধারণ (ফকীর)

খ. অভাবী ব্যক্তি (মিসকীন)

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

২. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

গ. যাকাত বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি (আমিলূন)

ঘ. মন জয় করার জন্য (মুয়াল্লাফাতুল কুলূব)

ঙ. ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি (ফিররিকাব)

চ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (আলগারিমীন)

ছ. আল্লাহ্‌র পথে (ফী সাবীলিল্লাহ্)

জ. পথিক-প্রবাসী (মুসাফির)

(ক) ফকীর

ফকীর (فقير)[১] শব্দটি সাধারণভাবে সকল সাহায্যের মুখাপেক্ষী অভাবী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শারীরিক বৈকল্যের কারণে হোক কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে সাহায্যের পুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার কারণে হোক অথবা এমন ব্যক্তি যে কোন কারণে সাময়িকভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, তবে সাহায্য সহযোগিতা পেলে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে– এ ধরনের সকল মুখাপেক্ষী লোকের জন্য ফকীর (فقير) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ইয়াতীম, বিধবা, বেকার এবং এমন লোক যারা সাময়িকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে।[২]

মূলত 'ফকীর' সেই ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই, যে রিক্তহস্ত, অভাব মেটানোর যোগ্য সম্পদ নেই সেই ফকীর। ভিক্ষুক হোক বা না হোক এরাই ফকীর।[৩]

অন্যভাবে বলা যায় "স্বল্প সামর্থ্যের অধিকারীরাই হলো 'ফকীর'। যে সকল মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতা হেতু প্রাত্যহিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে না তারাই ফকীর।"[৪]

মাওলানা আব্দুর রহীম উল্লেখ করেন 'ফকীর' এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়ে যে খুব মজবুত এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে।

এ কারণে সব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও 'ফকীর' বলা যেতে পারে, যারা কোন অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছে। এমনিভাবে কোন সামরিক এলাকা থেকে বিতাড়িত লোকদেরও 'ফকীর' বলা যেতে পারে।[১]

কুরায়শদের অত্যাচারে যে সকল মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং রুজি রোজগারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলো, পবিত্র কুরআনে তাদেরকে 'ফকীর' বলে আখ্যায়িত করা

---

১. 'ফকীর' শব্দের বিশ্লেষণ : অত্র অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

২. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন (সূরা তাওবার ৬১ নং টীকা, মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, দিল্লী), ২২শ সংস্করণ, খৃ. ১৯৮২।

৩. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ: দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা), সংখ্যা ঃ ৬৫, অক্টোবর, খৃ. ১৯৮০।

৪. ফারিশতা জ.দ. যায়াস : 'ল এন্ড ফিলসফি অব যাকাত, (অনু. হুমায়ুন খান, যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ),খৃ. ১৯৮৪, পৃ. ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا »[২]

"এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।"

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, যার অল্প কিছু আছে কিন্তু সে সাহিবে নেসাব নয়, তাকেও 'ফকীর' বলে।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربًا فى الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ج تعرفهم بسيمهم ج لايسئلون الناس الحافا ط وما تنفقوا من خير فان الله به عليم»[৪]

"এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না। যাচ্ঞা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।"

(খ) মিসকীন

মিসকীন[৫] (مسكين) শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে সাকানা (سكن) যার অর্থ শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া এবং রূপক অর্থে 'দরিদ্র হওয়া'। বিশেষ্য 'মাসকানাত' (مسكنة) অর্থ দারিদ্র্য, সম্বলহীনতা এবং বিশেষণ 'মিসকীন' বহুবচনে 'মাসাকীন' (مساكين) অর্থ 'অতি দরিদ্রজন, নিঃস্ব ব্যক্তি'।[৬]

পরিভাষায় 'মিসকীন' হলো সেই ব্যক্তি যার কিছুই নাই। যাদের মধ্যে অভাব, দীনতা এবং ভাগ্যাহত অবস্থা পাওয়া যায় এমনসব লোকই 'মিসকীন'। এদিক থেকে সাধারণ মুখাপেক্ষী লোকদের তুলনায় অধিক শোচনীয় অবস্থার লোকেরাই 'মিসকীন'।[৭] এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে 'মিসকীন' তাকেই বলা হয়, দৈহিক অক্ষমতা যাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন করে দিয়েছে, বার্ধক্য, রোগ, অক্ষমতা ও পংগুত্ব যাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে বটে, কিন্তু যা উপার্জন করে তা দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন মাত্রই পূর্ণ হয় না। অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পংগু ইত্যাদি সকল লোককেই 'মিসকীন' বলা হয়।[৮]

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম : ইসলামের অর্থনীতি (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা), ৭ম প্রকাশ, খৃ. ১৯৯৮, পৃ. ২৪০।

২. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৮।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ (আল্লামা শামী কর্তৃক উদ্ধৃত), 'ফাতহুল কারীম ফী সিয়ারাতিন নাবিয়্যিল আমীন', আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী কর্তৃক অনূদিত (ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৮, পৃ. ১০২।

৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৩।

৫. 'মিসকীন' শব্দের বিশ্লেষণ ঃ অত্র অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬. ফারিশ্তা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৭. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, সূরা তাওবার টীকা নং ৬২; ফারিশতা জ. দ. যায়াস , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; এ.জি.এম. বদরুদ্দুজা; যাকাতের ব্যবহারিক বিধান, (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৮৯, পৃ. ৩৫ ।

৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন মিসকীনের অবস্থা ফকীর অপেক্ষাও বেশী বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ অর্থনৈতিক অসামর্থ্যই তাকে দরিদ্র ও অকমন্য করে দিয়েছে। অতএব তাদেরকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং দারিদ্র্যের দুঃখময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে।[১]

রাসূলুল্লাহ্ (স) 'মিসকীন' শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এমন লোকদের সাহায্য লাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারছে না এবং গুরুতর শোচনীয় অবস্থায় নিমজ্জিত আছে। কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে তারা কারো কাছে হাত পাতেও পারছে না, আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, অভাবী মনে করে লোকেরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) মিসকীনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"ليس المسكين الذى ترده الاكلة والأكلتان ولكن المسكين الذى ليس له غنى ويستحى اولا يسأل الناس الحافًا"[২]

"ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয় যে দুইএক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায়। বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যে স্বচ্ছল নয় অথবা চাইতে লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না।"

401843

"ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لايجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولايقوم فيسأل الناس"[৩]

"যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দুইএক গ্রাস (খাবার) কিংবা দুইএকটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।"

মূলত এরা হলো শরীফ মানুষ, তবে গরীব ও অস্বচ্ছল। সমাজের লোকদের কর্তব্য নিজেদের আশেপাশে এ ধরনের যেসব লোক আছে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করা।

'ফকীর-মিসকীন' তথা দরিদ্র ও অভাবী লোক তারাই যাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাদের নেসাব পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বা ধন-সম্পদের অভাবের কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, কাজের উপকরণ ও গবাদি পশুসহ মৌলিক জিনিসের অভাব প্রকট। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলেই যাকাত পাওয়ার যোগ্য। আল-কুরআনে ঘোষিত যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো 'ফকীর ও মিসকীন'।

---

১. উদ্ধৃতি,প্রাগুক্ত।

২. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল : সহীহ আল-বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী), কিতাবুয যাকাত, বাব লাইয়াস্ আলুনান্ নাসা ইলহাফা, তা. বি. ১ খ, পৃ. ১৯৯।

৩. প্রাগুক্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্যে 'আল-ফুকারা' ও আল-মাসাকীনে'র সঠিক অর্থ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্‌র মতে তারাই আল-ফুকারা যারা দরিদ্র বটে কিন্তু ভিক্ষা করে না এবং আল-মাসাকীন তারাই যারা দরিদ্র এবং ভিক্ষা করে।[১] অন্য একদল ফকীহ ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। অর্থাৎ আল-ফুকারা তারাই যারা দরিদ্র ও ভিক্ষা করে এবং আল-মাসাকীন তারাই যারা দরিদ্র কিন্তু ভিক্ষা করে না।[২]

ইসলামী বিশ্বকোষ এ বিষয়ে মাযহাবগত পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে যা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ "হানাফী মাযহাবের মতে– যার নেসাব পরিমাণের চেয়ে কম সম্পদ আছে অথবা নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক আছে, কিন্তু তা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে মোটেই যথেষ্ট নয়, তাকে ফকীর বলে। পক্ষান্তরে যার কোন সম্পদই নেই এবং অপরের নিকট যাচ্না করতে বাধ্য হয় তাকে মিসকীন বলে।

মালিকী মাযহাব মতে- যার নিকট পূর্ণ এক বছরের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ সম্পদ নেই তাকে ফকীর বলে এবং যার মালিকানায় কোন সম্পদই নেই তাকে মিসকীন বলে। হাম্বালী মাযহাব মতে– যার মালিকানায় মোটেই কোন সম্পদ নেই অথবা সংবৎসরিক ভরণ-পোষণের অর্ধেক পরিমাণ সম্পদও নেই তাকে ফকীর বলে এবং যার নিকট পূর্ণ বছরের অথবা তার অর্ধেক সময়ের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ সম্পদ নেই তাকে মিসকীন বলে। শাফিঈ মাযহাবমতে, যার মূলতই কোন সম্পদ বা বৈধ উপার্জন নেই অথবা আছে কিন্তু তা তার অর্ধ-বছরের ভরণ-পোষণের পরিমাণের চেয়েও কম, তাকে ফকীর বলে এবং যার নিকট অর্ধ-বছরের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ সম্পদ বা বৈধ উপার্জন আছে তাকে মিসকীন বলে। অতএব হানাফী ও মালিকী মতে যারা ফকীর ও মিসকীন, তারা শাফিঈ ও হাম্বলী মতে পর্যায়ক্রমে মিসকিন ও ফকীর। হযরত 'উমার ফারূক (রা)-এর মতে ফকীর বলতে মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকে এবং মিসকীন বলতে আহলে কিতাব দরিদ্র ব্যক্তিকে বোঝায়"।[৩]

অতএব ইসলামে দুই ধরনের দরিদ্র বিবেচনা করা হয়, উভয় শ্রেণীর দরিদ্রই যাকাতের হকদার। 'ফকর' (فقر) শব্দ দ্বারা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে বোঝায়, যার সামর্থ্য দ্বারা জীবনের নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু যথাযথভাবে মিটে না। 'মাসকানাত' (مسكنة) শব্দ দ্বারা তাদের অবস্থা বোঝায়, যাদের আদৌ কোন সামর্থ্য নেই অথবা সামর্থ্য এতই কম যা দ্বারা জীবনের ন্যূনতম ন্যায় সঙ্গত প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত মিটে না।[৪]

---

১. A. M. al Tayyar, Zakah : Spiritual Growth and purification' Al-Jumuah, vol. 19, Issue 8-9, Ramadan 1419 H, 1998-99, P. 42-43.

২. এম. এ. হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ,খ. ২১শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১।

৪. ফারিশতা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) যাকাত বিভাগের কর্মচারী

পবিত্র কুরআনে নির্ধারিত যাকাত বন্টনের তৃতীয় খাত হলো 'যাকাত বিভাগের কর্মচারী'। যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। এজন্য এই বিভাগের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দিতে হবে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেরা 'ফকীর-মিসকীন' না হলেও, এমনকি অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়ে যাকাত প্রদান করলেও তাদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেয়া হবে। যাকাত আদায় ও বন্টন কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং তা রাষ্ট্রীয়ভাবেই আদায় ও বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ط ان صلوتك سكن لهم ط والله واسع عليم»[১]

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط ولله عاقبة الامور»[২]

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

«وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرت واقام الصلوة وايتاء الزكوة ج وكانوا لنا عبدين»[৩]

"এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা ; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই 'ইবাদত করতো।"

'রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা)থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع الى بيته"[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

২. আল-কুরআন, ২২ ঃ ৪১।

৩. আল-কুরআন, ২১ ঃ ৭৩।

৪. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী : জামে আত-তিরমিযী, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, বাব- মা জাআ ফিল আমেলে আলাস সাদাকাতি বিল হাক্কি, তা. বি. পৃ. ১৪০ (বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা ২খ., পৃ.২০, নং ৫৯৯, (বি.আই.সি.সং.); ইবনে মাজা, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী সং, যাকাত, বাব ১৪,নং ১৮০৯;আবু দাউদ,কিতাবুল ইমারা, নং ২৯৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

"ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমান(মর্যাদাসম্পন্ন), যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।"

পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই হলো, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনই যাকাত আদায় করবে এবং তা যথাযথভাবে নির্ধারিত খাতে বন্টন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন, মানুষের নেতা বানিয়েছেন তাদের অন্যতম ও অপরিহার্য কর্তব্য হলো যাকাত আদায়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ও আদায়কৃত যাকাত ইসলাম নির্ধারিত পন্থায় বন্টন করা।

রাসূলুল্লাহ (স) যাকাত আদায়ের জন্য সাহাবীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব বন্টন এবং বিভিন্ন এলাকাতে তাদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং সাথে সাথে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যাকাত কর্মচারীরূপে যারা যাকাত তহবিল থেকে পারিশ্রমিক লাভ করতে পারেন তারা হলেন ঃ

(ক) যাকাত আদায় কারীগণ (المصدقون) ঃ যারা যাকাত আদায় করে তা যথাযথভাবে যাকাত কেন্দ্রে জমা দিয়ে থাকেন।

(খ) যাকাত বিতরণকারীগণ (القسامون) ঃ যারা প্রাপকদের মধ্যে যাকাত বন্টন করেন।

(গ) যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক (الحافظون) ঃ যারা যাকাত তহবিল নিরাপত্তার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

(ঘ) যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী (الكيالون) ঃ যারা যাকাতস্বরূপ দেয় শস্য ইত্যাদি কৃষিজ পণ্য পরিমাপ করেন।

(ঙ) যাকাতের হিসাবপত্র রাখার করণিক (الكاتبون) ঃ যারা যাকাত সংক্রান্ত কাগজপত্র লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তা রক্ষা করেন।

(চ) যাকাতের হিসাব রক্ষক (الحاسبون) ঃ যারা যাকাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখেন।

(ছ) যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী (العارفون) ঃ যারা যাকাতের ন্যায্য হকদারদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেন এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে যাকাত বিভাগকে অবহিত করেন।

(জ) যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধকারী (الحاشرون) ঃ যারা প্রয়োজনবোধে যাকাতদাতা বা যাকাত গ্রহীতাদেরকে সমবেত করেন।

(ঝ) যাকাত অধিকর্তাগণ (رؤساء العاملين) ঃ যারা বিভিন্ন যাকাত কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করেন এবং যারা নিজ নিজ কেন্দ্রের যথাযথ পরিচালনার জন্য জনগণ ও রাষ্ট্রের নিকট দায়ী থাকেন।[১]

---

১. ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) মনজয় করার জন্য

'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' সেইসব লোক যাদের হৃদয়-মন জয় করা উদ্দেশ্য। যেসব লোক ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর কিন্তু অর্থ দিয়ে তাদের বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে কিংবা কাফেরদের দলের এমন লোক যাদের অর্থ দিলে দল পরিবর্তন করে মুসলিমদের সাহায্যকারী হতে ইসলামে প্রবেশ করেছে (নওমুসলিম)। কিন্তু পূর্বের শত্রুতা কিংবা দুর্বলতা দেখে আশংকা হয় যে অর্থ-সম্পদ দিয়ে বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীতে ফিরে যেতে পারে। এ ধরনের লোকদের স্থায়ী ভাতা, বৃত্তি কিংবা সাময়িকভাবে অর্থদান করে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী বা অনুগত কিংবা অক্ষতিকর শত্রুতে পরিণত করা। এ ধরনের লোকদের যাকাত পেতে ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই, বরং তারা সম্পদশালী হলেও তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ বৈধ।[১]

আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের মূল হচ্ছে 'ওয়াল-মুআল্লাফাতি কুলূবুহুম'। এর মৌলিক ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম প্রচারের কাজ কোথাও বাধাগ্রস্ত বা প্রতিহত হলে কিংবা মুসলমানদের উপর কোথাও অত্যাচার হলে এবং তা নগদ অর্থ-সম্পদ দ্বারা দূর করা সম্ভব হলে সেক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হবে। যেন বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি হতে না পারে। এমনকি এতে অত্যাচারীও অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবে সংগতিহীন নওমুসলিমকেও যাকাতের অর্থ-সম্পদ দ্বারা স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও জনতা যদি কখনো সামগ্রিকভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে যায় এবং তখন নিজ দেশে যাকাতের অর্থ বন্টনের আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ খাতের অর্থ বৈদেশিক মুসলমান তথা মিত্র রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করা যেতে পারে।[২]

(ঙ) ক্রীতদাস ও বন্দীমুক্তি (رقاب)

رقاب (রিকাব) আরবী ভাষায় বহুবচনের শব্দ। একবচনে رقبة (রাকাবা), যার অর্থ দাস, ক্রীতদাস, ঘাড়, গর্দান ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে رقبة (রাকাবা) ও رقاب (রিকাব) তথা একবচন ও বহুবচন উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] এর আরেক অর্থ গলদেশ মুক্ত করা। গলদেশ মুক্ত করা বলতে দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক এবং বন্দী মুক্ত করাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে, অন্য কারো দাসত্ব করবে না, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদেশে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র এ অমানবিক প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারী অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শান্তিপূর্ণভাবে এ প্রথার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের (রা) মধ্যে যাদের অর্থ-সম্পদ ছিল তারা দাসমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করতেন। ফলে খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এসে দাসপ্রথা চূড়ান্তভাবে রহিত হয়ে যায়।[৪]

---

১. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইকোনমিক সিস্টেম অব ইসলাম (ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর), খৃ. ১৯৮৪, পৃ. ২২৯।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২; ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ,২১শ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১।

৩. আর-কুরআন,৪ঃ ৯২;৫ঃ ৮৯; ৫৮ঃ ৩ ;৯০ঃ ১৩; ২ঃ১৭৭; ৯ঃ৬০; ৪৭ঃ৪।

৪. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২; অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

দাসমুক্তির ব্যাপারে পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে যে দাস বা দাসী তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে সে তাকে মুক্ত করে দেবে, সে ক্ষেত্রে যাকাত দিয়ে তার এই চুক্তি পূরণে সাহায্য করতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ـ واتوهم من مال الله الذى اتاكم»[১]

"তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর।"

মানুষকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার দু'টি পথ রয়েছে ঃ

১. কোনো দাস যদি তার মনিবের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে , আমি আপনাকে এই পরিমাণ অর্থ দান করলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেবেন, তবে তার মুক্তির মূল্য পরিশোধের জন্য তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা।

২. ধনবান ব্যক্তি নিজেই তার সম্পদের যাকাত দিয়ে দাস বা দাসীকে ক্রয় করবে এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেবে।[২]

'রিকাব' শব্দটি দ্বারা ঐ সকল মুসলিমকেও বোঝায়, যারা শত্রুর হাতে বন্দী রয়েছে। অতএব এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, যখনই সম্ভব যাকাতের অর্থ দ্বারা মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতে হবে। এমনকি এ যুগে যারা অর্থাভাবে জরিমানা দিতে না পেরে কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যেসব লোক মামলা পরিচালনা করতে পারছে না অথচ মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী হয়ে আছে, তাদেরকেও যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।[৩]

(চ) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ (غارمون)

'গারিমূন' (غارمون) শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'গারিম' (غارم), ঋণগ্রস্তব্যক্তিকে 'গারিম' বলা হয়। তবে 'গারীম' (غريم) বলা হয় ঋণ গ্রহীতাকে, যদিও ঋণদাতাকে বোঝাবার জন্যও এই শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর غرم শব্দের আসল অর্থ অপরিহার্যতা, লেগে যাওয়া।[৪] যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী ঃ

«والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ـ ان عذابها كان غراما»[৫]

"এবং তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।"

---

১. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৩৩ ।

২. ড. ইউসুফ আলকারযাভী, প্রাগুক্ত, ফায়রো, ২১তম সংস্করণ, হি. ১৪১৪ / খৃ. ১৯৯৪, পৃ. ৬৫৯।

৩. ফারিশ্তা জা. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-২৯৯; অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৫।

৫. আল-কুরআন, ২৫ ঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকেই 'গারিম' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা ঋণ তার ওপর চেপে বসেছে, অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া। আর 'গারীম' বলা হয় এজন্য যে, ঋণদাতার সাথে তার ঋণের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে আছে। ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে غارم হচ্ছে 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি', যার ওপর ঋণ চেপেছে, ঋণ পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের সে মালিক নয়। তাই সে যাকাত পেতে পারে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদের মতে, 'গারিমূন' দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে, সমাজ-সমষ্টির কল্যাণে ঋণ গ্রহণকারী। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্য আলাদা আলাদা আইন রয়েছে।[১]

মূলত 'গারিম' তাকেই বলে যার নিজের ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন সম্পদ নেই।[২]

যাকাত তহবিল থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঋণ প্রদানের সম্ভাবনা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ১৩৭০ হিজরীতে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক মিসরে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। এর জবাবে বলা হয়, 'একজন দেনাদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা যদি সেই দেনা বা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়, তাহলে উক্ত ঋণ যাকাত তহবিল থেকে পরিশোধ করা যেতে পারে। ইমাম মালিক, শাফী ও আহমাদের মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি রেখে যাবে, তা থেকে অবশ্যই তার ঋণের অংশ পরিশোধ করতে হবে। উত্তরাধিকার সম্পত্তির পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে তা থেকেই ঋণ যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ওই ঋণ মন্দ ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।[৩]

ঋণভারে জর্জরিত লোকেরা মানসিকভাবে সর্বদাই ক্লিষ্ট থাকে এবং কখনও জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। অহরহ তাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় হতে থাকে। অনেক সময় তারা অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যথার্থ প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ط وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون»[৪]

" খাতক যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত।

২. আল-হিদায়া, অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, ১ খ, পৃ. ২২১।

৩. মোহাম্মাদ আবু জাহরাহ, লিওয়া আল-ইসলাম, ম্যাগাজিন (২৯ নং প্রশ্ন), ১৯ নং সংখ্যা, ভলিউম নং ৪, রজব ১৩৭০ হিজরী, (এপ্রিল ১৯৫১), পৃ. ৮৩৮।

৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا"[১]

"যে লোক ধন-সম্পত্তি রেখে যাবে তা তার উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর যে লোক কোন ঋণের বোঝা রেখে যাবে, তা আদায় করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে।"

উপরোক্ত বক্তব্য ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসাবেই তিনি ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঘোষণায় নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করা সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে। যাকাতের অর্থ থেকে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।

(ছ) আল্লাহ্‌র পথে (فى سبيل الله)

'আল্লাহ্‌র পথে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জনকল্যাণকর কাজে, দীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে যত কাজ করা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রেই এ অর্থ ব্যয় করা যাবে। যেসব কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ করা যায় সেসব কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনের ভাষায় এ খাতের নাম হলো 'ফী সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র পথে)। মুসলমানদের সকল নেক কাজ আল্লাহ্‌র পথেরই কাজ। তবে এখানে আল্লাহ্‌র পথে কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাদাতাগণ এখানে পথ বলতে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা এবং যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যেসব কাজ আঞ্জাম দিতে হয় সেজন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়, তবে ধনী ব্যক্তি যদি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া বৈধ। তিনি বলেন ঃ

"لاتحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها اولغارم او لرجل اشترها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها بماله المسكين للغنى"

"স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ পাঁচটি অবস্থা ব্যতীত হালাল নয় ঃ আল্লাহ্‌র পথে যোদ্ধা অথবা যাকাত কর্মচারী হলে অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অথবা সচ্ছল ব্যক্তি যদি নিজ সম্পদ দ্বারা তা ক্রয় করে থাকে; অথবা একজন গরীব প্রতিবেশী যদি তার কোন সচ্ছল প্রতিবেশীকে উপহার হিসাবে প্রদান করে।"[২]

---

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : সহীহ মুসলিম (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী),তা. বি. কিতাবুয যাকাত, ২. খ, পৃ. ৩৫।

২. সুলায়মান ইবনুল আশয়াছ : সুনান আবি দাউদ (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী),তা. বি. কিতাবুয যাকাত, পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে এমন সকল প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকেই বোঝায়, যা কুফ্‌রীকে পরাভূত করে আল্লাহ্‌র বাণীকে বিজয়ী করা এবং তাঁর দীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশেও পরিচালিত হয়, তা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাথমিক অবস্থায় থাকুক কিংবা সশস্ত্র লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে, তাতে কিছু আসে যায় না।[১]

'ফী সাবিলিল্লাহ' বাবদ যাকাত তহবিল নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

(ক) ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার কারণে যে সকল মুসলমান নিজেদের জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিক কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকেন এবং যাদের জীবন ধারণের বিকল্প কোন উপায় নাই, এ ধরনের ব্যক্তিগণ হলেন ঃ

(১) যে সকল দরিদ্র মুসলমান সাধারণভাবে মানবজাতির এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে লেখাপড়া, গবেষণা বা শিক্ষকতা করছেন এবং যাদের কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে দীন ইসলামের প্রচার ও তা সুসংহত করা।

(২) যে সকল দরিদ্র মুসলমান চিকিৎসক, নার্স ও সমাজ সেবক এবং হাসপাতাল ও ডাক্তার খানার নিয়মিত কর্মচারী যারা নিজেরা দরিদ্র এবং ইয়াতীম ও দরিদ্র মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত; যারা দরিদ্র, অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ ও বোবা মুসলমান শিশু বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের সংস্থায় নিয়োজিত।

(৩) দরিদ্র মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক, বৈমানিক ও কর্মীরা যারা যুদ্ধকালে ইসলাম ও মুসলিম অধিবাসী এবং তাদের এলাকা রক্ষার জন্য কাজ করে।

(৪) বিচার বিভাগীয় দরিদ্র মুসলিম সদস্যগণ যারা রাষ্ট্র থেকে কোন পারিশ্রমিক পায় না।

(৫) মুসলিম সরকারের অধীন যে কোন স্থানে বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুপাত, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং দুর্ঘটনাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের জরুরী সাহায্য প্রদানের জন্যে।

(৬) দরিদ্র মুসলমান ছেলে-মেয়ে এবং নিরক্ষর বয়স্ক মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

(৭) যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যখন মুসলিম উম্মাহ্‌ ও মুসলিম রাষ্ট্রসীমা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে কোন প্রয়োজনে যাকাত তহবিল ব্যবহৃত হবে। যেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা, সৈনিকদের যানবাহন,খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করা এবং আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা।[২]

উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম হলো, ইসলামী আদর্শবিহীন সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা নিয়োজিত তাদের যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এ ছাড়াও যারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে রত রাখে তাদের

১. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, সূরা তওবার ৬৭ নং টীকা।

২. ফারিশ্‌তা জ. দ. যায়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন পূরণের জন্যও যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সে সমাজ ও রাষ্ট্রে এসকল খাতে যাকাতের অর্থব্যয় করার গুরুত্ব অধিক।

(জ) মুসাফির তথা পথিক-প্রবাসী

আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাত বন্টনের সর্বশেষ খাত হলো 'ইব্নুস সাবীল' বা মুসাফির, পরিব্রাজক। পবিত্র আল-কুরআন পথিক-প্রবাসীদের জন্য যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট করা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে তাদেরকে অন্য খাত থেকে দান করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«يسئلونك ماذا ينفقون ط قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل ط وما تفعلوا من خير فان الله به عليم»[১]

"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবহিত।"

যাকাত তহবিল থেকে মুসাফিরদের অংশ নিম্নলিখিতভাবে বিতরণ করা যেতে পারে ঃ

১. চলাচলকারী যাত্রীদের প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করা।

২. সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজনবিহীন প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য যাকাতের একটি অংশ প্রদান করা।

৩. গৃহ বা গন্তব্যস্থানে না পৌছা পর্যন্ত মুসাফিরকে খাদ্য দান করা।

৪. মুসাফিরদের আবাসনের জন্য বিশেষ গৃহ নির্মাণ করে সেগুলো চালু রাখা।

একইভাবে অভাবী, মুসাফির এবং তার সঙ্গী ও ভারবাহীকে সার্বিক আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করা।[২]

যাকাত বন্টনের উপরিউল্লিখিত খাতগুলো থেকে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হলো যে, যাকাত দরিদ্র, অসহায়, অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশরক্ষা, যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, যাতায়াত ও পরিবহন উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখে, যা একটি আদর্শ ইসলামী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাণশক্তি।

যাকাত বন্টনের উপরিউল্লিখিত খাতগুলো থেকে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হলো যে, যাকাত দরিদ্র, অসহায়, অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশ রক্ষা, যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, যাতায়াত ও পরিবহন উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। যা একটি আদর্শ

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২১৫।

২. আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৫৮০।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার আলোকে সমাজের আটটি শ্রেণীর মধ্যে যাকাত বিতরণের আইনগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নলিখিত নীতিমালায় উপনীত হওয়া যায়ঃ

১. যাকাত তহবিলকে ইসলামী কোষাগারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। শরী'আর বিধান অনুসারে যাকাত তহবিল স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা উচিত।

২. ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কল্যাণার্থে অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ এবং জনহিতকর সরকারী সেবামূলক কাজকর্ম যাকাত তহবিলের দ্বারা পরিচালনা করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটা মেনে চলা উচিত।

৩. ধনী ও সক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য যাকাত তহবিল থেকে কোন কিছু গ্রহণ অবৈধ।

৪. ধনী ব্যক্তিরা যাকাত তহবিল থেকে কিছু পাবে না। তবে এদের মধ্যে যারা যাকাত আদায় ও তার প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত অথবা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামরত, বিরোধ মীমাংসার জন্য যারা অর্থ ঋণ নিয়ে খরচ করে ফেলেছে, এমন লোক কিংবা তাদের কতিপয় ধরনের দেনার বেলায় যাকাত নিতে পারবে। ঋণী ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার ঋণের অর্থই প্রদান করতে হবে।

৫. জীবিকা অর্জনে সক্ষম ব্যক্তিরা যাকাত পাবে না। তবে তারা উপার্জন দ্বারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারলে যাকাত পেতে পারবে। এসব মানুষকে যাকাত থেকে কিছু নিতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের উপার্জনের দ্বারা তারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অসমর্থ হচ্ছে।

৬. যাকাত তহবিল থেকে ঋণগ্রস্ত, যুদ্ধবন্দী, ভ্রমণ-কারী মুসাফির বা পথচারী এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ব্যক্তিদেরকে যদি অর্থ দেয়া হয়, তাহলে সেই অর্থ সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা, পরবর্তী সময়ে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে পূর্বের বরাদ্দকৃত অর্থ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

৭. যাকাত বিষয়ক একটি নীতি হচ্ছে, যে অঞ্চল থেকে যাকাত আদায় করা হবো, সেই অঞ্চলের হকদার লোকদের মধ্যেই তা বিতরণ করা উচিত।

৮. আটটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে যাকাত ভাগ করার পদ্ধতি কিংবা কোন কোন শ্রেণীকে বাদ দিয়ে অপররাপর শ্রেণীর মধ্যে যাকাত বিতরণের বিষয়টি শাসকের উপর বর্তায়। তিনি প্রয়োজনবোধে কোন শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।

৯. সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা হিসাবে গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে অর্থ খরচ করাই হচ্ছে যাকাতের উদ্দেশ্য।

১০. জীবিকা অর্জনে সক্ষম গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মঞ্জুরকৃত সু-ঋণ পরবর্তী সময়ে সম্পদ বাড়াতে পারে। এইভাবে অর্জিত সম্পদ পরে অন্যান্য গরীব ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে।

১১. গরীব ও দুঃস্থদের প্রতিপালনে নিয়োজিত, জনহিতকর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত সমিতিবদ্ধ কোন সংঘের কাছে যাকাত হস্তান্তর করা যেতে পারে। গরীবদের শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. যাকাত নগদ অর্থে অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আকারেও দান করা যায়। সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে গণ্য হবে।

১৩. যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হলে নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান ছাড়াও সম্পদের ওপর কর আরোপ করা যেতে পারে।

১৪. কোন মুসলমানকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ফেলে রাখা উচিত নয়।[১]

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, অর্থ-সম্পদ যতই প্রচুর হোক না কেন, তার বণ্টন ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম কৌশল ও নীতি এবং নির্ভুল পদ্ধতিতে না হলে তা থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করা সম্ভব নয়। বণ্টন নীতির ভ্রান্তির কারণেই বর্তমান পৃথিবীতে মানুষে মানুষে আকাশ ছোঁয়া বৈষম্য ও বিরোধ বিদ্যমান। একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য অন্যদিকে দুঃসহ দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী আক্রমণ মানবজাতিকে ভারসাম্যহীন করে একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ অর্থ-সম্পদ যদি সত্যিই নির্ভুল ও সুবিচারপূর্ণ পন্থায় বণ্টিত হয়, এর আবর্তন-উৎপাদন ও বণ্টন যদি সর্বকালের প্রযোজ্য স্থায়ী বিধানের অধীন হয়, তাহলে সমগ্র দুনিয়া থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হতে পারে। যাকাত এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা অনুসরণ করলে সমাজের বেকার ও শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

---

১. শাহ ইসমাইল শাহাতাদা : সমাজের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে যাকাত তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমা নির্দ্ধারণ (অনূ: কাজী হাফিজুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা), পৃ. ১০৫-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৪

যাকাত ও কর

কর হলো একটা রাষ্ট্রীয় আইনগত অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা যা ধনী ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে থাকে, অবশ্য দেয়ার মত সামর্থ্য যদি তার থাকে। রাষ্ট্র সাধারণভাবে যেসব কল্যাণমূলক কাজ করে তার মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধা করদাতা লাভ করে, সেদিকে তেমন দৃষ্টি দেয়া হয় না। অবশ্য রাষ্ট্র ও সরকার তার আয়ের দ্বারা একদিকে যেমন প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করে, তেমনি অপরদিকে রাষ্ট্র যেসব অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় ও তা বাস্তবায়ন করে।

আর যাকাত হলো শরী'আত অনুযায়ী একটা সুনির্দিষ্ট অধিকার যা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের ধন-সম্পদে ধার্য করেছেন আল-কুরআনে ঘোষিত ফকীর-মিসকীন ও অন্যান্য পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্য, আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য, সম্পদের মালিকের মন-মানসিকতার এবং তার ধন-সম্পদের পরিশুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে।[১] যাকাত ও করের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নের চার্টে দেখানো হলো ঃ

যাকাত	কর
১। যাকাত আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয়।	১। সরকার আরোপিত বাধ্যতামূলক প্রদেয়।
২। নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্দ্ধে সঞ্চিত সম্পদের উপর আরোপিত হয়।	২। আয়ের উপর আরোপিত হয়।
৩। যাকাত প্রদান করতে অর্থের প্রয়োজন।	৩। কর প্রদান করতেও অর্থের প্রয়োজন।
৪। ধর্মীয় বিধান এবং শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	৪। দেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
৫। অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত খাতেই ব্যয় করতে হবে।	৫। আদায়কৃত অর্থ সরকার যে কোন কাজে ব্যয় করতে পারে।
৬। শুধু দরিদ্রের হক।	৬। সকলের জন্য প্রযোজ্য।
৭। প্রদানকারী কোনও রকম পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশা করতে পারবে না; তবে আখিরাতে আত্মিক উপকার প্রত্যাশা করতে পারে।	৭। কর প্রদানকারী কোনও রকম ব্যক্তিগত উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না।

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত	কর
৮। সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের (নেসাব) উল্লেখ রয়েছে যার নিচে যাকাত প্রদানযোগ্য হবে না। করের ক্ষেত্রে নাই।	৮। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম সীমা থাকলেও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নাই।
৯। যাকাতের প্রদেয় হার স্থির ও অপরিবর্তনীয়।	৯। করের হার স্থির নয়; আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর বৃদ্ধি ঘটতে পারে।
১০। নিয়মিত প্রদেয়।	১০। নিয়মিত প্রদেয়।[১]

উপরের চার্টের আলোকে দেখা যায়, যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সকল ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ আন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু করের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই। যাকাত ও প্রচলিত করের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলোর মধ্যে

প্রথমতঃ কর হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, যার জন্য করদাতা কোন প্রত্যক্ষ উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না। সরকারও করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্য বাধ্য থাকে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত নির্ধারিত লোকদের মধ্যেই বিলি-বন্টন করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না। কিন্তু করের অর্থ যে কোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যাকাত শুধুমাত্র 'সাহেবে নেসাব' মুসলিমদের জন্যই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর, বিশেষত পরোক্ষ কর সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেয়া হয়।

চতুর্থতঃ যাকাতের হার পূর্ব নির্ধারিত ও স্থির। কিন্তু করের হার স্থির নয়। যে কোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং যাকাতকে প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর হিসাবে যেমন কোনক্রমেই গণ্য করা যায় না, তেমনি তার সঙ্গে তুলনীয়ও হতে পারে না।

পঞ্চমতঃ যাকাত শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ফরয ইবাদত এবং ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই মুসলিম ব্যক্তিকে তার নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসাব নিজে কষেই তার যথার্থ যাকাত আদায়

১. ড. এম.এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি ; একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী, পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয়, সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবস্থা করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে করের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে এবং এটা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ও নয়। মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিককেই কর প্রদান করতে হয়।

ষষ্ঠতঃ যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের উপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না, বরং সম্পদ ঘরে জমা থাকলেও যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর। আয় বাড়লে করের পরিমাণ বাড়ে।

সপ্তমতঃ উৎপাদনশীল জমির কর বাধ্যতামূলক এবং দিতেই হবে। পক্ষান্তরে ফসল উৎপাদিত হলেই শুধুমাত্র যাকাত দিতে হয়, অন্যথায় নয়। কর জমির উপর ধার্য হয়। আর ফসলের যাকাত ('উশ্‌র) ফসলের উপর ধার্য হয়।[১]

এ প্রেক্ষিতে যাকাত সাধারণ অর্থে কোন কর নয়। একমাত্র ইসলামই ধনীদের থেকে দরিদ্রদের নিকট সম্পদের নীট হস্তান্তরের স্থায়ী বিধান দিয়েছে। এ স্থায়ী বিধানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ফলপ্রসূ হচ্ছে যাকাত। একদিকে মানুষের আত্মিক ও জাগতিক জীবনের পরিশুদ্ধি অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সাধারণ ঐশী ব্যবস্থার নাম যাকাত।

কাজেই যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সকল ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাকাতে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ নিহিত রয়েছে। কিন্তু করের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন তাগিদ নাই। সরকার করের আকারে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ শুধুমাত্র দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে ব্যয় করতে বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ অবশ্যই আল-কুআনের নির্দেশিত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে, যার অধিকাংশ দরিদ্র ও অভাবী লোকজনের প্রাপ্য।

সুতরাং ইসলামী শরী'আতে যে যাকাত ব্যবস্থা রয়েছে তা কোনক্রমেই প্রচলিত করের সাথে তুলনা করা যায় না। কাজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে কোন অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন, জনগণের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারী অর্থ হিসাবে খরচ করা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য জনসেবার উদ্দেশ্যে কিংবা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদনযোগ্য নয়।

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ (দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী), ৩য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৪৫-৪৬ ; মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা :৬৫, অক্টোবর, খৃ. ১৯৯৯, পৃ. ৮২-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন ও যাকাত

পরিচ্ছেদ ঃ ১

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। আল্লাহ্ তা'আলা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাকাতের অর্থ বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। আট শ্রেণীর মধ্যে ছয়টিই দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[১] ইসলামী শরী'আতে তথা আল-কুরআনে নামায ও যাকাতের কথা প্রায়শই পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে।[২] নামায ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে, আর যাকাত সেই অনুভূতিকে বাস্তবে রূপদান করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে।

দরিদ্রতা দূরীকরণার্থে গৃহীত কার্যক্রম থেকে কোন মুসলমান নিষ্ক্রিয় থাকলে ইসলামের সুমহান লক্ষ্যই ব্যাহত হয়। কারণ সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার আনয়নই ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য। বস্তুত যাকাত এক বিপ্লবী প্রক্রিয়া। কারণ দরিদ্রদের জন্য সকল প্রকার সম্পদ থেকেই নির্দিষ্ট অনুপাতে যাকাত আদায় করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। অলস সম্পদের ওপর ২. ৫%, কৃষি সম্পদের ওপর ১০% বা ৫%, খনিজ সম্পদের ওপর ২০% যাকাত আরোপের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল প্রকার সম্পদকে যাকাতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে দরিদ্রতা দূরীকরণার্থে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা যখন এই দরিদ্রতার সমস্যা চৌদ্দ শত বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাধান করার দৃঢ় ঘোষণা করেছে তখনও ইউরোপ ঘোর অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং যাকাতের মত ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা ছিল তাদের জন্য অকল্পনীয়।[৩]

ইসলামের নীতি হলো পুঁজি তথা নগদ অর্থকে অলসভাবে ফেলে না রাখা। ধন-সম্পদ যেন শুধুমাত্র ধনী লোকদের কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে। সম্পদ বিতরণ, মূলধনের বিস্তার সাধন এবং ব্যাপকভাবে

---

১. ৬টি হলো ঃ দরিদ্র জনসাধারণ (ফকীর); নিঃস্ব ও অভাবী ব্যক্তি (মিসকীন) ; মনজয় করার জন্য (নওমুসলিম) ; ক্রীতদাস বা বন্দীমুক্তি ; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মুসাফির। (বিঃ দ্রঃ আলকুরআন, ৯ ঃ ৬০)।

২. আল-কুরআনে ২৬ বার সালাত ও যাকাত একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ ঃ ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭; ৪ ঃ ৭৭, ১৬২; ৫ ঃ ১২, ৫৫ ; ৯ ঃ ৫, ১১, ১৮, ৭১; ১৯ ঃ ৩১, ৫৫ ; ২১ ঃ ৭৩ ; ২২ ঃ ৪১, ৭৮ ; ২৪ ঃ ৩৭, ৫৬ ; ২৭ ঃ ৩ ; ৩১ ঃ ৪ ; ৩৩ ঃ ৩৩; ৫৮ ঃ ১৩ ; ৭৩ ঃ ২০ ; ৯৮ ঃ ৫।

৩. ড. এম.এ. মান্নান : ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), খৃ. ১৯৮৩, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের মধ্যে একে আবর্তিত করাই ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم»[১]

"আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«كى لا يكون دولة بين الاغنياء»[২]

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।"

যাকাত ইসলামী সমাজে ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে দারিদ্র্য বিমোচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এই ব্যবস্থায় সমাজে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, ফলে সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি পায় তথা আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না, ফলে বেকারত্ব তথা অর্থনৈতিক অভিশাপ নেমে আসে।

কিন্তু যাকাত মজুতদারি তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সম্পদশালী মুসলমানদের ওপর বাধ্যতামূলক যাকাত আরোপের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরিদ্রকে ক্রয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে একদিকে নিঃস্ব অসহায়কে তার জীবিকা নির্বাহের ন্যূনতম অধিকার দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার সৃষ্টি তথা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যাকাতের মাধ্যমে সহজেই এই লক্ষ্য হাসিল করা যায়। যাকাত প্রাপ্তির ফলে দরিদ্র ব্যক্তি তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে, উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আরও শ্রমিক ও কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তথা বেকারত্ব দূর হয়। বেকারত্ব দূরীভূত হলে লোকজনের ক্রয়ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়, ফলে আরও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ও জাতি উন্নতি লাভ করে। এভাবে যাকাতদাতা ও যাকাত গ্রহীতা উভয়ই উপকৃত হবে। কাজেই যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য তথা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فالئك هم المضعفون»[৪]

"আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।"

পৃথিবীতে একমাত্র দ্বীন ইসলামই ধনীদের থেকে দরিদ্রদের নিকট সম্পদের নীট হস্তান্তরের স্থায়ী বিধান দিয়েছে। এই স্থায়ী বিধানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। যাকাত সাধারণ অর্থে কোন কর নয়। একদিকে মানুষের আত্মিক ও জাগতিক জীবনের পরিশুদ্ধি,

১. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৩৪ (আংশিক)।
২. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৭ (আংশিক)।
৩. ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
৪. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সাধারণ ঐশী ব্যবস্থার নাম যাকাত। মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন সুযোগের ফলে সমাজের সম্পদ কতিপয় সুবিধাভোগী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। যাকাত মানুষকে এই ক্ষতি থেকে মুক্ত করে। যাদের অনেক আছে তাদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে কিছু আদায় করে যাদের প্রয়োজন তাদের মধ্যে বিতরণ করাই যাকাতের উদ্দেশ্য। একদিকে বৈষম্য ও দারিদ্রের বিভীষিকাময় হাহাকার, অন্যদিকে থাকে অভিশাপে উপচে পড়া প্রাচুর্যের পাহাড়। ফলে একটি জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি, এক কথায় সকল আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির ও অচল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ দিয়ে অভাবীরা একদিকে তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন যেমন মেটাতে পারে, অন্যদিকে তেমনি অল্প অল্প করে সঞ্চয় গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রচলিত মাইক্রোক্রেডিট[১] বনাম যাকাত ব্যবস্থা।

১. ব্যাংক ও এনজিওদের[২] দেয়া ঋণের অর্থ দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ গ্রহীতাকে কখনো দাতাকে ফেরত দিতে হয় না।

২. মাইক্রোক্রেডিট-এর উপর সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বা সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয়। কিন্তু যাকাতের উপর কোন লাভ প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, গ্রহীতা প্রাপ্ত যাকাতের মালিক হয়ে যায়।

৩. মাইক্রোক্রেডিট প্রায়শ ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মাফিক দেয়া হয় না। কিন্তু যাকাত দেবার আদর্শ নিয়ম হচ্ছে একজন ব্যক্তির দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ তাকে যাকাত হিসাবে দেয়া যাতে অচিরেই সেও যাকাতদাতায় পরিণত হতে পারে।

৪. একজন ঋণগ্রহীতা একবার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে দ্বিতীয়বার ঋণ প্রদান করা হয় না। কিন্তু যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত দেয়া হবে যতক্ষণ না তার দারিদ্র্য দূর হয় অর্থাৎ বারবার যাকাত দিয়ে হলেও ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর করাই ইসলামের লক্ষ্য।

৫. ঋণের অর্থ পেতে দরিদ্র কৃষককে ধর্ণা দিতে হয়। বারবার যাতায়াতে তার শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু যাকাতের অর্থ গরীবকে চাইতে হয় না। যাকাতদাতার দায়িত্ব যাকাতের অর্থ গরীবের ঘরে পৌছে দেয়া। এতে গ্রহীতার সম্মানহানি রোধ হয়, অর্থ, শ্রম ও সময় বাঁচে।

৬. ঋণের অর্থ পেতে ক্ষেত্রবিশেষে জামানত দিতে হয়, যার অর্থ সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যাকাতের বেলায় সহায়ক জামানতের প্রশ্ন তো ওঠেই না, বরং যে যত বেশী দরিদ্র সে যাকাতের তত বেশী হকদার।

৭. ঋণ এমনভাবে দেয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা কখনো ঋণদাতায় রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু যাকাত এমনভাবে দেয়া হয় যাতে অচিরেই যাকাত গ্রহীতা যাকাতদাতায় উন্নীত হতে পারে।[৩]

নগদ অর্থ-সম্পদের যাকাতের পাশাপাশি সেচের মাধ্যমে আবাদযোগ্য জমিতে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ এবং বৃষ্টির পানিতে চাষযোগ্য জমির ফসলের দশ ভাগের একভাগ ফসল দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

---

১. মাইক্রোক্রেডিট (Micro credit) অর্থ ক্ষুদ্র ঋণ।

২. এনজিও (NGO) Non Government Organisation বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

৩. মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম : দারিদ্র্য বিমোচন প্রচলিত কৌশল বনাম ইসলামী কৌশল (অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা), মার্চ ২০০২, সংখ্যা-২, পৃ. ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত হলো দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি। যাকাত আদায় করার জন্য সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাও করতে হয়। যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে সমাজের কোন দরিদ্রই তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। সমাজে যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হবে যে, তার নিজের কোন রোজগারের ব্যবস্থা নেই এবং তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও এমন কেউ নেই, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে হবে যাকাত ফান্ড থেকে। শরী'আতের বিধান হলো, রাষ্ট্র-সরকার এ যাকাত আদায় করবে এবং তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে সরকারীভাবেই বন্টন করবে। যাকাতের অর্থ এ শ্রেণীর দরিদ্রদের ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। এজন্য আদায় ও বন্টনের কার্যকর ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।[১]

যাকাতের অর্থ প্রাপ্তি দরিদ্রদেরই একমাত্র অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যাকাত আদায় করে পরিকল্পিতভাবে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وفى اموالهم حق للسائل والمحروم»[২]

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«ان تبدوا الصدقت فنعما هى ج وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم»[৩]

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল ; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল।"

তিনি আরও বলেন ঃ

«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»[৪]

"তাদের সম্পদ থেকে তুমি 'সাদাকা গ্রহণ কর এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

"تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم»[৫]

"তাদের ধনী লোকদের থেকে নেয়া হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।"

---

১. ড. আবদুল করিম জায়দান : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (অনু: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা) খৃ. ১৯৯৩, পৃ. ৮৪।

২. আল-কুরআন, ৫১ ঃ ১৯।

৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭১।

৪. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১০৩।

৫. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল : সহীহ আল-বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী), কিতাবুয যাকাত, ১.খ. পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত হলো মুসলমানদের সমবায় ভিত্তিক পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা এবং 'জীবন বিমা'। এটা মুসলমানদের 'প্রভিডেন্ড ফান্ড'-এর কাজও করে থাকে। যাকাত হলো মুসলমানদের বেকার উপার্জনহীন লোকদের জন্য সঞ্চিত সাহায্য ফান্ড, অক্ষম, পংগু, লুলা, রুগ্ন, ইয়াতীম ও বিধবাদের লালন-পালনের উপায়। সর্বোপরি যাকাত এমন এক ব্যবস্থা যা একজন মুসলিমকে ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। এক সময় যারা সম্পদশালী ভবিষ্যতে তারাও দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, তখন আকস্মিক কোন বিপদে পড়লে, রোগাক্রান্ত হলে, আগুনে ঘর-বাড়ী পুড়ে গেলে, বন্যা কবলিত হলে কিংবা দেওলিয়া হয়ে গেলে অপর বিত্তশালী মুসলিমগণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কেননা এই সকল বিপদ থেকে একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই মানুষকে নিষ্কৃতি দান করে এবং স্থায়ীভাবে নিশ্চিন্ত করে দিতে পারে।[১]

ইসলামী সমাজে যাকাত হচ্ছে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। দরিদ্র মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যও যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের যেসব উন্নয়ন প্রকল্প শুধুমাত্র দুঃখী-দরিদ্র মানুষের স্বার্থে গ্রহীত, সেগুলোতে যাকাত তহবিল থেকে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।[২]

দরিদ্রকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যায়

ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করবে এবং ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করে পরিকল্পিতভাবে ও প্রয়োজন মাফিক দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করবে। ইসলামী ব্যবস্থায় যাকাতকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রাখার অন্যতম কারণ হলো,এর সুষ্ঠু আদায় ও বণ্টন নিশ্চিত করা। দেখা গেল একাধিক যাকাতদাতা একজন দরিদ্র ব্যক্তিকেই যাকাত দিচ্ছে, অন্যদিকে আরেক দরিদ্র ব্যক্তি আছে যে মোটেই পেল না। অথচ তার অভাব ছিল আরো বেশী।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত প্রাপ্তির তালিকায় দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। দরিদ্রদের এমনভাবে দিবে যাতে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। যাকাতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দরিদ্র দরিদ্রই থাকবে। বরং তাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সে যেন যাকাত গ্রহীতা থেকে যাকাতদাতায় উন্নীত হয়।

দরিদ্রকে তার পুরো জীবন পরিচালনা করার মত যাকাত দিতে হবে। তার অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে যাতে পুনরায় তাকে যাকাত গ্রহণ করতে না হয় এবং সে নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।[৩]

ফকীর-মিসকীন যদি পেশাজীবি হয় তাহলে তার পেশার সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কেনার মত

---

১. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী : ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (অনূ: মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), ৮ম প্রকাশ, খৃ. ২০০১, পৃ. ১০০।

২. এম. এ. মান্নান, Islamic Economics : theory and practice (শাহ্ মোহাম্মাদ আশরাফ পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান), খৃ. ১৯৮৩, পৃ. ৩০।

৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : মুশকিলাতুল ফাক্‌র ওয়া-কাইফা আলাজাহাল ইসলাম (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রো), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, হি. ১৪১৫ / খৃ. ১৯৯৫, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ তাকে দিতে হবে, এর মূল্য কম বেশী যাই হোক। যেন সে তা দিয়ে তার জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের অবস্থা ও পেশাভেদে অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ শাক-সব্জি বিক্রেতাকে পাঁচ শত থেকে এক হাজার টাকা, স্বর্ণ বিক্রেতাকে এক লক্ষ টাকা বা তার ব্যবসায়িক ন্যূনতম প্রয়োজন মত। সাধারণ ব্যবসায়ী, বিস্কুট-চানাচুর উৎপাদক, আতর বিক্রেতা, মানি এক্সেঞ্জারসহ সকল ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের পেশাজীবীকে তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ প্রদান করা। এমনকি দর্জি, মিস্ত্রী, নাপিত ও গোশ্ত বিক্রেতাদেরকে কাজ করার সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় আসবাবাদি ক্রয়ের অর্থ প্রদান করা। ভূমিহীন কৃষককে এক খণ্ড জমি ক্রয়ের মত অথবা বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ (বর্গা) নেয়ার মত অর্থের ব্যবস্থা করা, যেন তার আয় দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

দরিদ্র ব্যক্তি যদি কোন সুনির্দিষ্ট পেশা বা শিল্পে পারদর্শী না হয় এবং কোন ধরনের ব্যবসা করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতাও তার না থাকে তবুও তার জীবন পরিচালনার মত কোন ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে স্থায়ীভাবে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে তাকে কিছু জমি ক্রয় করে দেয়াসহ এই ধরনের কার্যক্রমে অর্থ যোগান দেয়া। কারণ যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীকে অভাবমুক্ত করা এবং স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনই ইসলামের একান্ত লক্ষ্য ও কাম্য।[১]

দরিদ্রকে যাকাত ফান্ড থেকে এমনভাবে প্রদান করতে হবে যেন সে তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। দরিদ্রতা ঈমানের ক্ষেত্রে যেমনভাবে হুমকিস্বরূপ, চরিত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে তার চেয়েও মারাত্মক হুমকির কারণ। এছাড়া দরিদ্র্যতা মানুষকে চারিত্রিক মূল্যবোধহীন করে ফেলে এবং দীন ও নৈতিকতা তার কাছ থেকে বিদায় নিতে থাকে। দারিদ্র্য অবস্থা একজন যুবক বেকারের জন্য চূড়ান্ত অবমানকর ব্যাপার। পবিত্র কুরআনে এদের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»[২]

"যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"

যদিও এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, বিবাহের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের শুধুমাত্র অর্থই যেন বিবেচ্য বিষয় না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

«وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ط ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ط والله واسع عليم»[৩]

"তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (বিবাহহীন) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ অবলম্বনে।

২. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৩৩।

৩. আল-কুরআন, ২৪ ঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন ; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

প্রাচীন কালে মানুষ দারিদ্র্যের কারণে এবং এর ভয়ে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করত না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পবিত্র আল-কুরানে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি আয়াত নিম্নরূপ।

«ولا تقتلوا اولادكم من املاق ط نحن نرزقكم واياهم»[১]

"দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"

«ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ط نحن نرزقهم واياكم ط ان قتلهم كان خطأ كبيرا»[২]

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"

মূলত দরিদ্রকে যাকাতের অর্থ এমনভাবে দিতে হবে যেন তাদেরকে সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীত করা যায়। তারা যেন বছরের পর বছর দান-সাদকার উপরই নির্ভরশীল না হয়ে থাকে। দয়া বা দান সমাজ ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এর কোন সুনির্ধারিত আয়-ব্যয় বা বন্টন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে দান বা দয়া দারিদ্র্যের মত একটি মৌলিক অথচ জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর দ্বারা স্থায়ী কোন সমাধান আশা করা যায় না।

দরিদ্রদের কি পরিমাণ দিতে হবে এ সম্পর্কে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ

"اذا اعطيتم فأغنوا"[৩]

"যখন তোমরা দিবে, ধনী বানিয়ে দাও।"

ওমর ফারুক (রা) যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের পরিপূর্ণভাবে অভাবমুক্ত করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি কেবলমাত্র কিছু খাদ্যদ্রব্য অথবা কয়েকটি টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেননি। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার দুরবস্থার কথা বললে তিনি তাকে তিনটি উট দিলেন। যেন উক্ত ব্যক্তি পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত হয়। এ ছাড়াও তিনি যাকাত বিতরণকারীদের বলতেন, তাদেরকে (দরিদ্রদের) বারবার দাও। প্রয়োজনে একজনকে এক শত উট দিতে হলে তাও প্রদান কর।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৫১ (আয়াতাংশ)।

২. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ৩১।

৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ ও দরিদ্রদের তাদের প্রাপ্য দেয়ার ব্যাপারটি মহান রব্বুল আ'লামীন অসংখ্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا»[১]

"আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।"

«وهو الذى انشا جنت معروشات وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ط كلوا من ثمره اذا اثمر واتواحقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لا يحب المسرفين»[২]

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য শস্য, যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন। এরা একে অন্যের সদৃশ্য এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল আহার করো আর ফসল তুলবার দিন তার দেয়া (হক্ক) প্রদান করো এবং অপচয় করো না; কারণ তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না।"

যাকাতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দরিদ্রদের দুইএকটি করে টাকা দান করা বা বছরে দুই একটি করে লুঙ্গী, শাড়ী বিতরণ, বরং তাদের মানসম্মত ও সম্মানজনক জীবন যাপন নিশ্চিত করা এবং তাদের সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা করা যাকাতের উদ্দেশ্য। আল-কুরআনে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানকারী মুত্তাকীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبيين ج واتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ج واقام الصلوة واتى الزكوة ج والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ج والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس ط اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون»[৩]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

---

১. আল-কুরান,. ১৭ ঃ ২৬।

২. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৪১।

৩. আল-কুরান, ২ ঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ـ انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا »[১]

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"

দরিদ্রদের অভাব ও অসুবিধা দূর করার কথা কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে। আল-কুরআনে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা পাওয়া যায় তার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, অভাবগ্রস্ত জনসমষ্টির অভাব-দুঃখ দূর করা। ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সরকারকে এমন অনেক ব্যয় করতে হবে, যা আপাত দৃষ্টিতে লাভজনক নয় কিন্তু যা করা মানবকল্যাণের দাবী। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা এমন একটি ব্যাপক ব্যবস্থা যেখানে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় অর্থনৈতিকভাবে সুসমন্বিত করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের আবার এ প্রক্রিয়ার সাথ জড়িত করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা গৃহীত হয়েছে। যাকাত, দান-সাদাকা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়।[২]

দরিদ্র শ্রেণী সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক শ্রেণীর দারিদ্র্য যারা কাজ করার মাধ্যমে উপার্জন করতে সক্ষম। যেমন কৃষক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী। হয়তো ভূমি ও কৃষি পণ্যের অভাবে বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় তাদের উপার্জন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ ধরনের দরিদ্র লোকদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তারা নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। পুনরায় যেন যাকাত গ্রহণ করতে না হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাকাতের অর্থ-সম্পদ দিয়ে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যায়, যার মালিকানা থাকবে কর্মক্ষম দরিদ্রদের হাতে।

আরেক শ্রেণীর দরিদ্র যারা উপার্জন করতে পারে না বা অক্ষম। যেমন পঙ্গু, অন্ধ, অতিবৃদ্ধ, বিধবা ও শিশু-কিশোর ইত্যাদি। এ ধরনের দরিদ্রদেরকে এক বছরের ভরণ-পোষণের পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে। যদি আশংকা হয় যে, সে অপব্যয় করবে অথবা প্রাপ্ত অর্থ নষ্ট করে ফেলবে, তাহলে কয়েক মাস অন্তর তার খরচের অর্থ তাকে দেয়া হবে।[৩]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে একথা স্পষ্ট হলো যে, দরিদ্রদের এমনভাবে দিতে হবে যেন তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, বছরের পর বছর যাকাত গ্রহীতা না হয়ে তারা যেন যাকাতদাতায় পরিণত হতে পারে।

---

১. আল-কুরআন, ৭৬ ঃ ৮-৯।

২. শাহ আবদুল হান্নান : ইসলামী অর্থনীতি দর্শনও কৌশল (আল-আমিন প্রকাশন, ঢাকা), খৃ. ২০০২, পৃ. ১৪৩-১৪৪ ।

৩. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

যাকাত হিসাব ও ব্যয়ের পরিকল্পনা

যাকাত হিসাব করার অনুসরণীয় পন্থা

যাকাত প্রদানকারীগণ যাতে তাদের যাবতীয় অর্থ-সম্পদের হিসাব চূড়ান্ত করে সহজেই যাকাত নিরূপণ করতে পারেন সেজন্য নিম্নে একটি নমুনা দেয়া হলো ঃ

	সম্পদ	সর্বমোট মূল্য (টাকা)	যাকতা বহির্ভূত মূল্য (টাকা)	যাকাতযোগ্য মূল্য (টাকা)
১।	বাড়ী	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	-
২।	আসবাবপত্র (বাড়ী ও অফিসে)	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	-
৩।	মূলধন সামগ্রী (জমি, দালান, মেশিন)	১,০০,০০,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-	-
৪।	ব্যবহারের গাড়ী ও যানবাহন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	-
৫।	সোনা	২০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	২০,০০০/-
৬।	রূপা	১০,০০০/	-	১০,০০০/-
৭।	ব্যবহৃত অলংকার (সোনা, রূপা)	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	-
৮।	নগদ অর্থ (ব্যাংক ও হাতে)	৭০,০০০/-	-	৭০,০০০/-
৯।	পাওনা অর্থ	৪০,০০০/-	-	৪০,০০০/-
১০।	বিভিন্ন কোম্পানী শেয়ার বন্ড ইত্যাদি (বাজার মূল্য হিসাবে)	৫০,০০০/-	-	৫০,০০০/-
১১।	ব্যবসায়ের ক্রীত মওজুদ কাঁচামাল	১,৩০,০০০/-	-	১,৩০,০০০/-
১২।	ব্যবসায়ের জন্য ক্রীত মালের স্টক (ক্রয় মূল্যে)	১,৩০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-
১৩।	ব্যবসায়ের জন্য তৈরী মওজুদ মাল (বাজার দামে)	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-
	মোট	১,২০,৭০,০০০/-	১,০৯,৫০,০০০/-	১১,২০,০০০/-

উল্লেখিত ক্ষেত্রে আমন ধান ২৭ মনের ১০/১ ভাগ অর্থাৎ ২.৭ মন; ইরি ধান ৫০ মনের ২০/১ ভাগ বা ২.৫০ মন, ছোলা ৩০ মনের ২০/১ ভাগ বা ১.৫০ মন এবং মোট ৭৩ মন গমের মধ্যে ২৩ মনের ১০/১ ভাগ বা ২.৩০ মন, আর ৫০ মনের ২০/১ বা ২.৫০ মন গম ফসল তোলার সময়েই যাকাত হিসাবে বের করে দিতে হবে।[১]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের পরিমাণ নির্দ্ধারণ

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশেও যাকাতের পরিমাণ আনুমানিক কত হতে পারে এবং সে অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে কি ধরনের উপকার লাভ করা যাবে তা জানার জন্য যাকাতের পরিমাণের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

বাংলাদেশের যাকাত হিসাব

ক) যাকাতের তালিকা (কোটি টাকায় হিসাব)

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বর্হিভূত	যাকাতযোগ্য	যাকাতের হার	যাকাতের পরিমাণ
১	নগদ অর্থ (ব্যাংক)	৮২,০০০	২২,০০	৬০,০০০	২.৫	১,৫০০
২	সোনা, রূপা অংলংকারও লকারে রক্ষিত স্বর্ণ	০,০০০	২,০০০	৮,০০০	২.৫	২০০
৩	তফশিলী ব্যাংকে জমাঃ					
	মেয়াদী আমানত	২০,০০০	-----	২০,০০০	২.৫	৫০০
৪	পোষ্টাল সঞ্চয়	৮,০০০	-----	৮,০০০	২.৫	২০০
৫	শেয়ার সার্টিফিকেট	১২,০০০	২,০০০	১০,০০০	২.৫	২৫০
৬	ইন্স্যুরেন্স	৫,০০০	১,০০০	৪,০০০	২.৫	১০০
					মোট =	২৭৫০ কোটি টাকা

উৎসঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,আগষ্ট ২০০১ ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব।

খ) ব্যবসায়িক মালামাল

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বহির্ভূত মূল্য	যাকাত যোগ্য মূল্য/অর্থ	যাকাতে-র হার	যাকাতের টাকার পরিমাণ
১	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১০,৭৮৬	৬,৭৮৬	৪,০০০	২.৫	১০০
২	মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প	২৭,৬১৬	৭,৬১৬	২০,০০০	২.৫	৫০০
৩	পাইকারী ও খুচরা বিপণন	২৭,৬১৬৭	৭,৬১৬	২০,০০০	২.৫	৫০০
	উৎস : ২০০১ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব					

১. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন : যাকাত কি ও কেন (ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা),পঞ্চম সংস্করণ, খৃ.২০০০,পৃ. ২২-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ) বর্তমানকালে যাকাতের উৎসসমূহ

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বহির্ভূত মূল্য	যাকাত যোগ্য মূল্য/অর্থ	যাকাতের হার	যাকাতের অর্থের পরিমাণ
১	পরিবহন ব্যবসা সড়ক ও নৌযান	২০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫
২	বাড়ী ভাড়া ও ব্যবসা, দোকান তৈরী	২২,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫
৩	ইটের ভাটা	২,০০০	১,০০০	১,০০০	২.৫	২৫
৪	হিমাগার	২,০০০	১,০০০	১,০০০	২.৫	২৫
৫	ক্লিনিক	৪,০০০	---	৪,০০০	২.৫	১০০
৬	কনসালটিং ফার্ম	৪,০০০	---	৪,০০০	২.৫	১০০
৭	যন্ত্রপাতি শিল্প কারখানা	২০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০১ মোট = ১৩৭৫ কোটি টাকা

ঘ) কৃষি ফসল (লক্ষ মেট্রিক টন হিসাবে)

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	'উশর যোগ্য	'উশরের হার	'উশরের পরিমাণ	যাকাতের 'উশরের পরিমাণ
১	ধান	১.৫০	১.০০	১০%	১০ লক্ষ টন	১০৮০.০০ কোটি টাকা
২	ধান ও গম	১.০০	০.৫০	৫%	২.৫ "	২৭০.০০ "
৩	গোলআলু	০.২৯	০.১৫	৫%	----	৫০.০০ "
৪	পেঁয়াজ মরিচ রশুন	০.০৪	০.০২	৫%	২.৫	৫০.০০ "
৫	পাট	০.৭৯	০.৪০	৫%	২.৫	৫০.০০ "
৬	ডাল, সরিষা, আখ ও অন্যান্য	---	---	---	---	১০০.০০ "
					মোট = ১৬০০	" টাকা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট যাকাতযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৬৫৭৫ কোটি টাকা।

উপরোক্ত খাতগুলো ছাড়াও বালাদেশে যাকাত যোগ্য আরও সম্পদ রয়েছে। যেমন প্রতি বছর ২০০০ কোটি টাকার বেশী অর্থ হিমায়িত খাদ্য, চা, চামড়া রফতানি থেকে আয় হয় তা থেকে ৫% হারে উশর ধরলে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। 'উশরযোগ্য নয় এমন ১০০০ কোটি টাকা বাদ দিলেও ৫০ কোটি টাকার উশর পাওয়া যায়। তাছাড়া খনিজ সম্পদের ২০% যাকাত তহবিলে রাখার কথা এবং তা গরীবদের মাঝে বন্টন করার কথা। এই খাতে বাংলাদেশীর টাকার হিসাবে ২৬০০ (২০০১ সালের হিসাব) কোটি টাকা। এই খাত থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণ সেবা পাচ্ছে। কিন্তু গ্যাস ও গ্যাস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা একমাত্র ধনিক শ্রেণীই পাচ্ছে, গরীব শ্রেণীর জন্য অন্তত ১০% হিসাবে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত। দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রী,

বিদেশে কর্মরত জনশক্তির অর্থ, গার্মেন্টিস ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা এবং ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ ব্যতীত বহু লোকের আয় আছে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করলে যাকাতের পরিমাণ আরও

Dhaka University Institutional Repository

বাড়বে।

ব্যবসায়িক আমদানির মধ্যে বিদেশী পণ্যের হিসাব ধরলে যাকাতের পরিমাণ আরও বাড়বে। ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ফলমূল, শাক, সবজি বিবেচনা করলে যাকাতের পরিমাণ আরও বাড়বে। এইভাবে বাংলদেশে মোট যাকাতের পরিমাণ ৬৫৭৫ কোটি টাকারও বেশী হতে পারে। তবে তা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে ২০০২ সালে আরো বেড়ে যেতে পারে তার কারণ ২০০১ সালের সমীক্ষার তুলনায় ২০০২ সালের প্রবৃদ্ধি অবশ্য কিছু না কিছু বাড়বে এইভাবে প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির সাথে সাথে যাকাতের পরিমাণও বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশ জিনি সহগ স্মারণী নিম্নে দেওয়া হল ।

পরিবার গ্রুপ	১৯৯৫/৯৬ সাল	১৯৯১/৯২ সাল
জাতীয় পর্যায়	১০০	১০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৮৮	১
ডিসাইল-১	২.২৪	২.৫৮
ডিসাইল-২	৩.৪৭	৩.৯৪
ডিসাইল-৩	৪.৪৬	৪.৯৫
ডিসাইল-৪	৫.৩৭	৫.৯৪
ডিসাইল-৫	৬.৩৫	৭.০৮
ডিসাইল-৬	৭.৫৩	৮.৪৫
ডিসাইল-৭	৯.১৫	১০.০৯
ডিসাইল-৮	১১.৩৫	১২.১০
ডিসাইল-৯	১৫.৪০	১৫.৬৪
ডিসাইল-১০	৩৪.৬৮	২৯.২৩
সর্বোচ্চ-৫	২৩.৬৮	১৮.৮৫
জিনি অনুপাত	০.৪৩২	০.৩৮৮

১৯৯৫/৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় শতকরা গরীব ৫০% লোকের আয় ২২% অন্যদিকে ধনী ২০% লোকের আয় জাতীয় আয়ের ৫০.০৮% এর মধ্যে সর্বোচ্চ ধনী ৫% লোকের আয় জাতীয় আয়ের ২৩.৬২%। তা থেকে বুঝা যায় সর্বোচ্চ ধনী লোকদের অধিক টাকা থাকায় তাদের যাকাত দানের ক্ষমতা বেশী। বর্তমানে ৫% লোকের কাছে ২৫% ও বেশী জাতীয় আয় আছে তাছাড়া বাংলাদেশের ভূমির বন্টনেও অসমতা আছে শতকরা ১৭%-২০% লোকের ভূমির পরিমাণ ৭০%। তাতে তাদের 'উশর প্রদানের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এই কারণে যাকাত ৬৫০০ কোটি টাকার অধিক হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। একটি দেশের যাকাত রাজস্ব আয়ের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলেও ৬৫০০ কোটির বেশী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ২০০১-২০০২ সালের রাজস্ব আয় ২৪.০০০ কোটি টাকা এর ৪ ভাগের ১ ভাগ যাকাত পাওয়া যথার্থ বলা যায়। অন্যদিকে জিনিসহগ প্রমাণ করে ধনীদের আয় দ্রুত বাড়ছে। ২০০১ সালে এই হিসাবে ৪০% ধনীদের কাছে ৭৫% সম্পদ জমা হয়েছে তাতে যাকাত দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে ৪০% এর আয় ৭৫% সুতরাং মোট জাতীয় আয়ের ৭৫% এর যাকাতের হার ২.৫%

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব করলে যাকাতের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় (২১০০০০X৭৫X২.৫)/১০০X১০০০ = ৩৯৩৭.৫ কোটি টাকা। কারণ ২০০২ সালে জাতীয় আয় ৩০০০০০ কোটি টাকা তাছাড়া 'উশর এবং 'উশরের অর্ধেক ও খনিজ সম্পদ থেকে বাকী ২০০০ কোটি টাকা পাওয়া সম্ভব। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে বাংলাদেশের যাকাতের পরিমাণ ৬৫০০ কোটি টাকারও অধিক হতে পারে।

উৎস ঃ ২০০০-২০০১ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব/অর্থনৈতিক সমীক্ষা আগষ্ট ২০০১-এর হিসাব।

উদ্ধৃতি ঃ মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ঃ শুধু দারিদ্র্য বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, অর্থনীতি গবেষনা, সংখ্যা.৩,নভেম্বর- ২০০২।

বাংলাদেশের কৃষি খাত থেকে যাকাত

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষিজীবি। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ভূমিতে কৃষি খাত তথা ফসলের যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে একটি ধারণা পেশ করা হলো।

টেবিল ঃ ১

বাংলাদেশের কৃষি-শস্যসহ মোট মূল্য (১৯৯০-৯১সনের টাকার হিসাবে)

বিভাগ	কৃষি শস্য	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী	মৎস্য	বনজ	মোট
চট্টগ্রাম	৫,০২৮.৪	৬৩৬.৫	৬৯৫.৯	১৫১৭.৯	৭৮৭৮.৭
ঢাকা	৫,৬৩৫.৪	৬৮৭.৮	৫৩৮.৯	১৬৭৯.৩	৭০৩১.৭
খুলনা (বরিশাল সহ)	৪৩৮২.১	৫৩২.০	১১৫৭.৯	৬২৭.৭	৬৬৯৯.৭
রাজশাহী	৬৫৪২.৫	৮১৫.৪	২৭৮.২	৭৫.৩	৭৭২১.৪
বাংলাদেশ	২১,৫৮৮.৪	২,৬৭১.৭	২,৬৭৪.৭	২৬৭০.৫	২৯,৩২১.৫

উপরোক্ত চার্টে বাংলাদেশ ১৯৯০-৯১ সালের চলতি হিসাব অনুযায়ী কৃষি শস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী, মৎস্য এবং বনজ সম্পদের মোট পরিমাণসহ মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ২

বাংলাদেশের ১৯৯০-৯১ সনের সেচভুক্ত ও সেচ বহির্ভূত জমির শতকরা হার বণ্টন (একর হিসাবে)

	মোট ফসল ভূমি		৩,৪৭,৮৪,০০
ক.	এক ফসলী দুই ফসলী তিন ফসলী	৮১,৪০,০০০ একর ৯৬,৩৪,০০০ একর ২৪,২৪,০০০ একর	
খ.	সেচভুক্ত ভূমি		৭২,৫৫,১৭০
	সেচভুক্ত ভূমির শতকরা হার		(২০.৮%)
গ.	সেচ বহির্ভূত ভূমি		২,৭৫,২৮,৮৩০
	(সেচ বহির্ভূত ভূমির শহকরা হার)		(৭৯.২%)

* সূত্র ঃ বিবিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি, খৃ. ১৯৯২, পৃ. ১১৪।
* সূত্র ঃ বিবিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি, ১৯৯২, পৃ. ১৪৪-৪৫, ১৪৮।

উপরোক্ত চার্টে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩,৪৭,৮৪,০০০ একর এবং এতে সেচের আওতাভুক্ত ২০.৮% ভাগ ও সেচ বহির্ভূত ভূমির পরিমাণ ৭৯.২% ভাগ।

টেবিল ঃ ৩

একর প্রতি ধানের উৎপাদন

		স্থানীয়	উচ্চ ফলনশীল জাত	মোট
ক.	ভূমির পরিমাণ '০০০' একর হিসাবে	১৪,৪২০	১১,৩৫৮	২৫,৭৭৮
খ.	উৎপাদন '০০০' মেট্রিক টন হিসাবে	৬,৯৫৭	৯,৮৮৮	১৬,৮৪৫
গ.	একর প্রতি উৎপাদন (মন) [(খ X ২৭) ÷ ক]	১৩.০৩	২৩.৫	১৭.৬

* সূত্র ঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি, ১৯৯২, পৃ. ১৬৮।

টেবিল -৪ এ সেচভুক্ত এবং সেচ বহির্ভূত ভূমিতে একর প্রতি শস্য উৎপাদন দেখানো হয়েছে। তন্মধ্যে সেচভুক্ত ভূমির উৎপাদন ২৩.৫ মন এবং সেচ বহির্ভূত ভূমির উৎপাদন মাত্র ১৩.০৫ মন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪

একরপ্রতি শস্য উৎপাদন

		সেচভুক্ত	সেচ বহির্ভূত
ক.	একর প্রতি উৎপাদন (মন)	১৩.০৩	২৩.৫
খ.	নিসাব পরিমাণ শস্যক্ষেত্র (একরে [পাঁচ ওয়াসক অথাব ২৬.৫ মন	১.১৩	২.০৩

* *সূত্র ঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি, ১৯৯২, পৃ. ১৬৮।*

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে ফসল কাটার পরই যদি তা নিসাব পরিমাণ (৫ ওয়াসক বা ২৬.৫ মন) হয় তাহলে তার 'উশ্‌র প্রদান করতে হবে, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই। ফসল যদি বছরে কয়েকবারও উৎপাদিত হয় তাহলে প্রতিবারই উশ্‌র দিতে হবে। টেবিল-৪ এ সেচভুক্ত ও সেচ বহির্ভূত উশ্‌রযোগ্য ভূমির ফসলের সর্বনিম্ন পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ১৯৯২ অনুসারে ভূমির আয়তনের ভিত্তিতে কৃষি ফার্মকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাহলো ঃ

ক্ষুদ্র	০.৫-২.৪৯ একর
মাঝারি	২.৫-৭.৪৯ একর
বৃহৎ	৭.৫- তদুর্ধ্ব (একর)

টেবিল ঃ ৫

'উশর যোগ্য মোট জমির পরিমাণের শতকরা হার

ক্ষুদ্র ফার্ম [০.০৫-৪৯ একর]	৭০,৬৬,০০০	৬৫,৭৩,০০০	২৮.৯৮%
মাঝারি ফার্ম [২.৫-৭.৪৯ একর]	২৪৮৩.০০	১০২,২৬,০০০	
বৃহৎ ফার্ম [৭.৫-তদূর্ধ্ব]	৪.৯৬,০০০	৫৮,৭৯,০০০	৭১.০২%
মোট	১০০,৪৫,০০০	২,২৬,৭৮,০০০	১০০%

* *সূত্র ঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি, ১৯৯২*

উপরে বর্ণিত টেবিল (১-৫) এর আলোকে পরবর্তী টেবিল-৬ এ কি পরিমাণ ফসল থেকে কি পরিমাণ উশ্‌র আদায় করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে একটি চিত্র দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৬

'উশরী ফসলের ওপর 'উশর নির্ণয় (১৯৯০-৯১ সনের টাকার মূল্যে)

ক	'উশর প্রদান সাপেক্ষে কৃষি ফসলের মূল্য (কৃষি ফসলের মোট মূল্য ২১৫৮৮.৯ কোটি টাকার ৭১.০২%)	১৫,৩৩২.৪৪ কোটি টাকা
খ	'উশর প্রদান সাপেক্ষে সেচভুক্ত জমির কৃষি ফসলের মূল্য [১৫,৩৩২.৪৪ কোটি টাকার ২০.৮%]	১২,১৪৩.২৯ কোটি টাকা
গ	'উশর প্রদান সাপেক্ষে সেচবহির্ভূত কৃষি ফসলের মূল্য [১৫,৩৩২,৪৪ কোটি টাকার ৭৯.২%]	১২,১৪৩.২৯ কোটি টাকা
ঘ	সেচভুক্ত জমি হতে 'উশর সংগৃহীত হবে (৩,১৮৯.১৪ কোটি টাকার ৫%)	১৫৯.৪৬ কোটি টাকা
ঙ	সেচ বহির্ভূত জমি হতে 'উশর সংগৃহীত হবে (১২,১৪৩.২৯ কোটি টাকার ১০%)	১,২১৪.৩৩ কোটি টাকা
চ	কৃষি ফসল থেকে মোট উশ্‌র বাবদ সংগৃহীত হবে [ঘ + ঙ]	১৩৭৩.৭৯ কোটি টাকা

১৯৯০-৯১ সনের টাকার মূল্যে সিডিউল ব্যাংক সমূহে সঞ্চয়সহ নগদ অর্থে যে পরিমাণ যাকাত আসে তা টেবিল ৭ এ দেখানো হয়েছে।

টেবিল ঃ ৭

আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যাকাত

	বিভিন্ন প্রকার আমানত	পরিমাণ	যাকাতের হার	(টাকা কোটি হিসাবে) যাকাতের পরিমাণ
ক	মেয়াদী আমানত	২১,৪৭২.৬	২.৫%	৫৩৬
খ	ডাকঘর, সঞ্চয়ী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ (ক ৮৯-৯০)	২৬৮.৪	২.৫%	৬.৭৮
মোট (ক+খ)		২১.৭৪১.০	২.৫%	৫৪৩.৫

সূত্র ঃ *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি* ১৯৯২,বিবিএস, পৃ. ৪১৪-এ দেখানো বিবরণের ভিত্তিতে রচিত।

টেবিল-৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৪৩.৫ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা যেতে পারে। কৃষিজ ফসল থেকে আদায় করা যায় ১৩৭৩.৭৯ কোটি টাকা। কৃষিজ এবং আর্থিক এ উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে মোট যাকাত আদায় করা যায় ১৯১৭.২৯ কোটি টাকা।[১]

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ যাকাত ও উশ্‌র বাবদ বছরে ২৮,৩৩৭ মিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হতে পারে, যা ১৯৯৮ সালে ৪৭,২১৩ মিলিয়ন টাকায় এবং ২০১০ সালে ১১০,৫১৭ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হতে পারে।[২]

১. বিঃ দ্রঃ এম, জহরুল ইসলাম ঃ আল যাকাত (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), হি: ১৪১৯/খৃ. ১৯৯৯, পৃ. ১০৭-১১২।

২. ড. এস, এম, আলী আক্কাস, Towards Institutionalizing Zakaat private level : the "Parshi" Madel. Thought on Economics. Vol. 10, No. 3 and 4, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

	দায়-দেনা	সর্বমোট দায়-দেনা	যাকতা বহির্ভূত দায়-দেনা	যাকাতযোগ্য
১।	মর্টগেজ	১,০০,০০০/-	-	১,০০,০০০/-
২।	ব্যবসায়ের মালামাল ক্রয় বাবদ দেনা ও অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের বিপরীতে গৃহীত ঋণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	-
৩।	ব্যবসায়ের দেয়	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	-
৪।	কিস্তিতে কেনার জন্য দেনা	২০,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	-
	মোট	৬,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-

ক) যাকাত নিরূপণ

১। যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ = টাঃ ১২,২০,০০০/-

২। যাকাত প্রদেয় দায়-দেনা = টাঃ ৩,০০,০০০/-

মোট যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ = টাঃ ১৪,২০,০০০/-

১। যদি চান্দ্র বছরের হিসাবে যাকাত দেয়া হয় তাহলে ২.৫% হারে যাকাত হবে = টাঃ ৩৫,৫০০/-

২। যদি সৌর বছরের হিসাবে যাকাত দেয়া হয় তাহলে

৩৫,৫০০+১,০৬৫

কারো কারো মতে, উক্ত ৩৫,৫০০/- টাকার সঙ্গে এর আরো ৩% বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ চান্দ্র বছর ৩৫২ দিনে আর সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিনে। এই ১৩ দিনে ৩% বেশী হবে। = ৩৬,৫৬৫,০০ মাত্র

খ) 'উশর/অর্ধ 'উশর নিরূপণ করার নমূনা হিসাব

	ফসলের নাম	মৌসুম	উৎপাদনের পরিমাণ	'উশর যোগ্য	অর্ধ 'উশর যোগ্য	'উশর/অর্ধ 'উশর মুক্ত
১)	ধান	আউশ	২০ মন	-	-	২০ মন
২)	ধান	আমন	২৭ মন	২৭ মন	-	-
৩)	ধান (কৃত্রিম সেচ)	হাঁরি	৫০ মন	-	৫০ মন	-
৪)	মুগ-কলাই	-	৪ মন	-	-	৪ মন
৫)	ছোলা (কৃত্রিম সেচ)	-	৩০ মন	-	৩০ মন	-
৬)	কলা		১০০ মন	১০০ মন	-	-
৭)	গম (প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত)	-	২৩ মন	২৩ মন	-	-
৮)	গম (কৃত্রিম সেচ)	- -	৫০ মন ৭৩ মন	- -	৫০ মন ৫০ মন	- -

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা

মানব জাতির আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত বিধানসমূহের মধ্যে 'যাকাত ব্যবস্থা' অন্যতম। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণের জীবন ব্যবস্থায়ই যাকাতের বিধান ছিল। স্রষ্টার পক্ষ থেকে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও মুসলিম বিশ্বে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় এর সুফল ভোগ করা যাচ্ছে না। যাকাত আদায় ও বণ্টনের কোন স্থায়ী পরিকল্পনা চালু না থাকায় ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বেড়েই চলছে। প্রচলিত নিয়মে যাকাত দাতাগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাকাত হিসাবে অভাবী ও দরিদ্র লোকদের যেভাবে অর্থ-সম্পদ দিচ্ছে তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিছুটা উপকৃত হলেও দারিদ্র্য সমস্যার স্থায়ী ও বাস্তব কোন সমাধান হচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত কাঠামো তৈরী এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো যাকাত গ্রহীতাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। প্রচলিত পদ্ধতিতে দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে এবং তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটছে না।

যাকাতের সম্পদ পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের লক্ষে কতিপয় প্রস্তাব

"আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীন সম্পদ থেকে যাকাতের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক কাজে নিয়োগ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সরকারীভাবে শুধুমাত্র যাকাত আদায়ের প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত নয় বরং যাকাতকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করে সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম তরান্বিত করা দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে "যাকাত জনকল্যাণ ট্রাষ্ট" গঠন করে ইসলামী আইনবিদ সৎ ও চরিত্রবান লোকদেরকে তা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। "যাকাত স্যাভিংস সার্টিফিকেট" প্রবর্তন করে "জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাস্ট্রের" মত বিনিয়োগ করা যেতে পারে এবং লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির 'নমিনী' দের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।"[১]

সমাজের বর্তমান জীবন-মান অনুযায়ী যারা একেবারে চরম দরিদ্র তারা ব্যতিরেকে অন্যদের যাকাত প্রদান করতে হবে দ্রব্যাকারে, অর্থাৎ প্রাপকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাকাত দিতে হবে কাজের উপকরণ ও হাতিয়ার, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি আকারে। যেমন একটি সেলাই মেশিন, একটি টাইপ রাইটার, উন্নত জাতের বীজ, একটি লাঙল, একটি ফসল মাড়াইয়ের মেশিন, রাসায়নিক সার, সেচ সুবিধা, বাড়তি দেয় মুক্ত ঋণ ইত্যাদির মতো ছোট খাটো দ্রব্য সর াম দেয়ার ব্যবস্থা হলে তা বহু সংখ্যক দরিদ্র লোকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে যাকাতের অর্থ থেকে ট্রাক্টর ও ফসল মাড়াই মেশিনের মতো আধুনিক ও তুলনামূলকভাবে দামী সরঞ্জামের সরকারী বহর দরিদ্রদের বিনা মূল্যে ব্যবহারের জন্য গড়ে তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে রাষ্ট্র যাকাতের অর্থায়নে পরিবহন ব্যবস্থা এবং গুদাম ও কোল্ডষ্টোরেজসহ অন্যান্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে। এ ধরনের সাহায্য সরঞ্জাম নির্বাচন করা হবে সংশ্লিষ্ট দেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে।

---

১. এম. এ. মান্নান : ইসলামী অর্থনীতি তত্ব ও প্রয়োগ (ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্স ব্যুরো, ঢাকা), ১৯৮৩, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা - ২

যাকাতের অর্থ থেকে দরিদ্রদের সহায়তার আরো একটি পন্থা হতে পারে– বিনা খরচে দক্ষ চিকিৎসা সেবা, ভর্তুকী মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সুবিধা, পরামর্শ সেবা ইত্যাদি। একটি রাষ্ট্র সব সময়ের জন্যই চাহিদা মোতাবেক বার্ষিক ভিত্তিতে, এমনকি পাঁচ থেকে দশ বছর ভিত্তিতে চাহিদা নিরূপণ করে ব্যয় বিন্যাস করতে পারে। যাকাতের উপযুক্ত পাওনাদারদের মালিকানায় যাকাতের অর্থায়নে উৎপাদনমূলক শিল্প-কারখানা, বিশেষ করে ভোগ্য পণ্য শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। সাধারণ ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী মাঝারী ও ক্ষুদ্র আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল দারিদ্র্য বিমোচনই নয়, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।[১] বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে জাতীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে বিত্তশালী মুসলিম ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না। অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে যতটুকু আদায় করা হয় তাতে দরিদ্র, অভাবী ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দারিদ্র্য বিমোচনের নামে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে দারিদ্র্য বিমোচন তো হচ্ছেই না, বরং দুঃস্থ, অভাবী ও নিঃস্ব লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

প্রস্তাবনা ঃ ৩

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মিলনকেন্দ্র। এ মিলনকেন্দ্রের প্রধান মেজবান হলেন ইমাম সাহেব। বাংলাদেশের গরীব লোকেরা বহু কষ্ট করে প্রায় দুই লক্ষ মসজিদ নির্মাণ করেছে। এগুলোর জন্য তাদের অবদান কম করে হলেও ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে। নামায ছাড়া এই ঘরগুলোতে তেমন কিছু হয় না যদিও কোন কোন মসজিদে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইদানীং ধর্ম মন্ত্রণালয় মসজিদ গুলোর ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবহারের একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা হলো দরিদ্রতা। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে যত লোকের এবং সংস্থা বা সংগঠনের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, এর সবগুলোই গ্রহণ করা উচিত। এককভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন সামাজিক ইন্সটিটিউট বা সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এমনকি বহু বছরের সরকারী প্রচেষ্টাতেও কোন সংগঠন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক মসজিদ বলতে গেলে সরকারী সাহায্য ছাড়াই চলছে। এতে অন্যূন ৫০ হাজার নিয়মিত

১. এফ. আর. ফরিদী: ইসলামী ব্যবস্থায় মূলধন গঠন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সরকারী বাজেট প্রণয়ন, অনূ : সাইফুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানু-জুন-২০০২, পৃ. ৭৯-৮০।

২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : আর্থ-সামাজিক মিলনকেন্দ্র মসজিদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা), খৃ. ২০০৪, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আছেন। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন যখন আছে তখন এগুলোকে জাতি গঠনমূলক কাজে লাগানো আমাদের অবশ্যই উচিত।[২]

ইয়াতীম, মিসকীন ও অভাবীদের অভাব পূরণে ইমাম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যে কোন মহল্লায় ইয়াতীম, বিধবা,নিরাশ্রয় ও ভিক্ষুক থাকতে পারে। এদের পুনর্বাসনের প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়, বরং মহল্লার মুসল্লীদের। মসজিদের মুসল্লীরাই সরকার বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য এনে মহল্লার বিপন্ন নিরাশ্রয়দের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। এজন্য প্রত্যেক মহল্লার মসজিদে থাকবে একটি বায়তুল মাল এবং এ বায়তুল মালের অর্থ সংগ্রহ করা, হিফাজত করা এবং পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার দায়িত্ব থাকবে ইমাম সাহেবের। বিপন্ন, পঙ্গু, ভিক্ষুক, নিরাশ্রয়, ইয়াতীম, বিধবা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময়ে নানা আর্থিক দুর্দশা ও বিপদাপদ ঘটত পারে।[১] সেই ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম সাহেব কমিটির সদস্যদের নিয়ে মসজিদ কেন্দ্রিক যাকাত তহবিল প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

যাদের উপর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে তাদেরকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ যাকাত আদায় ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে ইসলামী যিন্দেগীর অনুসারী হওয়া যায় না এবং ইসলামী আদর্শের সত্যিকার ও প্রকৃত অনুসারী হওয়া যায় না। যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের দ্বারা ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন, ইসলামের পুনর্জাগরণ, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ, মসজিদ ভিত্তিক যিন্দেগী ও মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব সম্পাদিত হতে পারে না।[২] আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন।

«انما يعمر مسجد الله من امن با لله واليوم الا خر واقام الصلوة واتى الز كاة و لم يخش الاالله فعسى او لئك ان يكونوا من المهتدين»

"তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না, তাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।"[৩]

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। দারিদ্র্য এ সমাজের একটি বড় সমস্যা। দারিদ্র্যের প্রকোপে ও প্রভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক জীবন জীবিকার সংকট। আয়-রোজগারের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে তারা দিশেহারা। আমাদের ইমাম সাহেবান ও

১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং (ই ফা বা ,ঢাকা) ,খৃ. ২০০৪, পৃ. ৩৪।

৩. আল-কুরআন, ৯ : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আলেম-উলামার প্রতিনিয়ত আবেদন-নিবেদন এবং বিভিন্ন নসীহত সত্ত্বেও ধর্মবিরুদ্ধ এবং মানবতা বিধ্বংসী কাজে মুসলমানগণ দলে দলে অংশে নিচ্ছেন। কারণ ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের শাশ্বত বাণী কোন কোন সময় নিরর্থক। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, ক্ষুধার্ত এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষের ধর্মবিশ্বাসের (ঈমান) ভিত্ পরিপূর্ণ বা শক্তিশালী রূপ লাভ করতে পারে না।

আজকাল দেশে দরিদ্র পুরুষ, মহিলা, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সমস্যার উপর অবদান রাখার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কোন কমতি নাই। তাতে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বস্তুগত সেবা, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুঁজি সহায়তা, নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমে মসজিদগুলো অত্যন্ত কার্যকর কিছু ভূমিকা রাখতে পারে।

মসজিদ থেকে যেসব কার্যক্রম চালানো যেতে পারে

আমাদের দেশের বর্তমান দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত কর্মসূচিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজের অতি দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নাই। কারণ ঐসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা তাদের নেই। তাদের অনেকেই শারীরিকভাবে অক্ষম, সকল প্রকার সহায়-সম্পদ রহিত, অন্যান্য সাধারণ দরিদ্র সদস্যগণ অতি দরিদ্র হওয়ায় তাদের দলে নিতে রাজী হয় না। আবার অনেকে কর্মবিমুখতার কারণে বা কোন বিশেষ দক্ষতা না থাকার কারণে ভিক্ষাবৃত্তি, ছিচকে চুরি, দেহ বিক্রিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজেও লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে মহল্লার মসজিদ কমিটি অতি দরিদ্র এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে যারা যাকাত, সাদাকা ইত্যাদি গ্রহণের উপযুক্ত তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকা বা একটি মসজিদ সমাজ (Mosque Community) এলাকার সকল মানুষের বিভিন্নমুখী কল্যাণের জন্য ঐ সমাজের সকল সদস্য যৌথভাবে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করতে পারেন।

ক) মসজিদ সমাজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইন-শৃংখলা রক্ষা, বিরোধ নিষ্পত্তি, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিতে পারেন।

খ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বা দরিদ্র মুসলিম পরিবারসমূহের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হতে পারে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন করা যায় :

কর্জে হাসানা তহবিল ঃ কর্মক্ষম ও উদ্যোগী মুসলিম পরিবারকে কর্জে হাসানা দেয়া যেতে পারে। তবে এই কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় এই কর্মসূচি থেকে আহরণ করতে হবে। কমিউনিটির চাঁদার উপর ভিত্তি করে কর্জে হাসানার একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা যায়। ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলার ১১টি মসজিদে সক্ষম মুসল্লীদের চাঁদার এরকম একটি তহবিল গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।

যাকাত ও সাদাকা তহবিল ঃ অতি দরিদ্র, অক্ষম, দুস্থ, বিধবা, ইয়াতীম প্রভৃতি মানুষের জন্য পরিকল্পিতভাবে সাদাকা ও যাকাত তহবিল গঠন করা যেতে পারে। বর্তমানে যাদের উপর যাকাত ফরজ তারা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দমত ব্যক্তি বা পরিবারকে তা দিয়ে থাকেন। ঐ যাকাতের একটি অংশ মসজিদ কমিটিকে দিলে তা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবারকে পুনর্বাসিত ও উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত করা যায়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে ফসল ও পশুর যাকাত আদায়ের উপর বিশেষ তাগিদ দেয়া হলে দ্রুত এ তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব।

মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা ঃ সকাল ও বিকালে মসজিদে বিদ্যালয় পরিচালনা করে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী ও অংক এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মসজিদ ও মক্তবসমূহ ফিডার স্কুল বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। এক সময় ড: আখতার হামিদ খান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় মসিজদের সাথে এ রকমের মক্তব পদ্ধতি চালু করেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বিশেষত নার্সারী স্কুল প্রতিষ্ঠায় মসজিদসমূহ ব্যবহৃত হতে পারে।

মসজিদ ভিত্তিক চিকিৎসা ঃ প্রতি জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে ও পরে বিশেষ চিকিৎসা সেবার আয়োজন করা যেতে পারে। এজন্য মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীদের প্রচেষ্টায় চিকিৎসা তহবিল গঠিত হতে পারে। এলাকার কোন দুঃস্থ রোগীকে অন্যত্র চিকিৎসায় যাকাত ও সাদাকা তহবিলের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনেও মসজিদ সমাজ ভূমিকা পালন করতে পারে। এলাকার প্রয়োজন অনুসারে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু পালনসহ বহু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর এসব কার্যক্রমে সহায়তা দিতে পারে।

ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ ঃ মুসলমানদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুকের সংখ্যা অনেক। মসজিদ সমাজ তাদের নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে পারে। তবে ভিক্ষাবৃত্তির বাইরে শারীরিকভাবে অক্ষম, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাকাত ও সাদাকা তহবিলের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে এ কাজটি করা যায়।

উপরোক্ত কার্যক্রম মসজিদ থেকে খুব সহজে সংগঠিত করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন মসজিদের মুসল্লীগণ এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদের সাথে অন্তত একজন মুয়াজ্জিন, একজন ইমাম, একটি পরিচালনা কমিটি ও কয়েক শত মুসল্লী সম্পৃক্ত। তাই মসজিদ কেন্দ্রিক একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফল হলে মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা এবং নামাযীদের তাকওয়া অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বৃহত্তর সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

মসজিদসমূহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। এখানে শক্তিশালী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নমুখী অসততা ও দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। মসজিদসমূহ এখনও এ অবস্থা থেকে মুক্ত আছে। সঠিক নেতৃত্ব ও কমিউনিটির মধ্যে উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা সম্ভব হলে নামায ও প্রার্থনা কার্যক্রমের পাশাপাশি পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবেই সমাজের গরীব ও দুস্থ মুসলিম সমাজের উন্নয়নে মসজিদসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই ভূমিকা প্রধানত দুইভাবে হতে পারে ঃ

১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র দুরবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে অবদান রাখা যা আমাদের মসজিদসমূহ আবহমান কাল থেকে করে আসছে।

২. ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে কিছু সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, যেমন আর্থিক সহায়তা, সামাজিক সহায়তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহায়তা, দুস্থ সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, এমনকি কর্জদান ইত্যাদি সংগঠিত হতে পারে।

অমিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত

সৎ অভিপ্রায় থাকলে মসজিদ সমাজ ভিত্তিক এ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজ পরিকল্পিতিভাবে শুরু করা যায়। দেশের আড়াই লাখের মত মসজিদে একসাথে কাজ না করা গেলেও সারা দেশে ৫ হাজার মসজিদেও যদি এ কার্যক্রম শুরু করা যায় এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি মসজি ৫০টি মুসল্লী পরিবারকেও সহায়তা করতে পারে তাহলে ২ লাখ ২৫ হাজার পরিবার এ কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ আওতায় আসতে পারে। এককভাবে কোন একটি সংগঠন বা কার্যক্রমের পক্ষে এই কাজ এত সহজে এত দ্রুত করা সম্ভব নয়। আমাদের গ্রামীণ মসজিদসমূহে এ কাজের সম্ভাবনা অনেক বেশী উজ্জল।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা) ষাটের দশকে মরহুম ড. আখতার হামীদ খানের নেতৃত্বে মসজিদ, মক্তব ও ইমামদেরকে উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার করার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবত ইমাম প্রশিক্ষণ ও মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী তাদের নিজস্ব মসজিদ এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কিছু গ্রামীণ মসজিদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে। সেই কর্মসূচি শুরুর পূর্বে পরিচালিত একটি প্রাথমিক জরীপে দেখা গেছে যে, সারা দেশে প্রতি বছর যাকাত, ফিতরা, সাদাকা, কোরবনীর চামড়া, দান-খয়রাত প্রভৃতি খাত মিলিয়ে এক কোটি মুসলিম পরিবার গড়ে ১০০০ (এক হাজার) টাকা খরচ করলেও

Dhaka University Institutional Repository

তার মিলিত পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা। এই পরিমাণটি কোন স্থির সংখ্যা নয়, অনুমানের সুবিধার্থেই শুধু উল্লেখ করা হলো। এই বিপুল অংকের অর্থের বিরাট একটি অংশ স্থানীয় মসজিদের ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে ব্যয় করা সম্ভব। জনগণের দানের উপর ভিত্তি করে সঠিকভাবে সংগঠিত হলে দেশের আড়াইলাখ মসজিদের মাধ্যমে ১০ গুণ লোক কমবেশী যাকাত প্রদান করে থাকে। এই যাকাতকে মসজিদের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করলে শুধুমাত্র এই খাতেই কয়েক হাজার কোটি টাকার তহবিল বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব। একক কোন কেন্দ্র থেকে নয়, দেশের প্রতিটি মসজিদ নিজস্ব উদ্যোগ ও পরিকল্পনা মাফিকই এই জাতীয় কাজ পরিচালনা করতে পারে।

আমাদের জনসমাজ মসজিদের ইমারত নির্মাণে মুক্তহস্তে অর্থব্যয়ে আগ্রহী হলেও মসজিদের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অর্থব্যয়ে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। এ কাজটি শুরু করা গেলে ধর্মীয় অনুভূতির পুনর্জাগরণ, সামাজিক সংহতির উন্নয়ন, সুস্থির একটি সমাজ বিনির্মাণসহ দেশের বৃহত্তম ও প্রধানতম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি মসজিদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষত অতি দরিদ্রদের (Hard Core Poor) জন্য কর্মসূচি গ্রহণে মসজিদসমূহ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ অতি দরিদ্রদের জন্য অফেরতযোগ্য অর্থ এবং সকল প্রকার নৈতিক ও সামাজিক সহায়তা মসজিদের মাধ্যমে যতটুকু করা সম্ভব তা অন্য কোন বাইরের প্রতিষ্ঠান ততটা করতে পারবে না।[১]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা সালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাত দানের কথা বলেছেন। সালাত কায়েম করা মসজিদে, আর এ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ যারা করবেন তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো যাকাত আদায় করা এবং তা যথাযথভাবে বন্টন করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও কল্যাণময় করে সর্বপ্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হলো মসজিদ। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

«اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ»[২]

"মানব জাতীর জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়),তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।"

অতএব সারা দেশে বিস্তৃত মসজিদসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে এবং মসজিদসমূহকে একটি প্রান্তিক ইউনিট হিসাবে গণ্য করে এর মাধ্যমে যাকাত ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সরকারের পক্ষে খুবই কার্যকর পদক্ষেপ হবে।

---

১. ড: তোফায়েল আহমেদ : মসজিদ কেন্দ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম: একটি ধারণাপত্র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা), খৃ. ২০০৪, পৃ. ১০৯-১২২।

২. আল-কুরআন, ৩ ঃ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিত্তশালী লোকদের থেকে প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ যদি সরকারী বা বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে আদায় ও বণ্টন করা যায়, তাহলে খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এদেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে একটি স্থায়ী যাকাত তহবিল গঠন এবং সেই তহবিল থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করতে হলে সরকারকে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। এর জন্য নতুন কোন সংস্থা বা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই আলাদা অফিস ব্যবস্থাপনা। সরকার এক্ষেত্রে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশের সহযোগিতায় মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে এ কর্মসূচী সফল করতে পারেন। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি মসজিদের আওতাধীন যাকাতদাতাগণ স্থানীয় মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করবেন। এলাকা ভিত্তিক পরামর্শের ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হবে। তারা তাদের এলাকার দরিদ্রদের তালিকা তৈরী করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের চাহিদা পূরণে (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ) পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এই কমিটি মাসিক/বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের একটি প্রতিবেদন উপজেলা/জেলা অফিসে প্রেরণ করবেন। এক কথায় তাতে মসজিদ কেন্দ্রিক একটি সুশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণকর সমাজ গড়ে উঠবে। এছাড়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তিতে সেই সমাজ হবে ক্ষুধামুক্ত, সচ্ছল, সুশিক্ষিত, উন্নয়নশীল ও শান্তিপূর্ণ। এর ফলে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল লোকদের মূলধন গঠনসহ তাদের দারিদ্র্যাবস্থা থেকে তারা দ্রুত মুক্তিলাভ করবে এবং উন্নয়শীল অর্থনৈতিক জীবন গঠনে এগিয়ে আসবে।

প্রস্তাবনা ঃ ৪

যাকাতের বণ্টন ব্যবস্থা হবে উৎপাদনমুখী

যাকাত এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে দরিদ্র জনগণের আয় সঞ্চারিত হয়। উৎপাদনের কাঁচামাল, যেমন সেচব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি যাকাত তহবিল থেকে সরবরাহ করা।

টার্গেট গ্রুপ তৈরী করা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেকার ও দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংগৃহীত যাকাতের অর্থ দিয়ে গঠিত তহবিল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকার নিচের কর্মকৌশল অনুসরণ করতে পারে। শুরুতে বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে প্রতিটি এলাকায় ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে টার্গেট গ্রুপ তৈরী করা যায়। প্রতিটি গ্রুপে ১৮-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০ জন লোক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক প্রবণতা, শিক্ষার মান, সামাজিক পটভূমি ও উদ্যোগ, উদ্যম ও সততার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে একটা সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ বা দল অপেক্ষা সমজাতীয় মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে গঠিত দল সাফল্য অর্জনের জন্য অধিকতর উপযোগী। এসব গ্রুপে একজন নেতা, একাধিক উপনেতা ও একজন সম্পাদক থাকবে। প্রয়োজনীয় প্রেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই ধরনের দল নিয়মিত পাক্ষিক সভায় মিলিত হবে এবং তাদের কার্যক্রম যথারীতি মনিটর করা হবে। দলের প্রত্যেকে পরস্পরের জন্য গ্যারান্টি দিবে। এসব টার্গেট গ্রুপকে কোন রকম সার্ভিস চার্জ ছাড়াই উৎপাদনমুখী বা অভোগ্য ঋণ সরবরাহ করা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ভোগ্য ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কৃষকরা ফসল বা কৃষিপণ্য ওঠার পরপরই এই ঋণ শোধ করে দেবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে বর্ধিত সময় মনজুর করা যেতে পারে। এরপরও যদি তারা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে যাকাতের অর্থ থেকে এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা অর্থ থেকেই তা মওকুফ করে দেয়া হবে। এ ধরনের কৃষি ভিত্তিক গ্রুপকে বিনামূল্যে অথবা যথেষ্ট ভর্তুকী দিয়ে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক সামগ্রী ও সেচ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এমনকি তাদেরকে গুদামঘর, হিমাগার, পরিবহন ও বিপণনের সুবিধাও বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে দেয়া উচিত। এর ফলে তারা ভিক্ষুক হওয়ার পরিবর্তে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে।

অ-কৃষি শ্রেণীর লোকদের জন্যও টার্গেট গ্রুপ তৈরী করা জরুরী। এ ধরনের গ্রুপ বা দলকে তাদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান ও মানসিক গঠন অনুযায়ী উপযুক্ত পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে এ ধরনের গ্রুপকে তাতের কাজ, দর্জির কাজ, ছুতার মিস্ত্রি, কামার, সাইকেল ও রিক্সা মেরামত, পাওয়ার পাম্প সারা, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি ও মাছের চাষ প্রভৃতি কর্মসংস্থানমুখী ও উৎপাদনধর্মী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

যুবকদের প্রশিক্ষণ বিশেষত গ্রামীণ শিক্ষিত বেকার যুবকদের নানা ধরনের পেশা বা বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনর সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে এ তহবিল থেকেই। পরিণামে তারা গ্রামাঞ্চল ছাড়া শহরেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু শহর ও মহানগরীতে তো বটেই, ইউনিয়ন ও থানা সদরেও ক্রমেই নানা পেশার লোকের চাহিদা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজমিস্ত্রি, ছুতার মিস্ত্রি, দর্জি, ওয়েলডার, কনফেকশনার, বুক বাইন্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, লেদ অপারেটর, রেডিও-টেলিভিশন মেকানিক, মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল মেকানিক, উলের কাজ ও এমব্রয়ডারী, টাইপিষ্ট, মোটর গাড়ী ও ট্রাক ড্রাইভার, ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য দক্ষ ও কুশলী শ্রমিক এবং একেবারে সাম্প্রতিক কালে প্যারামেডিক এবং ফটোকপিয়ার/ফটোষ্ট্যাট ও কম্পিউটার অপারেটর। বিশেষ করে শেষোক্ত যন্ত্রটির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা বলা যায় অফুরন্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ ভিত্তিতে এসমস্ত পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্যও যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য গৃহীতব্য এসব প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীর যা পরিণামে আয় বর্ধক ও কর্মসংস্থানমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের পুরোটাই যেমন বহন করতে হবে তেমনি প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাকাত বা এ ধরনের অর্থ দিয়ে তৈরী তহবিল থেকেই। প্রশিক্ষণশেষে 'আয় থেকে দায় শোধ' নীতির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণও সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অন্যথা তারা যে বেকার ছিল সেই বেকারই রয়ে যাবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা নিয়ে এ কর্মসূচী গ্রহণ করলে বিপুল সংখ্যক বেকার ও আধা বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের যেমন উপায় হবে তেমনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ পাওয়ার ফলে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রায় সকল মুসলিম দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিতই দেখা যাচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শত শত পরিবার যারা গতকালও ছিল সম্পদশালী গৃহস্থ তারা রাতারাতি গৃহহীন কপর্দকহীন সহায়-সম্বলহীন পথের মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত ও সময়োচিত মনোযোগ ও সহযোগিতার অভাবে এরা শামিল হয়ে যায় ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরের দলে। এমনকি ভিক্ষুকের কাতারে দাঁড়ানোও অসম্ভব নয়। কেবলমাত্র কার্যকর ও পরিকল্পিত পুনর্বাসন কর্মসূচীই পারে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষগুলিকে পুনরায় তাদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করতে। এজন্য যাকাতের অর্থ অবশ্যই ব্যয় করা যায়।[১]

প্রস্তাবনা ঃ ৫

যাকাত কোষাগারের জন্য একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং একটি বার্ষিক পরিকল্পনা বাজেট প্রণয়ন

যাকাত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ প্রাপ্তি ও খরচের জন্য একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। সরকারী কোষাগারের (বায়তুল মাল) অবর্তমানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে যাকাত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ইসলামী আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অথবা যাকাত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বিশ্ব ইসলামী সংস্থা অথবা একটি বিশ্ব ইসলামী যাকাত সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান কালের প্রয়োজনের আলোকে অনুরূপ সংগঠনের ব্যাপারে একটি বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ প্রণয়নের দরকার রয়েছে। এ হিসাব-নাকাশের মধ্য দিয়ে যাকাতকে সঠিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি পদ্ধতিতে ফেলা যাবে।

৩য় সংস্করণ, খৃ. ২০০১, পৃ. ২০৭-২০৯।

১. শাওকী ইসমাঈল শাতাদাহ ঃ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে যাকাত তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমা

Dhaka University Institutional Repository

ইসালামী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে যাকাত তহবিলসমূহ থেকে কিভাবে অর্থ যোগানো যাবে, সে ব্যাপারে একটি খসড়াচিত্র দেয়া হলো।

গরীব ও দুঃস্থদের জন্য খরচের প্রবাহ

এই শ্রেণীর আওতায় যাকাত তহবিল গরীব সন্তানদের ইসলামী শিক্ষাদান কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। প্রতি বছর প্রত্যেক শহরে অন্ততপক্ষে একটি করে প্রাথমিক মানের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক বেলার আহার নিখরচায় প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আরবী ভাষাকে স্কুল পর্যায়ে মৌলিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাদান। আল-কুরআন শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও সেগুলো পরিচালনা করা।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও যাকাত প্রাপ্তদের পুনর্বাসন

কারিগর ও বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে তারা সংশ্লিষ্ট উৎপাদন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। কারিগরদের নিকট প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ।

প্রতিবন্দীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণসহ কিছু কিছু প্রতিবন্দীকে উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

যারা গৃহের মধ্যেই অর্থনৈতিক তৎপরতা চালাতে সক্ষম, এমনসব পরিবারকে প্রয়োজনীয় সারঞ্জাম সরবরাহ।

পোশাক সেলাই কাজ ও তাঁত বুননের জন্য এবং রেডিমেড কাপড়-চোপড় তৈরীর জন্য ওয়ার্কশপ ও ফ্যাক্টরী স্থাপন।

মেয়ে ও বিধবা মহিলাদের জন্য ওয়ার্কশপ ও কারখানা স্থাপন, যাতে তারা সেখানে বুনন কাজ ও পশমী পোশাক-আশাক তৈরী করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সাধারণ কুটির শিল্প স্থাপন

হস্ত চালিত তাঁতের সাহায্যে কম্বল ও কার্পেট উৎপাদন, চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী, অন্যান্য সাধারণ সামগ্রী তৈরী, কাঠের তৈরী জিনিসপত্র ইত্যাদি।

সাধারণ ধরনের কৃষি ভিত্তিক ও কুটির শিল্প স্থাপন

হাঁস-মুরগী ও খরগোশের বাচ্চা উৎপাদন, মৌমাছির চাষ, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প স্থাপন।

* ক্ষুদ্র আকারের সেবাধর্মী ও ট্রেড প্রকল্পে নির্দিষ্ট স্থিরিকৃত সম্পদের ব্যবস্থা করা। যেমন টিনজাত বা জমাট খাদ্য বিক্রির জন্য আইস-বক্স ইত্যাদি।

কিছু উৎপাদন সুবিধা প্রদান

কাঁচামাল। যাকাত গ্রহীতা ব্যক্তিবর্গ বা পরিবার কর্তৃক তৈরীকৃত আধা প্রস্তুত সামগ্রী।

* যাকাত পাওয়ার যোগ্য কারিগরকে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প খরচে গৃহায়ন

সর্বনিম্ন খরচে স্বল্প মূল্যের ব্লক ভবন নির্মাণ। ভাড়ার ভিত্তিতে ফ্ল্যাটের অধিকার প্রদান। স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ গৃহায়নের উদ্দেশ্যে কল্যাণমুখী দান-খয়রাতকে (ওয়াক্‌ফ) উৎসাহ প্রদান।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা

গরীব জনগণকে বিনা খরচে অথবা নামমাত্র ফির বিনিময়ে সকল বিশেষজ্ঞ সুবিধাসহ চিকিৎসা প্রদানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ডিস্পেনসারী স্থাপন। এসব ডিস্পেনসারীতে স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার কিংবা নামমাত্র ফি গ্রহণকারী ডাক্তার নিয়োগ করা উচিত। যাকাত পাওয়ার যোগ্য কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ আংশিকভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠানকে নির্বাহ করা উচিত। এজন্য কতিপয় হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট নাম-ফলকসহ কিছু সংখ্যক শয্যা সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে যাকাত তহবিল থেকে অর্থ খরচের পন্থা

যারা সম্পূর্ণরূপ অক্ষম, কাজ করতে অসমর্থ অথবা নিজের জীবিকা অর্জনে, উপার্জন বৃদ্ধি করতে অক্ষম, তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান। হালকা ধরনের নির্দিষ্ট সম্পদ, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের আকারে সম্পদ প্রদান। অংশীদারিত্ব যা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত শ্রেণীর লোকদের কল্যাণে স্বত্বাধিকার এনে দেয়। এ উদ্যোগে যাকাত ফাউন্ডেশন অর্থ যোগান দিবে। বিশেষ একটি কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট আইনসম্মত মুদারাবাহ প্রকল্পে অংশগ্রহণ, যেখানে যাকাত ফাউন্ডেশন মূলধনের স্বত্বাধিকারী ও যাকাতগ্রহীরা কর্মী হিসাবে কাজ করবে। মুদারাবা কর্মীরা তাদের কাজের জন্য উক্ত প্রকল্পের অংশীদার হিসাবে গণ্য হবে। কাজ শুরু হওয়ার আগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যে লভ্যাংশ ভাগাভাগি হবে।

নামমাত্র ফি কিংবা ভাড়ার বিনিময়ে গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে হাল্কা ধরনের স্থিরকৃত সম্পদ ও উৎপাদন সামগ্রী ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা।

কর্জে হাসানা (মুনাফাবিহীন ঋণ)

কোন কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে দৈব-দুর্বিপাক, জরুরী অবস্থা, অসুখ-বিসুখ ও ব্যয়বহুল সার্জারির ক্ষেত্রে যাকাতগ্রাহী ব্যক্তিদের কর্জে হাসানা দেয়া উচিত। যারা ঋণগ্রস্ত এবং শরী'আ অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে কর্জে হাসানা দেয়া উচিত।

সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক ও কোম্পানীসমূহের বেলায় যাকাত তহবিল থেকে মৌল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহে অর্থ যোগানের বিভিন্ন প্রণালী চিহ্নিত করা সম্ভব। এসব প্রণালী বা নিয়মের মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কল্যাণমুখী বিনিয়োগ একাউন্ট খোলা, যাকাতগ্রাহীদের পক্ষ থেকে স্বল্প খরচের গৃহনির্মাণে অর্থ যোগানো এবং পাঁচসালা জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত পরিকল্পনার আওতায় কারুকাজ, সাধারণ ধরনের কুটির শিল্প, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান।[১]

প্রস্তাবনা ঃ ৬

একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, দেশের গরীব, অসহায়, নিঃস্ব, অন্ধ, শিশু, বৃদ্ধ , বিধবা, পংগু, আতুর, বিপদগ্রস্ত পথিক এবং প্রয়োজন পমিরাণ অর্থোপার্জনে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাকাতের অর্থ বিতরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এ ধরনের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এদেরকে অনায়াসে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীতে তাদেরকে গণ্য করা যায় যরা বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কষ্টে কোন রকম মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। যাকাতের মোট অর্থের অর্ধেক তাদের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে ব্যয় করা যায় এবং তাদের জন্য গঠিত পারস্পরিক সাহায্য সংস্থায় তাদেরই নামে এই অর্থ নির্দিষ্ট হারে জমা করা যায়, যেন এর সুফল তারাই ভোগ করতে পারে। গরীবদের বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, আইনী সহায়তাসহ আদালতী বিচার লাভের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। সাধারণ গরীব জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট অসংখ্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এ ফান্ডের দ্বারা সম্ভব। বলা বাহুল্য, যাকাত আদায়ের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত হবে, তাদের বেতনও এ অর্থ থেকেই দেয়া হবে। অবশিষ্ট অর্থ দু'ভাগে ভাগ করা হবে, যা নিম্নরূপ ঃ

(১) গরীবদের জন্য স্থায়ীভাবে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং

(২) ব্যক্তিগতভাবে তাদের নগদ অর্থ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে দেয়ার খাতে ব্যয় করা হবে।

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা

গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার উপায় হচ্ছে, তাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কৃষি জমি ক্রয় করে দেয়া ও কারখানা স্থাপন করা। এ কারখানায় কেবল দরিদ্ররাই শ্রমিক ও পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হবে এবং তারাই হবে এর মালিক ও স্বত্বাধিকারী। অনেক দরিদ্র আবার ব্যবসায়ের প্রয়োজন পরিমাণ পুঁজি হিসাবেও অর্থ পেতে পারে।

নির্ধারণ (অনূ : কাজী হাফিজুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা), তৃতীয় বর্ষ, খৃ.১৯৯৬, পৃ. ১০৮-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

জমি ক্রয়ের মূল্য

কৃষি ও কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে যারা ভূমিহীন কিংবা প্রয়োজন পরিমাণ ভূমি যাদের নেই, তাদেরকে জমি ক্রয় করে দেয়ার জন্য প্রতি বছর মোট যাকাতের একটি অংশ (যেমন ১০০ কোটি টাকা) যদি ভিন্ন করে বরাদ্দ করা যায় তবে তা দিয়ে অনায়াসেই কমবেশী ৬ একরবিশিষ্ট ৫০ হাজার খণ্ড জমি ক্রয় করে দিয়ে অন্তত ৫০ হাজার পরিবারকে দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

কারখানা স্থাপন

যাকাত ফান্ডের আর একটি অংশ থেকে (১০০ কোটি টাকা) শুধু কারখানা স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এ কারখানায় দরিদ্র, অভাবক্লিষ্ট ও শ্রমজীবী লোকেরাই 'কর্মচারী' হিসাবে নিযুক্ত হবে। আর সমবেতভাবে তারাই হবে এগুলোর স্বত্বাধিকারী। কারখানা স্থাপন ও সাফল্যের পর্যায়ে এগুলো পৌছিয়ে দেয়া পর্যন্তই হবে রাষ্ট্রের কর্তব্য। উন্নত ধরনের মধ্যম শ্রেণীর কারখানা স্থাপন করলে গড়ে কারখানা প্রতি ১০ কোটি হিসাবে মূলধন দ্বারা অন্তত দশটি উল্লেখযোগ্য কারখানা প্রতি বছর স্থাপন করা যেতে পারে এবং অসংখ্য লোকের বেকার সমস্যার সমাধানই শুধু নয়, এভাবে প্রতি বছর ৫০/৬০ হাজার লোকের ভরণ-পোষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাও হতে পারে।

ব্যবসায়ে পুঁজি সরবরাহ

প্রতি বছর উপার্জনহীন লোকদেরকে ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করে দেয়া বাবদ অন্তত ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ টাকাকে বিশ হাজার অংশে ভাগ করে ততটি পরিবারকে দান করলে শুধু ব্যবসায়ের মাধ্যমেই প্রতি বছর অন্তত দেড়/দুই লক্ষ লোকের জীবীকার ব্যবস্থা হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে দান

উপরোল্লিখিত খাতসমূহে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার পর এ ফান্ডের যত টাকাই উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সরাসরি উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে নগদ দান হিসাবে তুলে দেয়া যেতে পারে। এ দান এককালীনও হতে পারে, কিংবা মাসিক 'বৃত্তি' হিসাবেও বন্টন করা যেতে পারে। এ টাকার একটা প্রধান অংশকে নিম্নলিখিতরূপে পাঁচটি ভাগ করে দিলে এবং কাউকে আংশিক আর কাউকে পূর্ণ প্রয়োজন মিটাবার জন্য অধিক পরিমাণ দেয়া হলে অন্তত ১৮ কোটি টাকা এরূপ খরচ করা যেতে পারে ঃ

(ক) ১০ কোটি টাকা– পরিবার প্রতি বাৎসরিক ১০০০ টাকা হিসাবে ১ লক্ষ পরিবারকে।

(খ) ৪ কোটি টাকা– পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা মাসিক হিসাবে ৮০ হাজার পরিবারকে

(গ) ২ কোটি টাকা– পরিবার প্রতি ২৫০ টাকা হিসাবে ৮০ হাজার পরিবারকে।

(ঘ) ২ কোটি টাকা– পরিবার প্রতি ১০০ টাকা হিসাবে ২ লক্ষ পরিবারকে।

এক কথায় প্রত্যক্ষ বন্টনের ফলেও প্রতি বছর ৬ লক্ষ ২০ হাজার পরিবার কিংবা ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার (পরিবার প্রতি ৪ জন হিসাবে) ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব। আর

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত হিসাবকেও এর সাথে যোগ করলে প্রতি বছর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিকের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা যায়।

এমতাবস্থায় একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যাকাত আদায় এবং তার সুষ্ঠু বণ্টনের কাজ শুরু করলে এ সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ১ কোটি ৫০ লক্ষ নাগরিককে আর্থিক অনটন ও অসচ্ছলতা থেকে উদ্ধার করে সুখে জীবন-যাপনের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেয়া যায়।[১]

প্রস্তাবনা ঃ ৭

গ্রামীণ বিত্তহীন– ভূমিহীনদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী

দেশের উন্নয়ন বলতে সাধারণত নগরের উন্নয়নই বোঝায়। পল্লী এলাকার উন্নয়ন সব সময়ই অবহেলিত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের উন্নয়নের নামে যা হয়েছে, তাহলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন রাস্তা, পুল ইত্যাদি নির্মাণ। পল্লীর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে সমন্বিত প্রয়াস কখনো নেয়া হয়নি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য আর পরনির্ভরতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। মাঝে মাঝে যে ছিটেফোটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পল্লী এলাকায় ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিত্তহীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি না করায় দিন দিন মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের মূল কারণ হলো জনগণের সম্পদের অভাব। প্রয়োজন ছিল অধিক হারে পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগ এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা। কিন্তু পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের অংশ হিসাবে পল্লীর জনগোষ্ঠীর হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা হয়নি। আর তার ফলেই দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের এ দুষ্ট চক্রের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। এ চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই ঋণ হিসাবে সম্পদ সরবরাহ করা প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এটাই অর্থনৈতিক যুক্তিপূর্ণ উপায়।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে যাকাত ফান্ডকে কার্যকরী করা যায়। সরকারী ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমেও স্থানীয় পরিকল্পনার আলোকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি উপজেলায় ১০০ জন যাকাতদাতা ২০ লাখ টাকা যাকাত স্থানীয় একটি সংস্থায় জমা রাখলো। উক্ত সংস্থা ঐ উপজেলায় যাকাত পেতে পারে এমন ১০০ জন লোকের তালিকা তৈরী করল। সংস্থা চিন্তা করল উক্ত, ১০০ জনের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা চাহিদা পূরণ করা তাদের দায়িত্ব। উক্ত লোকদের শ্রেণীবিন্যাস

১. পৃ. ২৯৯-৩০২- এর আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

করে ৩ সালা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হলো। এতে ২৫ জন দুঃস্থ, অসহায় ও বিধবা মহিলাকে সেলাই মেশিন (২৫ X ৭০০০ = ১,৭৫,০০), ২০ জন অক্ষম ব্যক্তিকে পানের দোকান/বাক্স (২০ X ৫০০০ = ১,০০০০০) ক্রয় করে দিল। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য আরও ২জন লোককে বেতন সহকারে চাকুরী দেয়া হলো। উপজেলা দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য ৫টি অঞ্চলে ৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হলো (৫ X ৫০,০০০ = ২,৫০,০০০), শিক্ষার সুবিধার জন্য ১০টি এলাকায় ১০টি বয়স্ক/অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হলো (১০ X ২০,০০০ = ২,০০০০০), জ্ঞানার্জনের জন্য ১০টি কেন্দ্রে ১০টি পাঠাগার স্থাপন করা হলো (১০ X ২০,০০০ = ২,০০০০০)। অবশিষ্ট অর্থ ঋণগ্রস্ত, পথিক-প্রবাসী ও ইয়াতীমদের প্রতিপালনে ব্যয় করা হলো। এভাবে প্রতি বছর ৯০/১০০ জন লোক স্বাবলম্বী করতে পারলে ৩ বছরে ৩০০ জন লোককে আর যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা ও ইসলামী দর্শনের দিক থেকে এই উপজেলা ৪র্থ বছরে আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।[১]

দারিদ্র্য বিমোচনে যেসব দেশ সফলতা লাভ করেছে, যেমন সাম্প্রতিক কালে মালয়েশিয়া, তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হলে একই সাথে দ্বিমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করতে দেখা যায় ঃ

(১) বৃদ্ধিকে এমনভাবে উৎসাহিত যাতে করে অধিক হারে এবং অধিক কর্মদক্ষতার সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করা যায়;

(২) অধিকহারে মানব সম্পদ উন্নয়নে অর্থব্যয়।

প্রথম কর্মকৌশলের কারণে দরিদ্র জনগণ তাদের সবচেয়ে সহজলভ্য সম্পদ শ্রমকে ব্যবহার করতে পারে এবং দ্বিতীয় কর্মকৌশল তাদের আশু কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং সাথে সাথে যোগ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ীভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, দেশে এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দরকার যার মাধ্যমে ইনসাফের ভিত্তিকে সুষম প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। যেমন অধিক হারে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, দরিদ্রদের জন্য সুবিধাজনক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের সঠিক নিয়মনীতি ইত্যাদি। সাথে সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান এবং দরিদ্র জনগণের নিকট সম্পদ সরবরাহ, যেমন ঋণ এবং জমি, গ্রামীণ অবকাঠামো, যেমন ব্যাংক, বাজার, সেচসুবিধা ইত্যাদিতে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। পরিশেষে বলা যায়, সত্যিকার অর্থে স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পল্লী উন্নয়নকে উৎসাহদান ও অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

১. এ.জ.এম. বদরুদ্দুজা : যাকাতের ব্যবহারিক বিধান (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), ২য় সংস্করণ, খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৪২-৪৩ -এর আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী এলাকার বিত্তহীন-ভূমিহীনদের যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অর্থসংস্থান করা যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ[১]

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ম্যান্যুফাকচারিং

বাঁশের কাজ

বেতের কাজ

মৃৎশিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরীকরণ

মুড়ি প্রস্তুতকরণ

হালকা খাবার প্রস্তুতকরণ

পোশাক তৈরীকরণ

আঁখ মাড়াই

রিক্সা তৈরী ও মেরামত

শরবত তৈরীকরণ

ঝাড়ু তৈরকরণ

মিষ্টি তৈরীকরণ

আসবাবপত্র তৈরীকরণ

ছাতা তেরীকরণ

ঘড়ি মেরামতকরণ

ধান ভাঙ্গা

ডাল ভাঙ্গা

সাইকেল মেরামতকরণ

কসাইখানা

হাতপাখা তৈরীকরণ

রেডিও মেরামত করণ

লেপ/তোষক তৈরীকরণ

কাঠ চেরাইকরণ

সরিষার তৈল প্রস্তুতকরণ

---

১. দেওয়ান আলী হায়দার আলমগীর : দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা (জিগাতলা, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৩, পৃ. ১৫৫-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চুন প্রস্তুতকরণ

পাটি তৈরীকরণ

নৌকা তৈরী ও মেরামত

চিড়া প্রস্তুতকরণ

তাঁতের কাজ

কামারের কাজ

জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ

মসলা তৈরীকরণ

মাছ ধরার জাল তৈরীকরণ

পাটের ব্যাগ তৈরকরণ

তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ

বাদাম ভাজা

বই বাঁধাইকরণ

গুড় প্রস্তুতকরণ

ঘি প্রস্তুত করণ

চানাচুর প্রস্তুতকরণ

পাটজাত দ্রব্যাদি

জুতা তৈরীকরণ

স্বর্ণের কাজ

রাজ মিস্ত্রীর কাজ

সুতা রংকরণ

সুপারী প্রক্রিয়াজাতকরণ

চশমার কাঁচ তৈরী ও মেরামতকরণ

বাঁশের চাটাই তৈরীকরণ

সস্তা গহনা তৈরীকরণ

পানের খয়ের প্রস্তুতকরণ

পিঠা প্রস্তুতকরণ

প্লাষ্টিকের কাজ

Dhaka University Institutional Repository

সুতার কাজ

ঝালাইয়ের কাজ

কাপড়ে ফুল তোলা

ঘর মেরামতকরণ

ঝুড়ি তৈরীকরণ

তেলের ঘানি তৈরীকরণ

টুপী তৈরীকরণ

হোগলা তৈরীকরণ

ইটের কাজ

কৃষি ও বন

শাক-সব্জির চাষাবাদ

তরমুজের চাষাবাদ

পানের চাষাবাদ

ধানের চাষাবাদ

রবিশস্যের চাষাবাদ

জমি তৈরীকরণ

কলার চাষাবাদ

সেচের জন্য কূপ খনন

আনারসের চাষাবাদ

আলুর চাষ

আখের চাষাবাদ

সেচের জন্য হস্তচালিত পাম্প

জমি ইজারা

কাঁঠালের বাগান

পেয়ারার বাগান

Dhaka University Institutional Repository

পশু পালন ও মৎস চাষ

গাভী পালন

বলদ পালন

গরু মোটা তাজা করণ

ছাগল পালন

হাঁস-মুরগী পালন

মাছ, শুটকি করণ

ভেড়া পালন

মাছ ধরার জন্য নৌকা তৈরী

কবুতর পালন

মাছের চাষ

সেবাসমূহ

রিক্সা চালনা

সেলুন

সেচযন্ত্র ভাড়া করণ

সংবাদপত্র বিতরণ

ঠেলাগাড়ী চালনা

গরুর গাড়ী চালনা

নদী পারাপারের খেয়া নৌকা চালনা

লন্ড্রী

মহিষের গাড়ী চালনা

যাতায়াতের জন্য নৌকা

সেলাই মেশিন ক্রয়

ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র

কাঠমিস্ত্রি

ভ্যানগাড়ী চালনা

দড়ি তৈরী করার যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা

চাল/ধানের ব্যবসা

ডালের ব্যবসা

লবনের ব্যবসা

শাক-সবজির ব্যবসা

গুড়ের ব্যবসা

জ্বালানী কাঠের ব্যবসা

কাঠের মিস্ত্রীর কার্যোপযোগী কাঠের ব্যবসা

মুরগীর ব্যবসা

মাছের ব্যবসা

শুটকি মাছের ব্যবসা

গরুর ব্যবসা

শস্য বীজের ব্যবসা

কলার ব্যবসা

খড়ের ব্যবসা

পেয়াজের ব্যবসা

সুপারীর ব্যবসা

পানের ব্যবসা

মৌসুমী ফলের ব্যবসা

কাপড়ের ব্যবসা

দুধের ব্যবসা

বাঁশের ব্যবসা

সারের ব্যবসা

চায়ের ব্যবসা

আলুর ব্যবসা

মশলার ব্যবসা

ময়দার ব্যবসা

ষ্টেশনারী দ্রব্যাদির ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

লুঙ্গির ব্যবসা

সরিষা তৈলের ব্যবসা

শাড়ীর ব্যবসা

আদার ব্যবসা

পাটের ব্যবসা

পাটি বানানোর বেতের ব্যবসা

সরিষা বীজের ব্যবসা

ডিমের ব্যবসা

গামছার ব্যবসা

খৈলের ব্যবসা

চামড়ার ব্যবসা

পাটের ব্যাগের ব্যবসা

বাঁশের ঝুড়ির ব্যবসা

বাদামের ব্যবসা

পুরানো কাপড়ের ব্যবসা

বিস্কুটের ব্যবসা

চটের ব্যবসা

বইয়ের ব্যবসা

হলুদের ব্যবসা

বাঁশের তৈরী দ্রব্যাদির ব্যবসা

চটি জুতা ও জুতার ব্যবসা

মিষ্টান্নের ব্যবসা

কেরোসিনের তৈলের ব্যবসা

চুড়ির ব্যবসা

মুড়ি ও চিড়ার ব্যবসা

মৌসুমী কৃষিজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা

মৃৎশিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা

তৈজষপত্রের ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

মুদিখানার দ্রব্যাদির ব্যবসা

লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা

ভাজা বাদামের ব্যবসা

চানাচুরের ব্যবসা

কয়লার ব্যবসা

সাইকেলের যন্ত্রাংশের ব্যবসা

গুড়া চালের ব্যবসা

দধি/ছানার ব্যবসা

মাছ ধরাজালের ব্যবসা

খাবারের দোকানের ব্যবসা

রূপার তৈরী দ্রব্যাদির ব্যবসা

কাঁচের ব্যবসা

ভূসির ব্যবসা

আটার ব্যবসা

ফেরিকরণ

বাঁশের ঝুড়ি ফেরিকরণ

শুটকি মাছ ফেরিকরণ

পুরানো কাপড় ফেরিকরণ

তামাক ও পান ফেরিকরণ

মুদি দ্রব্যাদি ফেরিকরণ

ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ফেরিকরণ

শাড়ী ফেরিকরণ

চুড়ি ফেরিকরণ

শাক-সব্জি ফেরিকরণ

মিষ্টান্ন ফেরিকরণ

বাদাম ফেরিকরণ

তৈল ফেরিকরণ

Dhaka University Institutional Repository

দোকানদারী

মুদি দোকান

স্টেশনারী দোকান

ঔষধের দোকান

চায়ের দোকান

লোহা-লক্কড়ের দোকান

পানের দোকন

পত্র-পত্রিকার দোকান

কাপড়ের দোকান

জুতার দোকান

মিষ্টান্নের দোকান

ফলের দোকান

সাইকেলের যন্ত্রাংশের দোকান।[১]

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

বাংলাদেশে যাকাতের ব্যবহার

বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও পরিকল্পিত বণ্টনের বলিষ্ঠ ও কার্যকর কোন কর্মসূচী নাই, যদিও দারিদ্র্য বিমোচন ও বিত্তহীন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যাকাতের সুষ্ঠু আদায় ও পরিকল্পিত ব্যবহার অপরিহার্য। এদেশের অধিকাংশ সম্পদশালী ব্যক্তি যাকাত দিয়ে থাকেন সুনির্দিষ্ট হিসাব ছাড়া এবং সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। সাধারণত দেখা যায়, যাকাত দাতাগণ বছরের একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ করে রমযান মাসে যাকাতের অর্থ থেকে গরীব জনসাধারণের মধ্যে শাড়ী-লুঙ্গি বিতরণ, লিল্লাহ বোর্ডিং ও ইয়াতীমখানায় কিছু নগদ অর্থ প্রদান এবং নিজস্ব গ্রাম এলাকার কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে সামান্য পরিমাণে নগদ অর্থ দিয়ে থাকেন। এতে যাকাতের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এর জন্য একমাত্র পন্থা হলো, জাতীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তা যথাযথভাবে বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি সাধন করা।

বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ে নামমাত্র একটি কর্মসূচী রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচালনায় "যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ" নামে ১৯৮২ সালের ৫ জুন এই বোর্ড গঠন করা হয়। খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে এর পরিচালনায়। এটাই এদেশে যাকাত আদায় ও বণ্টনের একমাত্র সরকারী উদ্যোগ। সরকারী যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গঠিত এই সংস্থা ১৯৮২ সালের ৫নং অধ্যাদেশ বলে পরিচিত। এই অধ্যাদেশের ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে–[১] "জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত যাকাত বাবদ অর্থ দিয়ে এ ফান্ড পরিচালিত হবে।" অথচ যাকাত দেয়া স্বেচ্ছামূলক নয়। ইসলামী শরী'আতে ইহা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর যাকাতের অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের জুন ২০০১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন[২] নিম্নরূপ ঃ

---

১. ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে– "There shall be established a fund to be called the Zakat fund which shall consist of voluntary payment of Zakat by Muslims". বি. দ্র. যাকাত ফান্ড পরিচিতি, যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খৃ.।

২. আয়-ব্যয় প্রতিবেদনটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সংগ্রহীত।

যাকাত বোর্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর যাকাতের অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জুন ২০০১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন :*

অর্থ বছর	যাকাত প্রাপ্তি	যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল		সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প		বৃত্তি প্রদান		এবতেদায়ী মদ্রাসা (আদর্শ মক্তব)		দুঃস্থ বিধবা পুনর্বাসন		ডিক্সা/ভ্যাগাড়ী প্রদান		এতিম/দুঃস্থদের সাহায্য কার্যক্রম		সেলাই মেশিন বিতরণ		ব্যাংকচার্জ	মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িতটাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা	ব্যয়িত টাকা	সংখ্যা		
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯৮২-৮৩	১৫,১২,০৩৭.০০																		
১৯৮৩-৮৪	৪,৫২,৬৫৪.৯৫																		
১৯৮৪-৮৫	৯,৪২,৩২০.৯০	১,৩২,০০০/-	১৯,৬৪৬	৪,৭৩,০০০/-	৩৪৬			৯৬,৪০০/-	৯২					২,০০,০০০/-					৯,০১,৪০০/-
১৯৮৫-৮৬	৮,৬৬,৯০৮.১৮	১,৫০,০০০/-	১৯,২৩৪	৪,১২,০০০/-	২৫৩			৫৫,৯৫০/-	১৪৯										৬,১৭,৯৫০/-
১৯৮৬-৮৭	১৫,৯৩,৫৫৮.৪৪	২,০০,০০০/-	৩৫,৪৬৮	৪,০০,০০০/-	২৪৪			৯০,৩০০/-	১৪৭										৭,৫২,৩০০/-
১৯৮৭-৮৮	১৩,৪৮,৩৯১.৪৩	২,০০,০০০/-	৩৫,৪৬৮	৩,১৮,০০০/-	৩৩৫			৯০,৩০০/-	১৭২										৬,০৮,৩০০/-
১৯৮৮-৮৯	৬,৯২,৯২৬.৩০	৫,০০,০০০/-	৩৬,১২৩	৭,৪৫,০০০/-	২২২			১,১৮,০০০/-	১৮০										১৩,৬৩,০০০/-
১৯৮৯-৯০	১১,৯৬,৯২৩.৫৪	৪,০০,০০০/-	৩৫,৬৪৩	১,৫০,০০০/-	৩২১			৫০,০০০/-	২৪৫										৬,০০,০০০/-
১৯৯০-৯১	১৬,৭৬,৭০৫.০৩	৬,৫৮,২০০/-	৩৬,৬৩০	১,৮২,৬০০/-	৫৩৩	৮১,৬০০/-	৩২৫	৪৩,০০০/-	২৬৮										৯,৬৫,৪০০/-
১৯৯১-৯২	৫,৪৫,৯২৭.১৫	৪,০০,০০০/-	২৯,১২০	৪,২৬,০০০/-	৩৫৭	৮১,৩৬০/-	৩৩৮	৯৪,০০০/-	২৫৯			১৭,৬০,৪২৫/-	২৭৬	৯৮,৪০০/-					২৮,৬০,১৮৫/-
১৯৯২-৯৩	৩৫,৫৬,১৭৬.৫০	৫,০০,০০০/-	১৪,৮৭৬	৪,৮৭,০২০/-	৬৩৯	১,২৭,৬৮০/-	৫৩২	১,০৫,০০০/-	২১৫					১,১৭,৫০০/-					১৩,৩৭,২০০/-
১৯৯৩-৯৪	৭,৬৯,২৩৮.২৫	৩,০০,০০০/-	২০,২১৫	২,১৮,০০০/-	৬৩২	২,৯৮,৮০০/-	৪৯৮	১,৩৬,০০০/-	১৬৪	৬,৪০,০০০/-	৬৪০	২০,২৩,০৯৪/-	৩২০	৯৮,৬৬১/-					৩৭,১৪,৫৫৫/-
১৯৯৪-৯৫	৯,৭৮০,৪৯৪.২০	৩,০০,০০০/-	১৩,০৮৪	৩,৬৪,০০০/-	৫৩৫	২,৯৯,৪০০/-	৪৯৯	৩৮,০০০/-	১৩৮	৩,২০,০০০/-	৩২০			৪৯,০০০/-					১৩,৭০,৪০০/-
১৯৯৫-৯৬	১০,০০,৫৬৪.৪০	১,৫০,০০০/-	১২,৬০৯	৪,১৪,৭০০/-	৫৩৪	২,৯৪,০০০/-	৪৯০	১১,০০০/-	১১২	৩,২০,০০০/-	৩২০			৭,০০০/-					১১,৯৬,৭০০/-
১৯৯৬-৯৭	১৪,৫২,২৬৯.৬০	৬০,০০০/-	১৪২৬৯	৩,৮৩,৪০০/-	৪৩০	২,৭৬,০০০/-	৪৮৭	৫,০০০/-	১১২	৩,২০,০০০/-	৩২০			২,০০০/-					১০,৪৬,৭০০০/-
১৯৯৭-৯৮	২০,৫৭,৯৭৪.৭৪	৯০,০০০/-	১৬,৫০৯	৪,৫৫,৯৬২/-	৩৩৮	৩,০০,৬০০/-	৫০১			৩,২০,০০০/-	৩২০								১১,৬৬,৫৬২.২০
১৯৯৮-৯৯	১২,৮১,৬৩৪.৭০	৩,১৬,৮০০/-	১৩,২৫৭	৪,৫৬,১০০/-	৩০২	৩,৫৪,২৪০/-	৪৯২			৩,২০,০০০/-	৩২০	৬,৫০,০০০/-	১২৮	২৩,৩০০/-					২১,২০,৪৪০/-
১৯৯৯-০০	১৪,৭৬,৮১৯.৮০	৪,১২,৩০০/-	১৫,৩৪৬	৫,২৪,৪০০/-	৩৬০	২,৩৯,০৪০/-	৩৩২			৮০,০০০/-	৮০			৫,০০০/-		৪০,০০০/-	১৩		১৩,০০,৭৪০/-
২০০০-০১	১৪,৭৫,৬৮০.০০	৩,১১,৮২০/-	১৫,৩২৫	৫,০০,৪০০/-	৩২০	২,৫৪,৮৮০/-	৩৫৪			১,১০,০০০/-	১১০			৩০,০০০/-		২,৫২,০০০/-	৭২	১২,৮৬৩/-	১৪,৭১,৯৬৫/-
মোট :	২,৪৮,৬৯,১৭৫.১৯	৫১,৪৩,১২০/-	৩,৭৪৬৫০	৬৯,১০,৫৮২.২০	৬,৭০১	২৬,০৭,৬০০/-	৪৮৪৮	৯,৩২,৯৫০/-	২,২৫৩	২৪,৩০,০০০/-	২,৪৩০	৪৪,৩৩,৫১৯/-	৭২৪	৬,৩০,৮৬১/-		২,৯২,০০০/-	৮৫	১২,৮৬৩/-	২,৩৩,৯৩,৪৯৫/২০

* আয়-ব্যয় প্রতিবেদনটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহীত।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯ বছরে মাত্র ২,৪৮,৬৯,১৮৫.১৯ টাকা যাকাত বাবদ প্রাপ্তি যা খুবই সামান্য।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বণ্টনের প্রকল্পসমূহ

১। শিশু হাসপাতাল

২। সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প

৩। বৃত্তি প্রকল্প

৪। আদর্শ মক্তব প্রকল্প

৫। দুঃস্থ বিধবা পুনর্বাসন প্রকল্প

৬। রিক্সা / ভ্যান গাড়ী প্রদান

৭। ইয়াতিম / দুঃস্থদের সাহায্য

৮। সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি।[১]

যাকাত আদায় ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের আওতা বহির্ভূত কোন কোন সংস্থার কিছু কার্যক্রম লক্ষণীয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে "ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন", বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, আনজুমানে মুফিদুল ইসলাম এবং ইসলাম প্রচার সমিতিসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র প্রয়াশ। এ সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবিক কারণেই একটি বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের কিছু কার্যক্রম লক্ষণীয়। স্বল্প পরিসরে হলেও একটি বিশেষ সাংগঠনিক পদ্ধতিতে এ সংস্থা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন ও দুঃস্থদের মাঝে ২০০১ সনে তাদের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১। আর্থিক সাহায্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন খাতে মোট ব্যয় ৬,১৩,৪৫৬/=

২। পোড়াদহ, কুষ্টিয়া দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় মোট ১০৭৪ জন দুঃস্থদের মোঝে ঋণ প্রদান করেছে, মোট ঋণের পরিমাণ ৩১, ৬১, ৫৪/=

এ ছাড়া স্বাস্থ্য সেবা মিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১। পোলিও টিকা দেয়া হয়েছে ১১৬০ জন শিশুকে

২। ভিটামিন-এ খাওয়ানো হয়েছে ৯৮৫ জনকে

৩। টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে ৯২টি

৪। স্যানিটারী লেট্রিন বসানো হয়েছে ১৯৪ টি

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ মিশনের কার্যক্রমের মধ্যে আরও হলোঃ

১। ইয়াতীম ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচী

২। সকলের জন্য শিক্ষা (ফোরকানিয়া ও আদর্শ মক্তব)

৩। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

৪। বস্তিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প

৫। টাইপ রাইটিং ও শর্ট হ্যান্ড প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।[১]

ইসলাম প্রচার সমিতি

যাকাত ব্যয়ের আটটি সুনির্দিষ্ট খাতের মধ্যে মনজয় (তা'লীফুল কুলূব) অন্যতম। বাংলাদেশে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ এবং সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে নওমুসলিমদের শিক্ষা পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৮৬ সালে মাওলানা আবুল হোসাইন ভট্টাচার্য (নওমুসলিম)-সহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে ইসলাম প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার অধীনে এ সমিতি রেজিষ্টিকৃত।[২]

ইসলাম প্রচার সমিতি তেত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে। এই সুদীর্ঘ কালে সমিতি বহু অসহায় নওমুসলিমকে আশ্রয় এবং তাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া অনেক ইয়াতীম, বিধবা ও অসহায় লোকও বিভিন্নভাবে সমিতি থেকে সাহায্য লাভ করে পুনর্বাসিত হয়েছে। সমিতির সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সমিতির সহায়তায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এ যাবত সমিতির মাধ্যমে ২৯১১ জন পুরুষ ও মহিলা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। সারাদেশে প্রায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) নওমুসলিম সমিতির আওতাধীন রয়েছে।

সমিতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যাবলী

সাভারে নওমুসলিম প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং নিউ কনভার্টস হোম নামে ২টি হোষ্টেল রয়েছে। সেখান থেকে ৩৫ জন নওমসুলিম দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছে এবং সমিতির খরচে বাইরে লেখাপড়া করেছে ৪২ জন।

সমিতির পুনর্বাসন কার্যাবলী

* সমিতির সহায়তায় চাকুরী পেয়েছে ৫২ জন

* ব্যবসায় আর্থিক সাহায্য লাভ করেছেন ৫০ জন

---

১. বাংলাদেশ মসজিদ মিশন বুলেটিন, ঢাকা, ২০০১।

২. রেজিষ্ট্রেশণ নং- এস ৬০০/১৬/১৯৭৭-৭৮ জে নং এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিষ্ট্রেশন নং- ড-৩১০৬৯ (১-১-১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

* ৯টি দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে নওমুসলিমসহ প্রায় ১২,০০ গরীব, অসহায় রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেয়া হয়েছে।
* ১৫ জন নওমুসলিমকে ১৫টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।
* শীত বস্ত্র বিতরণ ঃ (কম্বল ১০০টি, লুঙ্গী ১৭৫ এবং শাড়ী ২০০টি)
* ৭টি এলাকায় ৭টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।
* ১টি নওমুসলিম পরিবারকে ১টি রিকশা ও অন্য ১জন নওমুসলিমকে সেলুন ও তার প্রয়োজনীয় উপকরণ দেয়া হয়েছে।
* ৪০ জন নওমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে বই-খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
* ৩৫০টি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে মোট ১লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

সমিতির আয়ের উৎস

যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও মাসিক/এককালীন দান।[১]

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং এর পথিকৃৎ 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ১৯৮৩ সনের ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকি কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৮৩ সনের ৪ জুলাই 'সাদাকা তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করে যা পরে ১৯৯১ সনে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে কাজ শুরু করে। এর জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা হিসাব পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা। এটি জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক নিবন্ধীকৃত (নং এস-১২১৪ (২৫) ১৯৮৮ (তাং ২৫-০৬-৮৮) এবং এটি এনজিও ব্যুরো কর্তৃকও নিবন্ধীকৃত (নং ৬৬৮ (তাং ২৪-১১-৯২)। ফাউন্ডেশনের আয়ের প্রধান উৎস ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নিজস্ব সম্পদের যাকাত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত যাকাত, সাধারণ দান, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে তাদের যে অর্থ সন্দেহজনক (doubtful) এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব চলতি প্রকল্পের আয়।

১. ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা, সংক্ষিপ্ত বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

(১৯৮৪ থেকে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত)[১]

ক্রমিক নং	প্রকল্প
১।	**আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম**
	(ক) সেলাই মেশিন প্রকল্প
	(খ) রিক্সা প্রকল্প
	(গ) হাঁস মুরগী বিতরণ
	(ঘ) গাভী পালন
	(ঙ) আত্মকর্ম সংস্থানমূলক প্রকল্প
	(চ) ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ
	(ছ) ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ
	(জ) পল্লী স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ প্রকল্প
২।	**শিক্ষামূলক কার্যক্রম**
	(ক) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র বৃত্তি প্রদান
	(খ) আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব প্রকল্প
	(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দান
	(ঘ) দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন সাহায্য
	(ঙ) শিক্ষা ঋণ
৩।	**স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম**
	(ক) দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহায়তা দান
	(খ) দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা
	(গ) নলকূপ বসানো
	(ঘ) স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী প্রকল্প
৪।	**মানবিক সাহায্য দান কার্যক্রম**
	(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের এককালীন দান
	(খ) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ
	(গ) কন্যাদায়গ্রস্তদের এককালীন সহায়তা দান
	(ঘ) ইয়াতিমখানা নির্মাণ ও পরিচালনা

১. শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১২; অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন : যাকাত কি কেন (ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম**

(ক) রিলিফ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

(খ) বসনিয়া হারজেগোভিনায় মুসলিমদের সহায়তা প্রদান

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ কাজ পরিচালনা

(ঘ) বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খড়া, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য দান

৬। **দাওয়াহ্ কার্যক্রম**

(ক) ইসলামী গবেষণাধর্মী পত্র-পত্রিকা ও বই-কিতাব বিতরণ

(খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা

(গ) অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে দাওয়াহ্ কার্যক্রম সম্প্রসারণে সাহায্য করা।

৭। **বিশেষ প্রকল্প**

(ক) ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

(খ) ইসলামী ব্যাংক টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট

(গ) মনোরম (দুঃস্থ মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র)

(ঘ) বিকলাঙ্গ সমন্বিত উন্নয়ন কেন্দ্র

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের আর্থিক খতিয়ান
(জুলাই ১৯৮৪ থেকে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত)[১]

	প্রকল্প কর্মসূচী	ব্যয়কৃত অর্থ	%
১.	আয় বর্ধন / কর্মসংস্থানমূলক	২.৬১	১০.২৪
২.	শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক	৪.৯১	১৯.২৮
৩.	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	২.০৩	৭.৯৫
৪.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন	৩.৪৩	১৩.৪৭
৫.	দাওয়াহ্ কার্যক্রম	৩.২৬	১২.৭১
৬.	মানবিক সাহায্য	১.৬৭	৬.৫৫
৭	বিশেষ প্রকল্পসমূহ	৩.৬৪	২৬.০৬
৮.	সাধারণ কর্মসূচী (স্থানীয় শাখাসমূহের মাধ্যমে)	০.৯৩	৩.৬৬
	মোট	২৫.৪৮	১০০.০০

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; ওয়েফেলয়ার প্রোগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, খৃ. ১৯৯৯, পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৪

মুসলিম বিশ্বে যাকাতের ব্যবহার

ফিলিস্তীনসহ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার[১] সদস্য সংখ্যা ৫৭। এদের লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫ কোটি যা সমস্ত বিশ্বের লোক সংখ্যার প্রায় ২৫%। এরা একযোগে বিশ্বের খনিজ তেলের ৬৬%, প্রাকৃতিক রাবারের ৭০%, পাটের ৪০%, পাম তেলের ৫০%, কোপেকের ৮০% এবং সিনকোনা বা কুইনিনের ৯০% উৎপন্ন করে থাকে। এসব ছাড়াও রয়েছে বিপুল পরিমাণ টিন, কয়লা, আইরিক লোহা, বক্সাইট এবং ফসফেট। তুলা, চামড়া ও কোকোর মতো শিল্পের কাঁচামালেও এরা সমৃদ্ধ। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর রয়েছে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের জনশক্তি।[২]

এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় মুসলিম দেশগুলি শুধু কম উন্নতিই নয়, তাদের অধিকাংশ দরিদ্র, এতই দরিদ্র যে তাদের ১৯টি দেশ (৩৭%) বিশ্ব ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী 'স্বল্পোন্নত দেশ' হিসাবে বিবেচিত।[৩]

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রেও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দারুণ পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৯৫ সালে শাদের মাথাপিছু আয় ছিল ১৮০ মার্কিন ডলার, পক্ষান্তরে সংযুক্ত আরব আমীরাতে ছিল ১৭,৪০০ মার্কিন ডলার। ঐ একই সময়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২৪০ মার্কিন ডলার। মুষ্টিমেয় তেল সমৃদ্ধ কয়েকটি দেশের কথা বাদ দিলে মুসলিম দেশগুলোতে খাদ্য ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি ও বৈদেশিক নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে।[৪]

মুসলিম বিশ্বে যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা

মুসলিম দেশসমূহে বিরাজমান যাকাত ব্যবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে সরকারী আইন বা নির্দেশে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় হয়। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সউদী আরব, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, জর্দান, বাহরাইন, লেবানন, সুদান, কুয়েত ও ইয়েমেন। লিবিয়ায় ১৯৭১ সালে, জর্ডান ১৯৭৮ সালে, বাহরাইনে ১৯৭৯ সালে, কুয়েতে ১৯৮২ সালে এবং লেবাননে ১৯৮৪ সালে যাকাত আইন প্রণীত হয় এবং একটি করে যাকাত বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮২ সালে। ভারতে মুসলিম প্রধান অনেক এলাকায় রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ পরিকল্পিত ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করে থাকে। সউদী আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় শুরু হয় ১৯৫১ সাল থেকে। সেই দেশে

১. OIC (Organisation of Islamic Conferance)

২. এম. এ. হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে। কুয়েতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জনসাধারণের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা হয়। সেই দেশে ১৯৮৯ সালে যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৮.১০ কোটি টাকা।[১]

মালয়েশিয়াতে রাজ্যসমূহে State Council of Religion-এর নির্দেশে প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায়ের বিধি রয়েছে। এটি চালু হয় ১৯৮০ থেকে। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আইন নাই। তবে যাকাত বিধি লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রদেশসমূহে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।[২]

সুদানে যাকাত তহবিলের আইন পাশ হয় ১৯৮০ সালে। তখন যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে প্রণীত আইনে সাহেবে নিসাব তথা সম্পদশালী সকল মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ইরানে ১৯৭৯ সনে ইসলামী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এর বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য সরকারী দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। পাকিস্তানে সার্বিক যাকাত আদায়ের অধ্যাদেশ কার্যকর হয় ২০জুন, ১৯৮০ হতে। উল্লেখ্য, ইরান ও পাকিস্তানে ব্যাংক সমূহ থেকে উৎস মূলেই যাকাত আদায় করে নেয়া হয়। হিজরী ১৪০৯-১০ সালে যাকাত তহবিলে পাকিস্তান সরকারের আয় ছিল ২৬৮.৬০ কোটি টাকা। এই আইনের বিধানে স্থানীয় যাকাত কমিটি প্রশাসনিক কাজে মোট আদায়কৃত অর্থের ১০%-এর বেশী ব্যয় করতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচীর জন্য কমপেক্ষ ৪৫% ব্যয় করার ও জীবন ধারনের প্রয়োজন পূরণের জন্য ৪৫%-এর বেশী ব্যয় না করার বিধি রয়েছে। এ ছাড়াও পাকিস্তানে উশর আদায়ের অধ্যাদেশ কার্যকর হয় ১৫ মার্চ, ১৯৮৩ থেকে।[৩] সকল মুসলিম দেশে সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের আইন থাকলে এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর হলে দেশীয় উৎস হতেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় হতে পারে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দুঃস্থ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তার বিলি-বণ্টন করা হয় না। যেসব দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত প্রশাসন চালু রয়েছে তাদের মধ্যে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও সউদী আরব অন্যতম। পাকিস্তান ও সউদী আরবে কোম্পানী থেকেও যাকাত আদায় করা হয়। উপরন্তু দেশ দুটি ব্যাংকের কতিপয় বিশেষ ধরনের আমানতের উপর সমহারে যাকাত আদায় করছে। সউদী আরবে আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রীর উপর যাকাত আদায় হয়। পাকিস্তান কৃষকদের সার ও কীট নাশকের ব্যয় যাকাত থেকে বাদ দেয়ার অনুমোদন আছে। এক্ষেত্রে সেচ সুবিধার

১. শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রগুক্ত, পৃ. ৫২।

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপর গুরুত্ব আরোপ না করে সকল কৃষি পণ্যের উপর পাইকারীভাবে ৫% হারে উশর আদায় করা হয়। পাকিস্তানের সরকারী রেকর্ড থেকে দেখা যায় ৫৮% ব্যবহৃত হয়েছে দরিদ্র জনগণের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, বেঁচে থাকার রসদ যোগানে। এছাড়াও সংগৃহীত তহবিলের অর্থ থেকে প্রায় ২০% ব্যয় করা হয়েছে দুঃস্থ ও বেকারদের পুনর্বাসনের জন্য। মালয়েশিয়াতে কেদাহ রাজ্যে১৯৭০ সালে সংগৃহীত যাকাত তহবিল থেকে ৫৩% ব্যয়িত হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষায়, ৬% ব্যয়িত হয়েছে দরিদ্র জনগণের হজ্জ যাত্রার জন্য, ২% নওমুসলিমদের জন্য, ২২% ব্যয় হয়েছে যাকাত আদায়কারীদের প্রদত্ত কমিশন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে। দরিদ্রদ্রের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ১৫%। তালিকাভুক্ত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থে ন্যূনতম পরিমাণ ছিল ৩ মার্কিন ডলার এবং সর্বোচ্চ পরমাণ ১৯ মার্কিন ডলার।[১] যাকাত আদায় ও তার বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাহলে মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর নির্বিশেষে বিরাজমান মারাত্মক আয় ও ধন বণ্টন বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। সুতরাং যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সমাবেশ করা খুবই সম্ভব। সরকারীভাবে যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টন করা হলে এই অর্থের পরিমাণ অবশ্যই বেড়ে যাবে।[১]

১. এম. এ. হামিদ ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত

পরিচ্ছেদ ঃ ১

যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য খুবই ব্যাপক। ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বের সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে কোন স্তরে উঠতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করেছেন, বিশ্বের যা কিছু সম্পদ, সবই আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি জীবের কল্যাণের জন্য করেছেন। সকল প্রাণীই তার অংশ সমভাবে পাবে এবং ভোগ করবে। তিনি বলেন ঃ

«ولقد مكنكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معايش ط قليلاما تشكرون»[১]

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" তিনি আরও বলেন ঃ

«وجعل فيها رواسى من فوقها وبرك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام ط سواء للسائلين»[২]

"তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে প্রার্থীদের জন্য।"

ইসলামী অর্থনীতিতে জীবনযাত্রার মান এই হবে যে, কোন আদম সন্তান ক্ষুধার্ত থাকবে না, সবাই প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও পানীয় পাবে। যেখানে ব্যক্তি এ ধরনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হবে সেখানে রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে। যদি কোন সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক দারিদ্র্যের মাঝে ডুবে থাকে, তবে সেই সমাজও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকবে। দারিদ্র্য দূর করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। দারিদ্র্য দূরীভূত করে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে এগিয়ে আসবে এবং কুফর থেকে সরে যাবে। তবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের সার্বিক দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর। অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যাপক ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্মের সুযোগ প্রদানের মূল দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সমাজে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ط كل فى كتاب مبين»[৩]

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই ; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"

---

১. আল-কুরআন, ৭ ঃ ১০।
২. আল-কুরআন, ৪১ ঃ ১০।
৩. আল-কুরআন, ১১ঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق ط نحن نرزقهم واياكم ط ان قتلهم كان خطاء كبيرا»[১]

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য ভয়ে হত্যা কর না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"

ইসলামী আদর্শে অভাবমুক্ত সমাজ ব্যবস্থাই কাম্য। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাকাত হিসাবে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় হবে সামাজিক প্রয়োজনে। সমাজের দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো যাকাত ভিত্তিক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া। ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক সমাজ গঠনে যাকাতের স্থান এতই ব্যাপক যে, একে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বোচ্চ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা অত্যাবশ্যক এবং একমাত্র সেভাবেই একে অভাবমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. আল-কুরআন, সূরা ১৭ ঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ২

মানব কল্যাণ ও যাকাত

মানব জীবনের সর্বস্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে উন্নীত হতে সহায়তা করে। পারলৌকিক জীবনের মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে দুনিয়ার জীবনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পালন করা আবশ্যক। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। কৃষি-পণ্য এবং অন্যান্য অতিরিক্ত সম্পদেও নির্দিষ্ট হারে যাকাত দিতে হয়। খুব গরীব এবং অসহায়দের কল্যাণের জন্যই মূলত যাকাত দিতে হয়। সামাজিক দায়িত্বের অনুপ্রেরণা থেকেই কেবল যাকাত প্রদান করা হয় না বরং সকল সম্পদের চূড়ান্ত মালিক হচ্ছেন এক আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হলো প্রদত্ত সকল সম্পদ দ্বারা সকল মানুষের কল্যাণ সাধিত হোক। এরূপ একটি চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত অর্থায়ন কর্মসূচীর সাথে সামাজিক আত্ম-নির্ভরশীলতার এই (যাকাত) পদ্ধতি বেকার, দুর্ঘটনা কবলিত, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। যাকাত ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোকে কর্মচারীদের বেতন থেকে অর্থ কেটে নিয়ে বা তাদের দান গ্রহণের মাধ্যমে সকলের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থন যুগিয়ে থাকে। ফলে সরকারী কোষাগারের উপর চাপ সৃষ্টি হয় না। স্বীয় জীবিকা উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون»[১]

"নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«لاتنس نصيبك من الدنيا»[২]

"তোমার পার্থিব অংশ ভুল না"।

আত্মনির্ভরশীলতা শুরু হয় নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন থেকে। চিন্তার স্বাধীনতা থেকে। সহায়তাকারীর কাজে নতজানু হওয়ার মাধ্যমে নয়। দাতার কাছে আত্মমর্পণ করে নয়। নিজ

১. আল-কুরআন, ৬২ ঃ ১০।
২. আল-কুরআন, ২৮ ঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আত্ম-উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার অর্জনই আত্মনির্ভরশীলতার মূল কথা। প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব, সুদক্ষ (Efficient), নিজ ভাগ্য গড়ার কারিগর। সে নিজে দায়িত্ব নিলেই একটি মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। অন্যরা শুধুমাত্র সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে তাকে সামর্থ্যবান করার জন্য যাতে সে সফল হতে পারে। আর 'যাকাত ব্যবস্থাই' হলো পারস্পরিক সহায়তার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত আত্মনির্ভরশীল ভবিষ্যৎ অর্জন করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার পরিবারের জন্য কিছু বস্তুগত ও পারিপার্শ্বিক চাহিদা মেটানো প্রয়োজন, যা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। বস্তুগত চাহিদার মধ্যে রুজি-রোজগার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সুযোগ, সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা, পুষ্টির যোগান, সুপেয় পানি প্রাপ্তি ইত্যাদি বস্তুগত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি লোকের অর্থনৈতিক জীবনের দায়িত্ব বহন করে এবং কোন ব্যক্তিকেই তার অর্থনৈতিক জীবন থেকে বঞ্চিত রাখে না। সেই কারণে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানব কল্যাণের ভূমিকাই মুখ্য। অতএব যাকাত বণ্টন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন একজন দরিদ্র লোক যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। নিজের চেষ্টায় যারা যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকা উপার্জন করতে পারে না তাদের জন্য যাকাত যেন একটি স্থায়ী আয়ের উৎস হয়ে থাকে। এমন একটি আর্থ-সামাজিক পরিবেশ যেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেখানে যাকাত ব্যবস্থা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৈষম্য কমাতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

মানব কল্যাণে যাকাত ব্যবস্থা প্রয়োগে অবশ্যই ইসলামিক কলাকৌশলের পূর্ণ বাস্তবায়ন দরকার। ভ্রাতৃত্ববোধ ও আর্থসামাজিক ন্যায়পরায়নতা লালনের ক্ষেত্রে যাকাত ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নই একটি সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ আকার বা দীর্ঘ মেয়াদী ভারসাম্যহীনতা ছাড়া সাধারণ প্রয়োজন পূরণ, পূর্ণ নিয়োগ অর্জন, আয় এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও স্থিতিশীলতার সাথে উন্নয়ন প্রয়োজন। সীমিত সম্পদ এবং বিরাজমান ভারসাম্যহীন অবস্থায় অদক্ষ এবং কম ন্যায্য ব্যবহার থেকে অধিক দক্ষ এবং অধিক ন্যায্য ব্যবহার, সম্পদের পূনর্ববন্টন এবং সম্পদের উপর দাবী ব্যাপকভাবে হ্রাস করা ছাড়া এই ধরনের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী কলাকৌশল সফল হওয়ার বৃহৎ একটি সম্ভাবনা রয়েছে।[১]

যাকাত ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন আর্থ-সামাজিক পূণর্গঠনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধকে এমন পদ্ধতিতে শক্তিশালী করা যায়, যাতে ব্যক্তি সামাজিক কল্যাণের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ব্যক্তি স্বার্থের সেবা করতে সাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এ ধরণের পূণর্গঠনের অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

১. এম. উমর চাপরা: ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (অনূ: ড. মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ঢাকা), হি: ১৪২১/ পৃ. ২০০০, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. মানবীয় উপাদানকে শক্তিশালী করা

২. আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরায়নতা

৩. গ্রামীণ উন্নয়ন

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৫. ভূমি সংস্কার ও পল্লী উন্নয়ন এবং

৬. নৈতিক স্বচ্ছতার বিকাশ ইত্যাদি।

আয় এবং সম্পদের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো আরও বেশী কার্যকর করার লক্ষ্যে অবশ্যই যাকাত ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।[১]

ইসলাম তার বিশ্বাস কাঠামোতে সামাজিক আত্ম-সাহায্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এতে প্রত্যেকে 'আল্লাহ্‌র খলিফা' ও উম্মাহ্‌র সদস্য হিসাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই মর্যাদা ও যত্নের সমন্বয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার সুদূর প্রসারী লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যারা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু অক্ষমতার শিকার এবং নিজেদের সাহায্য করতেও অক্ষম, এরূপ লোকদের চাহিদা পূরণ করা মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব। এত বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও প্রাচুর্যের পাশাপাশি যদি দারিদ্র্য বিরাজ করে তাহলে সেই সমাজকে প্রকৃত মুসলিম সমাজ বলা যায় না।

যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের প্রতি ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার বহিপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁর রহমতও কামনা করা হয়, যার ফলে সকলের কল্যাণ ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণ ঘটে। এভাবে সকলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মুসলমানদের অপরিহার্য আর্থ-সামাজিক অঙ্গীকারের আর্থিক বহিপ্রকাশ ঘটে। এতে সরকারী কোষাগারে কোন বোঝা আরোপ করা হয় না।

যাকাতের মাধ্যমে যে সামাজিক আত্ম-সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় তা কর প্রদানের মত নাগরিক দায়িত্ব নয়। এটা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আরোপিত ধর্মীয় দায়িত্ব এবং তাঁর দেয়া যে সম্পদ বান্দার কাছে গচ্ছিত রয়েছে তা থেকে যারা অস্বচ্ছল তাদের সাথে ভাগ করে নেয়া। এটা হচ্ছে এক প্রকার নির্ধারিত ইবাদত যা ইসলাম শুধুমাত্র নামায রোযা বা হজ্জ্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেনি; এতে একক ও সম্প্রসারিত পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীসহ মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনের উপর জোর দিয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি সজ্ঞাত যাকাত পরিশোধের আল্লাহ্‌আ'আলা কর্তৃক তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করার এবং পরকালে তার কল্যাণ নির্ভরশীল, সেদিন আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব পালনের চেয়েও অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে বড় ধরনের ব্যর্থতা

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে গণ্য করা হবে। কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়টি হয়তো রাষ্ট্র কর্তৃক উদঘাটিত নাও হতে পারে এবং শাস্তি নাও পেতে পারে, কিন্তু যাকাত পরিশোধ না করলে তা হতে পারে না। আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন এবং জানেন, সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে যাকাত আদায় এড়িয়ে যাওয়া অথবা কৌশলে পরিহার করার প্রশ্নই উঠে না। যদি সে তা করে, তাহলে সে তার নিজ স্বার্থকেই ক্ষুণ্ন করে।[১]

মুসলিম সমাজে যাকাতের আরও একটি কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে। এতে বিনিয়োগের জন্য তহবিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সোনা-রূপা ও অব্যবহৃত অর্থসহ সকল সম্পদের উপর যে যাকাত আরোপিত হয় তা পরিশোধের সুবিধার্থে ঐ সম্পদের মালিকরা আয় বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকে যাতে যাকাত প্রদানের ফলে তাদের সম্পদ হ্রাস না পায়। এভাবে যে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপূর্ণ ভাবে আত্মীকৃত হয় সেখানে সোনা-রূপা ও অলস সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ফলে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হবে।

যাকাত ব্যবস্থা কি যাকাত আদায় এড়ানোর জন্য সীমালংঘনকারীদর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে নাকি যাকাত গ্রহীতাদের সংখ্যা কমাবে? যে সমাজে সাধাসিধে জীবন যাপন করাই আদর্শজীবন হিসাবে গণ্য এবং যেখানে সীমালংঘনকারী ও মর্যাদা প্রতীকবোধের বরদাশত করা হয় না এবং সে সমাজে নিজ শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করা বাধ্যতামূলক সেই সমাজের চিত্র এটা নয়। এতদসত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাকাতের কার্যকর পরিপূরক হিসাবে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পুনর্গঠন এবং ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপ্তি লাভের বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।[২]

১. এম. উমর চাপরা: ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), হি: ১৯২১/খৃ.২০০০, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৩

সমাজ উন্নয়নে যাকাতের অবদান

যাকাতের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের পাশাপাশি সামাজিক উদ্দেশ্যও অপরসীম। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

"الزكوة قنطرة الاسلام"[১]

"যাকাত হলো ইসলামের সেতু বন্ধন।"

ইসলাম স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছে, যা সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর সাহায্যের উপযোগী করে তৈরী হয়েছে। এ তহবিল যাকাত হিসাবে সমাজের ধনাঢ্য শ্রেণীর প্রদত্ত অর্থ নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্র এই তহবিলের অর্থ প্রবৃদ্ধির জন্য এবং তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ দরিদ্র ও নিঃস্বদের মাঝে বিতরণ- এ উভয় কাজ করে থাকে। এ তহবিলের পরিমাণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মালয়েশিয়ায় এ তহবিলে জমাকৃত ৩৬৫.৪৫ মালয়েশীয় ডলার যাকাত গ্রহীতাদের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট।[২] দরিদ্রদের মাঝে বিলিকৃত যাকাত অবশ্যই উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হিসাবেই বিবেচিত হবে। কারণ এ অর্থ যাকাত গ্রহীতাদের যেমনি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, সেই সাথে তাদের উৎপাদনমুখী মানসিকতাকেও উন্নততর করবে।

"যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। সমাজে সব মানুষ সমান মজুরীর বা প্রতিদান পায় না। তদুপরি সকলের পারিবারিক ব্যয় সমান নয়। শুধু তাই নয়, কর্মক্ষম মানুষও বিভিন্ন কারণে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শারীরিক অসুস্থতা, ব্যবসায়িক ক্ষতি, দুর্ঘনায় অকর্মন্য হয়ে পারিবারক ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ হতে পারে। এ অবস্থায় যাকাতের মাধ্যম সংশ্লিষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু গতানুগতিক অর্থনীতিতে যাকাতের ন্যায় স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের সমস্যায় নিপতিত বহু নারী-পুরুষকে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতি, নারী ও শিশু পাচার, পতিতা বৃত্তির ন্যায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে।"[৩]

যাকাত অর্থনীতিতে দ্বিবিধ ভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে। প্রথমত, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করা ধনী পরিবারগুলো থেকে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন যেহেতু আদায়কৃত যাকাত থেকে দেয়ার কুরআনিক বিধান রয়েছে সেহেতু এই কর্মসূচীতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় যদি একটি যাকাত

---

১. হাফেজ নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বাকর আল হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত, লেবানন), কিতাবুয যাকাত, ৩. খ, হি: ১৪০৮/খৃ. ১৯৮৮, পৃ. ৬২।

২. বিঃ দ্রঃ এম. ওমর চাপড়া, Towards a Just Monetary System, (Icicester, UK : Islamic foundation), ১৯৮৫, পৃ. ১৪১।

৩. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টনের কৌশল হিসাবে যাকাত ; তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা; অক্টো-ডিসেঃ ২০০২, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

দপ্তর থাকে এবং প্রতিটি দপ্তরে ১০০ জন করে লোক নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে ৪৬০টি উপজেলায় ৪,৬০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। এ ছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে যাকাতের হিসাব নিকাশ ও যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। এদের মাধ্যমে যাকাতের অর্থ কৃষিপণ্য, গবাদী পশু, সংগৃহীত, সংরক্ষিত, বন্টিত ও দূরবর্তী প্রাপকদের নিকট পৌছে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া 'সাহেবে নেসাব' ব্যক্তিদের এবং যাকাত প্রাপকদের তালিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।[১]

দ্বিতীয়ত, যে কোন কর্মক্ষম দরিদ্র লোক যদি যাকাতের মাধ্যমে ব্যবসায়ের পুঁজি পায় তা হলে এ পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে রিক্সা বা ভ্যান ক্রয়, নৌকা ক্রয়, দুধের গরু ক্রয়, পশু মোটা-তাজা করণ, জাল তৈরী, মাছ ধরা, বীজতলা বা নার্সারী তৈরী, সেলাই মেশিন চালানো কিংবা ছোট ব্যবসায়ে পুঁজি খাটিয়ে আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।[২]

যাকাত যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে তেমনি অর্থনীতিতে উৎপাদনও বাড়ায়। যাকাতের অর্থ বহু কর্মক্ষম অথচ দরিদ্র লোকদের ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করতে পারে। যে কোন উৎপাদন কাজে শ্রমের সাথে পুঁজি সংযোজন অত্যাবশ্যক। একজন কৃষকের পক্ষে রিক্ত হাতে কোন ফসল ফলানো সম্ভব নয়। শূন্য হাতে কোন জেলে মাছ ধরতে পারবে না, কুমার পারবে না মাটি থেকে পাতিল বানাতে। তবে সন্দেহ নাই যে, মানুষ শ্রমের দ্বারা বিস্ময়কর উন্নয়ন ঘটাতে পারে। পারে খুঁজে বের করতে কিংবা কাজে লাগাতে অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, পারে অনুর্বর মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করতে। তবে এজন্য দরকার কিছু যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে পুঁজি দ্রব্য। পুঁজির অভাবে বহু কর্মক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকার পড়ে রয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে এ সকল দরিদ্র জনশক্তিকে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।[৩]

সমাজ উন্নয়নে যাকাতের অবদান এর একটি মৌলিক পরিচিতি উপস্থাপন করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।[৪] তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত পল্লী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই এটি অপরিহার্য। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলি অবশ্যই শহরের বস্তির পরিবর্তে

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; Prerzada, sayed Afzal, "The idea of Merit Effect : Islam Contribution to Economics, the Journal of objective studies, Vol. 3, No-1, January 1991.

২. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. অধ্যাপক শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (১৯৪৫-) প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। প্রকাশিত মৌলিক ও অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০। তাঁর লেখা ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি (১৯৮০), ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব (২য় সং ১৯৯৮), ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? (২য় সং. ১৯৮৪), ইসলামী ব্যাংক ঃ কতিপয় ভ্রান্তি মোচন (১৯৮৬), ইসলামী অর্থনীতি ঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (১৯৯৯), বিবর্তন তত্ত্ব ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন (২০০০) শীর্ষক গ্রন্থগুলি অন্যতম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৪০-এর অধিক। বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট সহ বেশ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাজীবী সংগঠনের আজীবন সদস্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আজীবন সদস্য এবং শরী'আ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী-কেন্দ্রিক হবে এবং এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে হবে। শহরের বস্তিতে এসব উদ্যোগ নিলে গ্রাম হতে শহরে অভিবাসন যেমন আরো দ্রুত হবে, তেমন এনজিওগুলোর প্রিয় বস্তির সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যেতে থাকবে। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্য পল্লী উন্নয়নের উপরেই জোর দিতে হবে। এজন্য যাকাত ভিত্তিক কর্মকান্ডের মৌল উদ্দেশ্য হবে মানব কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

ক) ত্রাণ ও কল্যাণধর্মী কর্মসূচী

১. বিধবা/বিকলাঙ্গদের কল্যাণ ঃ বাংলাদেশে বিধবা এবং নানাভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া পরিবার প্রধানদের পরিবারের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নাই। ভিক্ষুকের মতোই এদের জীবন যাপন অথবা ভিক্ষাবৃত্তিই এদের একমাত্র সম্বল। এদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন (৪৪৫১টি) এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের (৫৮৪টি) প্রতিটি হতে কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিধবা/বিকলাঙ্গ পরিবার বেছে নেয়া হয়, তাহলে সর্বমোট ১,০০,৭০০টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। এদেরকে মাসিক ন্যূনতম টাঃ ২,০০০/- করে সাহায্য করলে বার্ষিক ২৪১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

২. বৃদ্ধদের জন্য আর্থিক সহায়তা ঃ এদেশে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে যারা অবসর নেয় শুধুমাত্র তারাই পেনশন পেয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর বার্ধক্যে কোন আর্থিক সংস্থান নেই। এদের জন্য কিছু করা খুবই জরুরী। অনেক সময়ে নিজেদের পরিবারের কাছেও এরা বোঝাস্বরূপ। সুতরাং প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতিবছর যদি অন্তত পঞ্চাশ জনকে মাসিক টাঃ ১,০০০/- হিসাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া যায়, তাহলে ২,৭১৭৫০ জন উপকৃত হবে। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে বার্ষিক ৩০২ কোটি ১০ লাখ টাকা।

৩. মৌলিক পরিবারিক সাহায্য ঃ এদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরতলীতেও বহু পরিবারের মশার আক্রণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেমন মশারী নাই, তেমনি শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য লেপ বা কম্বল নাই। শিশু ও বৃদ্ধদের কষ্ট শীতকালে অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। শীতের তীব্রতায় প্রতি বছর বহু শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া নানা অসুখের শিকার তো হয়ই। এর প্রতিবিধানের জন্য যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের একটা করে বড় মশারী ও একটা বড় লেপ দেয়া যায় তাহলে তারা দীর্ঘদিনের জন্য মশার আক্রমণ ও শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবে। এজন্য চাই সত্যিকার উদ্যোগ ও আন্তরিকতা। যদি প্রতিটি মশারীর গড় মূল্য টাঃ ২২০/- ও লেপের মূল্য টাঃ ৪৩০/- হয় তাহলে এজন্য প্রয়োজন হবে ১৬ কোটি ৩৬.৫ লক্ষ টাকা। বিনিময়ে দশ বছরে ২৫ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশী পরিবার উপকৃত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্য ঃ আমাদের দেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম প্রকট সমস্যা মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের কথা বাদ দিলেও মেয়েকে মোটামুটি একটু সাজিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই হাজার হাজার পরিবারের। এছাড়া বিয়ের দিনে আপ্যায়ন ও অপরিহার্য কিছু খরচও রয়েছে যা যোগাবার সাধ্য অনেকেরই নাই। এসব কারণে বিয়ের সম্বন্ধ এলেও বিয়ে দেয়া হয়ে ওঠে না। পিতা বেঁচে না থাকলে বিধবা মায়ের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে, ন্যূনতম টাঃ ৩০০০/- সহযোগিতা করলে একজন মেয়েকে স্বামীর ঘরে পৌছে দেয়া সম্ভব। যদি দেশের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতি বছর দশটি করে মেয়ের বিয়ের জন্য এ ধরনের সহযোগিতা দেয়া যায়, তাহলে বছরে ব্যয় হবে ১৫ কোটি ১০.৫ লক্ষ টাকা। দশ বছরে বিয়ে হবে ৫,০৩,৫০০ মেয়ের। ফলে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হবে, অর্থমূল্যে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫. ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণ ঃ বাংলাদেশ পল্লী এলাকায় এমন গ্রামের সংখ্যাই বেশী যেখানে বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকদের অনেকেই কয়েক বছর পূর্বেও ছিল মোটামুটি সচ্ছল এবং কৃষি জমির মালিক। কিন্তু পারিবারিক কোন বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক বা গ্রামীণ মহাজনের নিকট হতে টাকা ঋণ নেয়ার ফলে তার শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বেহাত হয়ে গেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই এ তালিকায় সংখ্যাগুরু। মেয়ের বিয়ে, স্ত্রীর চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে শস্যহানির ক্ষতিপূরণের জন্য শেষ সম্বল দুই বা তিন বিঘা চাষের জমি তারা বন্ধক রেখে ঋন গ্রহণ করে। এসব ঋণ-গ্রহীতার অধিকাংশই এ ঋণ আর শোধ করতে পারে না। ফলে তাদের জমি চলে যায় মহাজনের হাতে। এর প্রতিবিধানের জন্য যাকাতের অর্থ থেকেই এদের সাহায্য করা যায়। যদি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা করে প্রতি ইউনিয়নে গড়ে কুড়ি জন কৃষককেও সাহায্য করা যায়, তাহলে ৮৯,০২০ জন কৃষককে প্রতি বছর ঋণমুক্ত করা সম্ভব। জমি ফেরত পেয়ে তারা আবার চাষাবাদ করতে ও জমির মালিক হিসাবে নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেতে পারে। এতে বার্ষিক ব্যয় হবে ৪৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং দশ বছরের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক ঋণমুক্ত হয়ে যাবে।

৬. দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্য ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরেও বস্তি এলাকাতে অগণিত শিশু নিদারুণ পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে এরা যৌবনেই নানা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে সারাজীবনের মতো রাতকানা, স্কার্ভি, খ্যাগ, পাইলস প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়ে পড়ে। এর প্রতিবিধানের জন্য যাদের বয়স দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের ১০০ জন শিশুকে বাছাই করা হয়, তবে প্রতিবছর ৫,০৩,৫০০ জন শিশু এর আওতায় আসবে। পাঁচ বছর পূর্ণ হলে এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য শিশুর মাসিক ব্যয় যদি ন্যূনতম টাঃ ৬০/- ধরা হয়, তাহলে বছরে খরচ হবে ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

৭. প্রসবকালীন সহযোগিতা ঃ প্রসূতি মাতা ও ৬ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে শিশুদের মৃত্যু উন্নয়নশীল বিশ্বে উঁচু হারে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনো গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পরিচর্যা, সেবা-যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার যোগানোর ব্যাপারে একদিকে যেমন বিপুল অমনোযোগিতা ও অশিক্ষা বিদ্যমান, অন্যদিকে সামর্থের অভাবও স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে গর্ভবতী মায়েদের শেষের ছয় সপ্তাহে যখন পুষ্টিকর খাবারের বেশী প্রয়োজন তখন তারা তা যেমন পায় না, প্রসবের পরেও সেই অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটে না। যদি ঘটনাক্রমে উপর্যুপরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে প্রসূতির অনাদর-অবহেলার সীমা থাকে না। উপরন্তু প্রসবকালে যে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত কাপড়-চোপড়-,জীবাণুনাশক সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রয়োজন দরিদ্র পরিবারে তার খুব অভাব। এর প্রতিবিধান করতে পারলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কল্যাণ হবে, তাদের অকাল মৃত্যুর হার কমে যাবে। একই সাথে নবজাতকের মৃত্যুর হারও কমে আসবে। এজন্য প্রতি ইউনিয়নে যদি ২০ টি দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী মাকে বেছে নেয়া হয় এবং টাঃ ১০০০/- সহযোগিতা দেয়া যায় তাহলে বছরে প্রয়োজন হবে মোট ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

৮. **মুসাফিরদের সাহায্য ঃ** নিঃস্ব মুসাফিরের জন্যও সহযোগিতার হাত আমাদের বাড়াতে হবে। কারণ এ হলো খোদায়ী বিধান। দেশের শহরগুলির মসজিদে তো বটেই, থানা পর্যায়ের মসজিদেও প্রায়ই নামাজ শেষে দেখা যায় দু'একজন মুসাফির দাঁড়িয়ে যায় যার সব সম্বল শেষ। চিকিৎসা করতে এসে বাড়ী ফেরার মত অর্থ নেই, কাজের খোঁজে এসে কাজ না পেয়ে ফিরতে হচ্ছে কপর্দকশূন্য অবস্থায়, অথবা দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। এদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব। এজন্য মসজিদের ইমাম সাহেবদের সাহায্য নিলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাদের হাতে গড়ে মাসে টাঃ ২০০০/- এই উদ্দেশ্যে তুলে দিলে এ ধরনের মুসাফিরদের নিজ এলাকায় ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। এদেশের ৬৪টি জেলা শহরে গড়ে পাঁচটি ও প্রতি থানা সদরে একটি করে মসজিদ বাছাই করা হলে, মোট মসিজদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২০+৪৬০=৭৮০। এসব মসজিদে মুসাফিরদের জন্য গড়ে মাসে টাঃ ২০০০/- হারে ব্যয় করলে বছরে খরচ হবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে যে কী বিপুল সামাজিক উপকার হবে তা বলে শেষ করার নয়।

৯. **ইয়াতীমদের প্রতিপালন ঃ** বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে সরকারী শিশু সদন রয়েছে। কিন্তু দেশের অগণিত ইয়াতীম শিশু-কিশোরদের স্থান সংকুলান এসব শিশু সদনে হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু এখানে কিশোর নির্যাতন এবং তাদের আহার ও পোষাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে-মধ্যেই ফাঁক-ফোকর গলিয়ে বেরিয়ে আসে তা হৃদয় বিদারক। তাছাড়া শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় কত যে শিশু-কিশোর ইয়াতীম ও নিঃস্ব হয়েছে তার সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজের বিত্তশালীদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা খুবই উপযুক্ত পদক্ষেপ হতে পারে। এজন্য নতুন ইয়াতীমখানা তৈরী ও ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ১০০ জন ইয়াতীমের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক ন্যূনতম সার্বিক ব্যয় বারো লক্ষ টাকা ধরা হয়, তবে এরকম পঞ্চাশটি ইয়াতীমখানার জন্য বছরে ব্যয় হবে ছয় কোটি টাকা।

১০. **ইউনিয়ন মেডিক্যাল সেন্টার ঃ** এদেশের পল্লী এলাকায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা যে কত অপ্রতুল ও অবহেলিত তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। এদেশের গ্রামীণ জনগণ সুচিকিৎসার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগের অভাবে তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে অথবা হাতুড়ে ডাক্তারদের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র। এদরেকে সুস্থ্যভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে হলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পল্লী এলাকায় পৌছে দিতে হবে। এজন্য দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার 'স্যাটেলাইট ক্লিনিক' নামে ইউনিয়ন-ভিত্তিক কর্মসূচী চালু করেছে আজ হতে দুই দশক আগে। সেই ধাচেই প্রস্তাবিত ইউনিয়ন-কেন্দ্রিক এই সেন্টার গড়ে উঠতে পারে। এটি হবে মূলতঃ ভ্রাম্যমাণ বা মোবাইল। এখানে থাকবে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, একজন করে পুরুষ মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্ট ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এবং পল্লী এলাকায় সব ঋতুতে ব্যবহার ও চলাচল উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী ভ্যান। এই ভ্যানেই থাকবে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও চিকিৎসার অপরিহার্য সামগ্রী বা সরঞ্জাম। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে পালা করে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হবে এই ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল সেন্টার। জনসংখ্যা ও দূরত্বের বিচারে কোথাও এই সেন্টার একই দিনে দুই গ্রাম আবার কোথাও বা দুই দিন একই গ্রামে যাবে। বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা এবং স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ পাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ। সঙ্গতিসপন্ন লোকেরা মূল্য দিয়ে ঔষধ কিনতে পারবে, এ সুবিধাও এখানে থাকবে। এখানে রেফারাল সুবিধার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে একই উদ্দেশ্যে জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত উন্নতমানের হাসপাতালগুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রোগীর দ্রুত ও উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত হবে। ইউনিয়নপিছু কেন্দ্রের গড় মাসিক ব্যয় (ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ভ্যানচালকের বেতন ও ঔষধসহ) বিশ হাজার টাকা ধরলে দেশের ৪৪৫১টি ইউনিয়নের জন্যে বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে ১০৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

১১. স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ঃ দেশের পল্লী এলাকায় তো বটেই, শহরতলীতেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাব প্রকট। হাজার হাজার পরিবারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বানাবার আর্থিক সামর্থ নেই। সেজন্যেই যেখানে-সেখানে প্রস্রাব ও পায়খানার কদর্য ও স্বাস্থ্যবিধি-বহির্ভূত অভ্যাস আরো বেশী প্রসার লাভ করে চলেছে। ফলে সহজেই পানি দূষিত হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে, পুঁতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের পক্ষে ইজ্জত-আবরু বজায় রেখে প্রাকৃতিক এই প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দুরূহ। দেশের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশী। এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা জরুরী। এজন্য প্রয়োজন একটা প্যানসহ স্লাব ও সিমেন্টের ২ বা ৩টা রিং। এজন্য সর্বোচ্চ খরচ পড়বে সাড়ে তিনশ' টাকা। গ্রহীতারা নিজেরাই পাটখড়ি, শুকনা কলাপাতা বা পলিথিন দিয়ে এটা ঘিরে নিতে পারে। যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে বছরে ৫০টি করে পরিবারকে এই সুবিধা দেয়া যায় তাহলে প্রয়োজন হবে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এভাবে ১০ বছরে ২৫,১৭,৫০০ পরিবার এই কর্মসূচীর আওতায় চলে আসবে। পর্দা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধে এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রাসারী।

Dhaka University Institutional Repository

১২. নওমুসলিম পুনর্বাসন ঃ দেশে প্রতি বছরই বিভিন্ন জেলায় কিছু ব্যক্তি বা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই এরা পারিবারিক সম্পদ ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। এদের সন্তান-সন্ততিরাও লেখা-পড়ার সুযোগ পায় না। এদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব। তবে ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের মতো এদের জন্য পৃথক কোন অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা না করে বরং সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে মিশে যেতে সাহায্য করাই শ্রেয়। যদি গোটা দেশে প্রতি বছর অন্তত পঞ্চাশটি নওমুসলিম পরিবারকে এ উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মাসিক টাঃ ৫০০০/- হারে এক বছর ভাতা প্রদান ও কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা সাহায্য করা যায়, তাহলে বছরে ব্যয় হবে ৩৫ লক্ষ টাকা।

খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

১. দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের সহযোগিতা ঃ ইসলামী শিক্ষা অর্জন ব্যতিরেকে প্রকৃত মু'মিন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এদেশে ক্রমেই সেই সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসাগুলো কোনক্রমে টিকে রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় এদেশে ১৯৯১-৯২ সালে দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪,৪৬৬। এ সংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪,১২১ এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তিন বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা কমেছে ৩৪৫টি। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রাইমারী স্কুল ও হাই স্কুলের প্রাইমারী অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। উপরন্তু শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচীও চালু রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসাগুলো এসব সুযোগ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ধরে রাখতে হলে তাদের জন্যও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বিনামূল্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বই প্রদানের পাশাপাশি প্রযোজনীয় পোষাক ও অপরিহার্য ঔষধপত্রের যোগান দিতে হবে। এজন্য যদি দাখিল মাদ্রাসাগুলোসহ আলিম ও ফাযিল মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নেয়া হয় তাহলে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ লাখের মতো। এদের বই সরবরাহ করতে গড়ে মাথাপিছু টাঃ ১৫০/- হিসাবে দরকার হবে ১৫ কোটি টাকা। এক সেট পোশাক সরবরাহ করলে খরচ পড়বে গড়ে মাথাপিছু টাঃ ২০০/- হারে ২০ কোটি টাকা। এছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভিটামিন ও আয়রন ট্যাবলেট সরবরাহ করলে প্রয়োজন হবে আরও ১০ কোটি টাকার। সর্বসাকুল্যে এই ৪৫ কোটি টাকার বিনিময়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে স্থায়ী ভিত রচিত হবে তার ভবিষ্যত মূল্য অপরিসীম। এসবের পাশাপাশি মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোতেও খাদ্যমান বাড়াবার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার করতে হবে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সে সবের বিকাশের কোন বিকল্প নেই। যেকোন আন্দোলন বা জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য নির্ভর করে তার Institution building ক্ষমতার উপরে। সেই জন্যই মাদ্রাসাসহ অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান দ্বীনের কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে বাংলাদেশে কোন কোন জায়গায় ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সেই সবের সমালোচনায় না যেয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফতী আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর (রঃ) বক্তব্য তুলে ধরাই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক, প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচারধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই এ কালে উত্তম।.... সঠিক ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন এ কালে সব কয়টি মহাদেশেই একান্ত কর্তব্য। কেননা এ কালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। এ কাজও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ রূপে গণ্য হতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুবসমাজকে এ কাজে নিয়োজিত ও প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক।.... খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তাধারামূলক বইপুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহ্‌র কালেমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হতে পারে। এ কাজও অল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। ... ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খৃষ্টান মিশনারী ও নাস্তিকতর প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।"

২. ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ঃ দেশের মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে তাদের বিরাট অংশ ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সন্তান। সেই কারণেই তারা নিদারুণ আর্থিক সংকটের শিকার। এদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাতাপিতাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বিক্রি করতে হয় এবং বন্ধক রাখতে হয়। অনেককে নিরুপায় হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। এদের মধ্য থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, সম্মান ও মাষ্টার্স শ্রেণী, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আলিম ফাজিল ও কামিল শ্রেণী, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল কলেজ এবং পলিটেকনিক ও ভকেশনাল ইনষ্টিটিউটগুলোতে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যদি প্রতিবছর পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করা হয় এবং মাসিক টাঃ ১,৫০০/- হারে বৃত্তি দেয়া হয়, তাহলে বার্ষিক ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা। এভাবে দশ বছরে পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য, যেহেতু দ্বিতীয় বছরে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং পুরাতনরাও অধ্যানরত থাকবে সেহেতু তখন প্রয়োজন হবে ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় বছরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২৭০ কোটি টাকা। চতুর্থ বছর হতে প্রয়োজন হবে ৩৬০ কোটি টাকার। সম্ভাব্য বৃত্তিভোগীদের বাছাই করার সময়ে মেধার পাশাপাশি প্রকৃতই পারিবারিক আর্থিক অনটন রয়েছে এমন প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন হবে। এলাকার দু'জন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর আমল-আখলাক ও তাকওয়া সম্বন্ধে গোপনে প্রত্যয়ন করবেন। উপরন্তু বৃত্তিভোগীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রাপ্ত অর্থের অন্ততঃ ৫০% ওয়াকফ তহবিলে কিস্তিতে পরিশোধ করবে এরকম বিধান করাও সম্ভব।

৩. মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ মহিলাদের ঘরে বসেই জীবিকা উপার্জনের পথ করে দিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরী। বিভিন্ন ধরনের সেলাই, কাটিং, নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকস প্রিন্ট, ফুল, চামড়া ও কাপড়ের সৌখিন সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদি শেখানোর জন্য জেলা ও থানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহিলাই কাজ শেখার সুযোগ পাবে। এজন্য বড় বড় শহরে একাধিক এবং ছোট জেলা ও বড় থানাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে মোট ১০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের বেতন, শিক্ষার উপকরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ মাসিক ন্যূনতম গড় ব্যয় টাকাঃ ৮০০০/- ধরলে বছরে ব্যয় হবে ৯৬ লক্ষ টাকা। বিনিময়ে হাজার হাজার মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটবে, পরিবারের ভাঙ্গনও রোধ হবে।

৪. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। এদের যদি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যাবে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই দেশের সরকার উদ্যোগ নিয়ে V-Sat চ্যানেল সংযোগ নিয়েছে এবং শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি করেই প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। আমাদেরও আগামী শতাব্দীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এখনই যুগপৎ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া উচিত। যদি প্রাথমিকভাবে দেশব্যাপী ১০০টি সঠিক মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, তাহলে বছরে ন্যূনতম ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এজন্য প্রথম বছরে ৫ কোটি টাকার মতো ব্যয় হলেও শেষে এটা বছরে দুই কোটি টাকার নিচে নেমে আসবে। গার্মেন্টিস শিল্পে এদেশে তুলনামূলকভাবে কম মজুরীতে শ্রম পাওয়া যায় বলেই আমাদের তৈরী পোশাক বিদেশে বিক্রি হয়। ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রেও উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশে মজুরীর হার কম। তাই এর চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। পৃথিবীব্যাপী এখনই দুই লক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। এটকু উদ্যোগ নিলেই এই বাজারে ঢোকা সম্ভব।

গ) কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী

১. গরু/বলদ ক্রয়ে সাহায্য ঃ গ্রাম বাংলায় কৃষি কাজের প্রধান অবলম্বন চাষের বলদ। একই সঙ্গে পুষ্টি ও উপার্জনের সহায়ক হলো দুধের গাই। অথচ বহু কৃষকের জমি থাকলেও এক জোড়া বলদ নাই। গৃহস্থের দুধের গাই নেই। কেনারও সামর্থ্য নাই। এদের হালের বলদ বা দুধের গাই কিনে দিয়ে স্থায়ীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। প্রতিটি গরু বা বলদের দাম যদি গড়ে টা ৭,৫০০/- ধরা যায় এবং প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ২০ জনকেও সাহায্য করা যায় তাহলে প্রতি বছর ব্যয় হবে ৬৬ কোটি ৭৬.৫ লক্ষ টাকা। এই কর্মসূচী দশ বছর চালু থাকলে চাষাবাদ ও দুধের মাধ্যমে উপার্জন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। গতিবেগ সঞ্চারিত হবে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও।

২. অন্যান্য পেশাগত কর্মসংস্থান ঃ শহরতলীসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় নিদারুণ বেকারত্ব বিদ্যমান। দেশের কর্মরত এনজিওগুলি (গ্রামীণ ব্যাংকসহ) এসব বেকারদের বিশেষত মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নানা ধরনের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঋণ দিচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ ঋণ নিয়ে তারা স্বনির্ভর হয়েছে, না এনজিওগুলো সুকৌশলে তাদের শুষে নিয়ে নিজেরাই ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে, সেই বিচার আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি নিম্নের খাতগুলিতে উপকরণ/সরঞ্জাম কিনে সাহায্য করা যায়, তাহলে কি পরিমাণ উপকার হতে পারতো তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

গ্রাম বাংলার ইউনিয়নসমূহ ও শহরতলীর এলাকাগুলিতে যেসব পেশায় অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো ঃ

(ক) ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদন ঃ চাল/চিড়া/মুড়ি/মোয়া/খই তৈরী, পাটি তৈরী, চাটনী/আচার/মোরব্বা তৈরী, মিঠাই তৈরী, লুঙ্গি/তোয়ালে/গামছা বোনা, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশীকাঁথা তৈরী, খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সব্জী চাষ ইত্যাদি।

(খ) পেশাগত সরঞ্জাম ক্রয়, সংযোজন ও মেরামত ঃ রিক্সা ও রিক্সাভ্যান তৈরী ও মেরামত, সেলাই মেশিন ক্রয়/মেরামত, জাল তৈরী, গরু ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকা তৈরী ও মেরামত, চাষাবাদের সরঞ্জাম তৈরী ও মেরামত, ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত, স্যালো মেশিন মেরামত ইত্যাদি।

(গ) ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা ঃ মুদী দোকান, মনোহারী দোকান, এ্যালুমিনিয়াম/মাটির তৈজসপত্রের দোকান, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, মাছের ব্যবসা, সব্জীর ব্যবসা, মৌসুমী ফলের ব্যবসা, ফেরীওয়ালা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে যদি প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত যেকোন দশটি পেশায় প্রতি বছর গড়ে দশ জন হিসাবে একশত জন বেকার। অথচ উদ্যোক্তা পুরুষ ও নারীকে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের আর্থিক সহযোগিতা করা যায় অর্থাৎ উপকরণ কিনে দেয়া যায়, তাহলে বছরে প্রয়োজহন হবে সর্বমোট ২৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এ সুযোগ একজন লোক মাত্র একবারই পাবে। ফলে প্রতি বছর কর্মসংস্থান হবে ৫,০৩,৫০০ জনের। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বাংলাদেশে ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক বাদে উল্লেখ্যযোগ্য এনজিওগুলোর প্রদত্ত ঋণের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ ছিল ৪,৩৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র ১৯৯৭ সালে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৫০৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এ বছরে ঋণ-গ্রহীতাদের গৃহীত মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র টাঃ ২,২৩৮/-। (তথ্য সূত্রঃ CDF Statistics, Vol.5, December 1997, Credit And Development Forum, Dhaka,-p.60)। এই ঋণ সবটাই শুধতে হয়েছে সুদসহ, যার হার খুবই চড়া। এর বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতিতে উপকরণ-গ্রহীতাকে সাহায্য করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং মূল অর্থও (যার পরিমাণ এনজিওগুলো প্রদত্ত গড় অর্থের দ্বিগুণেরও বেশী) রয়ে যাচ্ছে তার কাছে মূলধন আকারেই।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গৃহায়ণ কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে প্রতি তিন জনের একজনেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। প্রতি লাইনের দু'পাশ, নদীর উঁচু পাড়,বেড়ী বাঁধ প্রভৃতি জায়গায় কোন রকমে খুঁটির মাথায় পলিথিন, চট, সিমেন্টের ব্যাগ দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে বাস করছে দুর্গত বনি আদমরা। সেখানে না আছে আলো-বাতাস, না আছে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা। লেখাপড়া বা বিনোদনের কথা নাই-বা উল্লেখ করা হলো। এছাড়া অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজের বারান্দায়, রেল ষ্টেশন ও বাস টার্মিনালে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল নারী-পুরুষ রাত কাটায়। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী খাস জমি বা জেগে ওঠা নতুন চরে এদের বহুজনেরই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন ন্যূনতম তিন বান টিন, গোটা দশেক বাঁশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এছাড়া বেড়াও দিতে হবে। বিশুদ্ধ পানির জন্য প্রয়োজন টিউবওয়েলের। হাজার বিশেক টাকার মধ্যে এসব প্রয়োজন পূরণ সম্ভব। দেশের ৫০৩৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতিবছর যদি অন্তত পাঁচটি করে পরিবারকে ঘর বেঁধে দেয়া যায়, তাহলে উপকৃত হবে ২৫,১৭৫টি পরিবার, ব্যয় হবে ৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

এভাবে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করে যেমন স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি এসব বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত ও স্থায়ী উপার্জনেরও সুযোগ হয়। এর ফলে পুরাতন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীগুলি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। উদাহরণত, পরিবহণ শিল্পের কথা ধরা যেতে পারে। দেশে সড়ক যোগাযোগের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আন্তঃজেলা ও রাজধানীর সাথে সড়ক পথে যাতায়াতের পরিমাণ বহুগণ বেড়েছে, অদূরভবিষ্যতে এটা আরো বাড়বে। এই সুযোগ গ্রহণ করে যদি আধুনিক ২০০ বাস (এয়ার কন্ডিশনড নয়) রাস্তায় নামানো যায়, তাহলে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকা। এ থেকে যে আয় হবে তা যেমন পুনরায় বিনিয়োগ করা যাবে, তেমনি বিপুল সংখ্যক লোকেরও কর্মসস্থান হবে। ড্রাইভার, কন্ডাকটর, হেলপার, ওয়েলম্যান, মেকানিক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি মিলে বিরাট সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

এ পর্যন্ত যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে সর্বসাকুল্যে চৌদ্দশত কোটি টাকার বেশী ব্যয় হচ্ছে না। অবশিষ্ট যে বিপুল অর্থ হাতে রয়ে যাবে, তা দিয়ে আরো কল্যাণধর্মী উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী উপার্জনের উদ্দেশ্যে বড় আকারে বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। এই অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব আধুনিক ছাপাখানা, রেশম শিল্প, জুতা শিল্প, সাবান শিল্প, সূতা শিল্প, গার্মেন্টিস শিল্প, আসবাবপত্র তৈরীর প্রতিষ্ঠান, এমনকি চিনির কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি বৃহদায়তন কারখানাও। এজন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প ও যথাযথ পরিকল্পনার। একই সঙ্গে দরকার ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যয়দিপ্ত মানুষের।

উপরের আলোচনা হতে এ সত্য দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আল্লাহ্‌র দেয়া বিপুল সম্পদ রয়েছে। এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দরকার নেই বিদেশী সাহায্যের। যা দরকার তা হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

দাবী সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিবহাল হওয়া, যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টন সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সরকারী নীতি-নির্দেশনা এবং একটি সুদূরপ্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা। তাহলে সুদের অভিশাপমুক্ত হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

যাকাত আদায় ও তা বিলিবন্টনের জন্যে সরকার বা কোন সংস্থার বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। যাকাত আদায়কারীই যেহেতু আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের অর্থ পেতে পারে সেহেতু আদায়কৃত যাকাত থেকেই আদায়কারীকে এর একটা অংশ বেতন হিসাবে দেয়া হবে। কোন প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে এলে তাকেও অর্থ দেয়া সম্ভব। এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও অর্থ-সামগ্রী বিতরণ করার কাজটিও সহজ হবে।

এ ব্যাপারে আজ প্রয়োজন দেশের ওলামা-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করা। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত ও 'উশর আদায় এবং তার সর্ব্বোচ্চ কল্যাণমুখী ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। একই সঙ্গে সরকারকেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনের জন্য বলতে পারেন। তবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো দেশের শিক্ষিত ও উদ্যমী যুব সমাজকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং দায়িত্ব দেয়া। এতে তারা যেমন নিজেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, তেমনি দেশের দুঃস্থ, দুর্গত, বিধবা ও বেকার লোকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

রাজধানী শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা মসজিদের সংখ্যা তিন লক্ষ অতিক্রম করে যাবে। এ থেকে একেবারেই মানসম্পন্ন নয় অথবা ওয়াক্তিয়া নামাজে গড় হাজিরা পঞ্চাশ জনের কম এবং রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বাস টার্মিনাল, ফেরীঘাট প্রভৃতি জায়গার মসজিদ (যার মুসল্লীরা অনিয়মিত ও অস্থানীয়) বাদ দেয়ার জন্যে সর্বোচ্চ এক লক্ষ মসজিদকে বাদদেয়া যেতে পারে। যদি বাকী দুই লক্ষ মসজিদে কমপক্ষে গড়ে ৫০ জন মুসল্লী নিয়মিত নামাজ আদায় করেন তাহলে মোট মুসল্লীর সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি। এ মুসল্লীরা যদি গড়ে পঁচিশ জন মিলে মাত্র একজন লোকের দারিদ্র বিমোচনের উদ্যোগ নেন, তাহলে প্রতি বছর চার লক্ষ লোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সেই একজন হতে পারে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যের কেউ, হতে পারে নিজের প্রতিবেশীদের কেউ। এভাবে দশ বছরে চল্লিশ লক্ষ লোককে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এজন্য দরকার একটু আন্তরিকতা, একটু উদ্যম এবং পরিকল্পনামাফিক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। তাহলে এসব বনি আদমের জীবনের নেমে আসবে স্বস্তি, এদের মুখে ফুটবে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির অনাবিল হাসি।[১]

১. অধ্যাপক শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বাংলাদেশে : দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার (ইসলামী ব্যাংকিং, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা), জানু-জুন-২০০০, পৃ. ১০৩-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ ঃ ৪

সুদের বিলোপ সাধন ও যাকাত ভিত্তিক সমৃদ্ধি অর্জন

মহান রাব্বুল আ'লামীন সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রম চিরতরে হারাম করেছেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে সুদের কোন স্থান নেই। সামাজিক অত্যাচার ও শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায় হলো সুদ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«الذين يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ط ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا ج واحل الله البيع وحرم الربوا ط فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ط وامره الى الله ط ومن عاد فالئك اصحب النار ج هم فيها خلدون»[১]

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। তা এজন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মত।' অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত রয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আর যারা পুণরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«يمحق الله الربوا ويربى الصدقات ط والله لايحب كل كفار اثيم»[২]

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"

সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হচ্ছে। পরিণামে সামাজিক অস্থিরতা ও শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলছে। অসহায়, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ মানুষ প্রয়োজনের সময়ে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে ঋণ গ্রহীতা তার শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করে থাকে। এতে ধনীরা ক্রমাগতভাবে ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে। এভাবে একই সংগে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য।

কুরআন হাদীসে সুদের প্রতিশব্দ হিসাবে 'রিবা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যার আরবী রূপ হলো ربوا ও ربا[৩] 'রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিবৃদ্ধি, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, বাড়তি, বিকাশ ইত্যাদি।

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৫।

২. প্রাগুক্ত, ২ ঃ ২৭৬।

৩. পবিত্র আল-কুরআনে উপরোক্ত শব্দ দু'টি এসেছে। যথাক্রমে ২ ঃ ২৭৫, ৩০ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

«وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله»[১]

"মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যা সুদ দিয়ে থাক আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।"

ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) বলেন, যে কোন ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলেই তা এক ধরনের সুদ।[২] সুদে বর্ধিত অংশের বিকল্প থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন এক মন ধানের বিনিময়ে দেড় মন ধান গ্রহণ করা হলে অতিরিক্ত অর্ধ মন সুদ হিসাবে গণ্য হবে। অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এক মাসের জন্য এশর্তে এক শত টাকা ধার দিল যে, মেয়াদ শেষে সে ঋণ দাতাকে এক শত বিশ টাকা দিবে। এখানে অতিরিক্ত 'বিশ টাকা' সুদ হিসাবে গণ্য হবে।[৩]

জাহিলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা কাউকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিতো এবং তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণ গ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হতো। যদি সে ঋন আদায় করতে না পারতো, তবে আরো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হতো এবং সুদও বাড়িয়ে দেয়া হতো।[৪]

সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদী কারবারের প্রাচীন ও আধুনিক স্বরূপ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আধুনিক কালে সুদী কারবারের প্রকৃতিগত স্বভাবে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

আল-কুরআনুল কারীমে সুদ ও তার প্রাসংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৫টি আয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] ১৫টি আয়াতের মধ্যে সাতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি 'রিবা' (সুদ) শব্দ উল্লেখ করে তার কুফল, এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি, পরকালে তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন।[৬]

আল-কুরআনুল কারীমের পাশাপাশি রাসূল (স) এর হাদীস দ্বারাও সুদের অপকারীতা ও এর ভয়াবহ পরিণাম অবহিত হওয়া যায়। রাসূল (স)-এর ৪০টিরও অধিক হাদীস দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

---

১. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৩৯।

২. আবূ বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী ঃ আস-সুনানল কুবরা (হায়দারাবাদ, ১ম সংস্করণ), হি: ১৩৪৪/ খৃ. ১৯২৫, ৫. খ, পৃ. ৩৫।

৩. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ (ইফাবা, ১ম সংস্করণ), ২২. খ, হি. ১৪১৭/খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৪৩৩।

৪. ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী আবূ আবদুল্লাহ্ : তাফসীরুল কাবীর, (৩য় সংস্করণ, বৈরূত), ২. খ, পৃ. ৩৫১।

৫. আয়াতগুলো হলো ঃ ২ ঃ ২৭৫-২৮১; ৩ ঃ ১৩০-৩১; ৪ ঃ ১৬০-১৬২; ৫ ঃ ৬২-৬৩; ৩০ ঃ ৩৯।

৬. ৭টি আয়াত ঃ ২ ঃ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৭৯; ৩ ঃ ১৩০; ৪ ঃ ১৬১ ; ৩০ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

"عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء."[১]

"হযরত যাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অভিসম্পাৎ করেছেন সুদখোরকে, সুদদাতাকে, সুদের হিসাবরক্ষককে ও তার সাক্ষীদ্বয়কে এবং তিনি বলেছেন ঃ এরা সকলেই সমান (অপরাধী)।"

"عن عبد الله بن هنظلة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زنية"[২]

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ গ্রহণ করলে তা ছত্রিশবার যিনা (ব্যভিচার) করার চেয়েও মারাত্মক (অপরাধ)।"

"عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا ادناها كالذى يقع على امه"[৩]

"হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। এ সবের মধ্যে সর্বাধিক হালকা স্তর হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাকে বিবাহ করা।"

"عن ابى هريرة دضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة اسرى بى لمّا انتهينا الى السماء السابعة فنظرت فوقى فاذا انا برعدٍ وبروقٍ وصواعق قال اتيت على قومٍ بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت ياجبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء اكلة الربا"[৪]

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন একদল লোকের নিকট পৌঁছলাম– যাদের পেট ঘরের ন্যায় বিশাল এবং তার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য সাপ যা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।"

---

১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : সহীহ মুসলিম (মাকতাবা রশীদিয়াহ, দিল্লী) কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারাআত, বাব-আর-রিবা, ২. খ, তা.বি., পৃ. ২৭।

২. হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাক্র আল-হায়সামী ঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়েদ, (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত, লেবানন), কিতাবুল বুয়ূ, বাব- মা জাআ ফির-রিবা, হি. ১৪০৮/খৃ. ১৯৮৮, ৪. খ, পৃ. ১১৭।

৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী ঃ সুনান ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুত তিজারাত, বাব-আত-তাগলীয ফির-রিবা (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ ৩য় সংস্করণ), হি. ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ২৬১৩।

৪ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী ঃ জামে আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাব-মানাকিব আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী), হি: ১৩৫৭/খৃ.১৯৩৮), ১. খ, পৃ. ৫৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী ব্যবস্থায় অর্থ হ্রাস পায় এবং যাকাত ব্যবস্থায় অর্থ বৃদ্ধি হয়

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদশালী বিত্তবানদের ধারণা হলো, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় এ ধারণার মোটেই স্থান নেই। ইসলামী দর্শনে সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত, সাদাকাহ তথা সৎকাজে অর্থ সম্পদ বিনিয়োগ করলেই সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«يمحق الله الربوا ويربى الصدقت ط والله لايحب كل كفار اثيم»[১]

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাহ বা দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«وماتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلايربوا عند الله ج وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فالئك هم المضعفون»[২]

"মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেনা ; কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।"

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, সুদী ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থ হ্রাস ও ক্ষতির সূচনা করবে এবং যাকাত ও সাদাকাহ তথা দানের মাধ্যমে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসবে।

ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী রূপে চতুর্দিক থেকে সম্পদ আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দিবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না। বিপরীত পক্ষে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত প্রদান করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে উঠে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, হয়তো কেউ লাখপতি-কোটিপতি হয় না কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং প্রতিটি পরিবারই হয় সমৃদ্ধশালী। ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যার ফলে লোকেরা যাকাত গ্রহীতাদেরকে খুঁজে বেড়াতো কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতোনা। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো না যে,

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৬ ।

২. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ অবস্থাকে পর্যালোচনা করলে আল্লাহ্ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাত (দান) ও যাকাতকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।[১]

ইসলামী সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণ করেছেন ইসলাম চায় তারা যেন এই সম্পদ কুক্ষিগত করে না রাখেন বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমনসব ক্ষেত্রে ব্যয় করে যেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্প বিত্ত লোকেরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রবনতা সৃষ্টি করে। এভাবে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাংখা অনুযায়ী ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ করতে ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একেই যাকাত বলা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ যাকাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে, এমনকি একে ইসলামের মূল স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২]

যাকাত ও সুদ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ঃ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুদভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট (ক্ষুদ্র ঋণ)-এর তুলনায় যাকাত যে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী ফলপ্রসূ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উদাহরণস্বরূপ এখানে অতি সংক্ষেপে সুদভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট ও যাকাতের তুলানমূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলো ঃ

১. ব্যাংক বা এনজিওদের দেয়া ঋণের অর্থ দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ গ্রহীতাকে কখনো শোধ করতে হয় না। কেবলমাত্র যাকাতের মাধ্যমেই ধনীর থেকে দরিদ্রদের নিকট সম্পদের নীট হস্তান্তর সম্ভব।

২. মাইক্রোক্রেডিট-এর উপর সুদ বা সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয়। কিন্তু যাকাতের উপর কোন লাভ প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গ্রহীতা প্রাপ্ত যাকাতের মালিক হয়ে যায়।

৩. মাইক্রোক্রেডিট প্রায়শ ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন মাফিক দেয়া হয় না। কিন্তু যাকাত দেবার আদর্শ নিয়ম হচ্ছে; কোন ব্যক্তির দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ তাকে যাকাত হিসাবে দিতে হবে।

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : (বাংলা অনু: আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা), ৬ষ্ঠ প্রকাশ, হি: ১৪২১/খৃ. ২০০০, পৃ. ১৪-১৫।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কোন ঋণ গ্রহীতা একবার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে দ্বিতীয়বার ঋণ প্রদান করা হয় না। কিন্তু যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত দেয়া হবে যতক্ষণ না তার দারিদ্র্য দূর হয়। অর্থাৎ বারবার যাকাত দিয়ে হলেও ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর করাই ইসলামের লক্ষ্য।

৫. ঋণের অর্থ পেতে দরিদ্র কৃষককে ধর্ণা দিতে হয়, তদ্‌বির করতে হয়। বারবার যাতায়াতে তার শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু যাকাতের টাকা গরীবকে চাইতে হয় না। যাকাত দাতার দায়িত্ব যাকাতের টাকা গরীবের ঘরে পৌঁছে দেয়া। এতে গ্রহীতার সম্মানহানি রোধ হয়, অর্থ ও সময় বাঁচে।

৬. ঋণ এমনভাবে দেয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা কখনো ঋণদাতায় রূপান্তরিত হয় না, কিন্তু যাকাত এমনভাবে দেয়া হয় যাতে গ্রহিতা অচিরেই যাকাত দাতায় রূপান্তরিত হতে পারে।

৭. ঋণের অর্থ পেতে ক্ষেত্রবিশেষ জামানত দিতে হয়, যার অর্থ সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যাকাতের বেলায় সহায়ক জামানতের প্রশ্ন তো ওঠেই না বরং যে যত বেশী দরিদ্র সে যাকাতের তত বেশী হকদার।[১]

ঋণদানের ক্ষেত্রে ইসলাম এক ভিন্নতর ও সুন্দরতম ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। সম্পদশালী ব্যক্তি একথা চিন্তাও করতে পারে না যে, সুদ ব্যতিরেকে এক ব্যক্তি তার অর্থ সম্পদ আর এক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে। বিত্তবান ব্যক্তি ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কেবল সুদই আদায় করে না, বরং নিজের মূলধন ও তার সুদ আদায় করার জন্য ঋণ গ্রহীতার বস্ত্র ও গৃহের আসবাব পত্রাদি পর্যন্ত ক্রোক করে নেয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অভাবীকে কেবল ঋণ দিলে হবে না, বরং তার আর্থিক অনটন যদি বেশী থাকে তা হলে তার নিকট কড়া তাগাদা করা যাবে না, এমনকি ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে ঋণের দাবি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ط وان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون»[২]

"যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«ان تبدوا الصدقت فنعما هى ج وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم ط ويكفر عنكم من سياتكم ط والله بما تعملون خبير»[৩]

১. মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ঃ প্রচলিত কৌশল বনাম ইসলামী কৌশল (অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা), সংকলন-২, মার্চ ২০০২, পৃ. ২৬-২৭।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮০।

৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের পাপ মোচন করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।"

কাজেই দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত এবং যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির বিকল্প নাই। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের আধিক্য যেমন ব্যক্তির জন্য অকল্যাণ ও ক্ষতিকর হতে পারে তেমনি সম্পদের স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট দারিদ্রতাও তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ইসলামী অর্থনীতি যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করেছে।

মানব জাতিকে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য নাই। যাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি সুখী, সুন্দর এবং জনকল্যাণকর সুশীল সমাজ গঠনে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«يايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافامضعفة ص واتقوا الله لعلكم تفلحون»[১]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

«لكن الرسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة والمؤمنون بالله واليوم الاخر ط اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما»[২]

"কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, তাদেরকেই মহাপুরস্কার দিব।"

সুদ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বাণীই পুনরায় স্মরণীয় যেখানে সুদের পরিণাম এবং যাকাতের সুফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধিশালী।"[৩]

সুদ হচ্ছে অর্থনীতির সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল সমস্যা। সুদ শোষণের হাতিয়ার এবং মানব জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির পথে সুদ প্রধান বাধা।

সুদরে অভিশাপে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যের সম্মুখীন। আধুনিক দুনিয়ার শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুদ সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে। সম্পদ ও দায়ের

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৩০।
২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৬২।
৩. প্রাগুক্ত, ৩০ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা পালন করছে গুরুতর ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের অভিশাপ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও তার অংগসংগঠনগুলি বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই. এম. এফ.)-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সুদের উচ্চ হারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।[১]

ইসলাম সুদের অপকারিতা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। সুদকে আল-কুরআন হারাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রাসূলের (স) পক্ষ থেকে উচ্চারণ করা হয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা। সাথে সাথে যাকাত ব্যবস্থাকে ইসলামের মৌল স্তম্ভ হিসাবে উপস্থাপন করে এর মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সাধনের উপায় করা হয়েছে।

মহান রাব্বুল আ'লামীন মু'মিনদেরকে সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের সাথে সাথে সুদ ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মু'মিন হওয়ার জন্য সুদের বকেয়া ছেড়ে দেয়ার শর্ত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين»[২]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।"

এরপরও যারা সুদ ত্যাগ না করবে এবং সুদের দাবী ছেড়ে না দিবে তাদের বিরুদ্ধে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি আল-কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

«فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ج وان تبتم فلكم رءوس اموالكم ج لاتظلمون ولا تظلمون»[৩]

"যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না অথবা অত্যাচারিতও হবে না।"

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ ইসলামী ব্যাক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ২য় বর্ষ, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৯৮-৯৯।

২. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৭৮।

৩. প্রাগুক্ত, ২ ঃ ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদান ও দান হলো মানবতার প্রতি রহমত, আর সুদ হলো মানবতার প্রতি অভিশাপ। সুদ হলো হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা এবং এরকম ঘৃণ্য গুণাবলী সৃষ্টির সহায়ক। অথচ এর বিপরীত যাকাত ও সাদাকা হলো স্বার্থহীনতা, মহানুভবতা, দানশীলতা,সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং এ রকম মহান গুণাবলী সৃষ্টি ও বর্ধিত করণের সহায়ক।

যে সমাজের পুরো সম্পদ গুটিকতক স্বার্থপর, হৃদয়হীন ও সম্পদ পুজারীর হাতে আবর্তিত হয়, সে সমাজ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। এর বিপরীত যে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন, সম্পদ থেকে সকলের ফায়দা গ্রহণের সুযোগ ও সম্পদ বর্ধিত করার অবকাশ থাকে এবং গোটা সমাজ নিজের শক্তি-সামর্থ্য, মন-মানসিকতা কাজে লাগিয়ে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-সাধনা করতে পারে, সেই সমাজ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় এরূপ হওয়া কল্পনাতীত। কারণ, সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ গুটি কতক লোকের কুক্ষিগত থাকে। পক্ষান্তরে, যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের আবর্তনের পথ প্রশস্ত হয় এবং সম্পদ থেকে ফায়দা গ্রহণ ও তা বর্ধিতকরণে সামগ্রিক শক্তি নিয়োজিত হয় বিধায় সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১]

প্রকৃতপক্ষে একটি সুষম, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সুদকে রহিত করে জনকল্যাণমুখী যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশ্বকে যে সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন তা সীমাহীন। দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এ সম্পদ ব্যবহার করলে সকলের কল্যানসাধন ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য তা যথেষ্ট। ইসলমী জীবন ব্যবস্থায় গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কোন সুযোগ নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর কোন কর্মসূচী না থাকলে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি তরান্বিত করার পরিবর্তে ধ্বংসই এনে দিবে। এতএব ইসলাম মূলত উপার্জন ও সম্পদের সুষম বন্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

«ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل لا
كى لا يكون دولةً بين الاغنياء منكم ط وما اتكم الرسول فخذوه ق وما نهكم عنه فانتهوا ج واتقوا
للهَ ط ان الله شديد العقاب»[২]

"আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।"

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী : আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা (অনূ: এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা), খৃ.২০০৩/হি: ১৪২৪, পৃ. ২২৪।

২. আল-কুরআন, ৫৯ ঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্র ও অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, ধন-সম্পদের সুষম বণ্টন, ভ্রাতৃত্ববোধ সুসংহতকরণ এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলামে যাকাত রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে অবশ্যই তা নির্ধারিত খাতসমূহে বিতরণ করতে হবে। যাকাত প্রদান ব্যক্তিগত অনুদান বা অনুকম্পা নয় বরং সম্পদশালী ব্যক্তিদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তা দেয়া বাধ্যতামূলক (ফরয)।

ইসলাম পরিপূর্ণ বার্তা ও দিক নির্দেশনাসহ এ পৃথিবীতে আগমন করেছে। মানুষের সার্বিক মুক্তি ও মর্যাদা প্রদান, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্র, জনসাধারণ ও সরকারকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে এগিয়ে নেয়ার সাথে সাথে মানব জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানানো ইসলামের মূল লক্ষ্য। তারা যেন আল্লাহ্রই দাসত্ব করে, শিরক-মুক্ত থাকে এবং মানুষকে যেন প্রভত্বের আসনে না বসায়। এরই ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত সংগ্রহ ও তা বিতরণের দায়িত্ব ব্যক্তিগত পর্যায় না রেখে রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে।[১]

দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও অভুক্ত মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচন, অভুক্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারন এবং অন্যের দু:খ-কষ্টে এগিয়ে আসাকে পরকালীন মুক্তির উপায় হিসাবে পবিত্র আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

« وما ادرك مالعقبة – فك رقبة – او اطعم في يوم ذي مسغبة – يتيما ذا مقربة – او مسكينا ذا متربة »

"তুমি জান, বন্ধুর গিরিপথ কি ? এটা হচ্ছে : দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নি:স্বকে।"[২]

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা অভাবগ্রস্তকে সহযোগিত না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলেন ঃ

« ما سلككم في سقر – قالوا لم نك من المصلين – ولم نك نطعم المسكين – وكنا نخوض مع الخا ءضين – وكنا نكذب بيوم الدين – حتي اتنا اليقين »

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২. আল-কুরআন, ৯০:১২-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে ? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।"[১]

উপরোক্ত আয়াতে জাহান্নামে যাওয়ার চারটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদান না করা।

দরিদ্র, ইয়াতীম, মিসকীন ও অস্বচ্ছল লোকদের সহযোগিতা ইসলামী আদর্শে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দীনী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

«ارء يت الذي يكذب با لدين – فذلك الذي يدع اليتيم – ولا يحض علي طعام المسكين»

"তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে ? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

«كلا بل لا تكرمون اليتيم – ولا تحضون علي طعام المسكين»

"না, কখনই নয়। তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।"[৩]

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দারিদ্র্য হুমকি স্বরূপ। দারিদ্র্যের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণেই আজও মুসলিম সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চালু রয়েছে। যদিও ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছে। দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষাবৃত্তির পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

«من نزلت به فا قة فأ نزلها بالناس لم تسد فا قته ومن نزلت به فا قة فأنزلها بالله فيو شك الله له برزق عاجل أو اجل»

"যার উপর দারিদ্র্য নেমে আসে এবং সে তা মানুষের মাঝে বলে বেড়ায় ,আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য বিমোচন করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে বলেনা, আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য অবিলম্বে অথবা দেরীতে হলেও বিমোচন করেন।"[৪]

১.. আল-কুরআন, ৭৪ ঃ ৪২-৪৭।

২. আল-কুরআন, ১০৭ ঃ ১-৩।

৩. আল-কুরআন, ৮৯ ঃ ১৭-১৮।

৪. আবূ ঈসা মোহাম্মাদ আত-তিরমিযী : সুনান আত-তিরমিযী (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব), হি: ১৪২১/খৃ. ২০০০,পৃ.১৮৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্রতাকে পুঁজি করে ভিক্ষা করে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

« من سأل من غير فقر فكانما يأكل الجمر »

"যে ব্যক্তি অভাব ব্যতিরেকে ভিক্ষা করবে সে যেন জ্বলন্ত আগুন ভক্ষণ করবে।"[১]

ইসলাম দারিদ্র্যকে কখনই পছন্দ করেনি বরং একে একটি মৌলিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কোন নাগরিকই তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে বঞ্চিত হবে না। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম কয়েকটি বাস্তব সম্মত উপায় পেশ করেছে, তা হলো ঃ

(ক) শ্রম বা উপার্জন ।

(খ) দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ ।

(গ) যাকাত।

(ঘ) ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার তত্ত্বাবধান।

(ঙ) যাকাত ব্যতিরেকে অন্যান্য খাত।

(চ) ঐচ্ছিক দান ।[২]

দারিদ্র্য বিমোচনে উপরোক্ত ছয়টি কৌশলের মধ্যে যাকাত হলো স্থায়ী খাত। এ জন্য ইসলাম যাকাতকে ঈমান, নামায ও রোযার ন্যায় ফরয করেছে। বিখ্যাত সাহাবী আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে মানবতার কোন ক্ষতি না করা এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে নামায ,রোযা ও যাকাতকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

« أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يارسول الله ! من لا درهم له ولا متا ع قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسنا ته فإن فنيت حسنا ته قبل أن يقتص ماعليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار »

---

১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল : মুসনাদে আহমাদ (বাইতুল আফকার আদ্‌দাওলিয়া, রিয়াদ,সৌদি আরব), হি : ১৪১৯/খৃ.১৯৯৮,পৃ.১২৬২।

২. বি: দ্র : ড. ইউসুফ আল- কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

''দেউলিয়া ব্যক্তি কে ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, যার দায়-দেনা পূরণের মত অর্থ নাই তিনিই দেউলিয়া'। রাসূলুল্লাহ্ (স) এ প্রেক্ষিতে বলেন : দেউলিয়া হলো ঐ ব্যক্তি যিনি হাশরের দিন তার নামায, রোযা ও যাকাতকে তার আমলনামায় দেখতে পাবে না। কারণ সে এগুলোর অপব্যবহার করেছে ও অপবাদ দিয়েছে এবং অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করেছে, অন্যের রক্ত ঝরিয়েছে ও অন্যদের উপর নির্যাতর করেছে । সুতরাং তার সকল নেক আমল তাকে ফেরত দেয়া হবে। যদি এ সকল দায়-দেনা পরিশোধে তার সব নেক আমল ফুরিয়ে যায়, তাহলে পাপ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১]

জনকল্যাণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, বঞ্চিত ও নির্যাতিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য নিরসন, ধন-সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও সুষম বন্টন, অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা দূর করা, উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যাকাতের সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা উচিত। একটি সুষম ভারসাম্যপূর্ণ যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেই সমাজ থেকে মিথ্যা, দুর্নীতি,ভেজাল,সুদ, ঘুষ,ধোঁকাবাজি, প্রতারণা মজুতদারী ও কালো-বাজারী চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য প্রয়োজন ইসলামের গভীর জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের । তাহলেই সম্ভব রাসূলুল্লাহ(স) প্রদর্শিত জবাবদিহিমূলক, শোষণমুক্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মাধ্যমে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটা সম্ভব হলেই থাকবে না ধনী - গরীবের মধ্যে পাহাড়সম বৈষম্য, সামাজিক অস্থিতিশীলতা,রাজনৈতিক নিপীড়ন, আত্ম-কর্মসংস্থানের অভাব- প্রতিষ্ঠিত হবে দরিদ্র, অসহায়, অস্বচ্ছল,দুস্থ ও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার।

বস্তুত যাকাত ব্যবস্থা হলো বিত্তহীনদের সঞ্চয় এবং ঋণগ্রস্ত, বেকার , পঙ্গু,বন্দী,সাময়িক সংকটাপন্ন পর্যটক ও নও মুসলিমদের পুনর্বাসনের সর্বোত্তম স্থায়ী প্রক্রিয়া।

ধন-সম্পদের নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় দুটোই তাঁর বিধান মোতাবেক হতে হবে। আল্লাহ্ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন মানব কল্যাণের জন্য। এ সম্পদ প্রয়োজন মত সকলেই ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«ها نتم هؤ لاء تد عون لتنفقوافي سبيل الله ط فمنكم من يبخل ج فانما يبخل عن نفسه ط والله الغني وانتم الفقراء ج وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثا لكم»

''দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ; যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।"[২]

---

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : সহীহ মুসলিম (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ,সৌদী আরব), হি :১৪২১/ খৃ.২০০০, পৃ. ১১২৯।

২. আল-কুরআন, ৪৭ ঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«الذي جمع مالا وعدده - يحسب ان ماله اخلده -كلا لينبذن في الحطمة»

"যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে ; সে ধারণা করে যে ,তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিত হবে হুতামায়।"[১]

অতএব মানুষের জীবনকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য সম্পদ উপার্জন, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবরচিত মতবাদ ত্যাগ করে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথেই সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত।

এটা অনস্বীকার্য যে, যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তখনই সম্ভব হবে যখন রাষ্ট্র সামগ্রিক ভাবে ইসলামী শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত হবে। যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত না হবে ততদিন যাকাতের অর্থ-সম্পদকে একটি "যাকাত ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করে যাকাত আদায় করা ও শরী'আহ কাউন্সিলের পরামর্শের আলোকে তা ব্যয় করা যেতে পারে।

পরিশেষে একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, যাকাতভিত্তিক, জনকল্যাণমুখী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ হলেই একটি অস্বচ্ছল, অনগ্রসর জাতিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত করা সম্ভব।

---

১. আল-কুরআন, ১০৪ ঃ ২-৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম ঃ ই ফা বা কর্তৃক অনূদিত।

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ঃ সহীহ আল-বুখারী (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী) ১ম খণ্ড, তা.বি।

৩. ড. এম. এম. রহমান ঃ কুরআনের পরিভাষা, আল মুনীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, খৃ. ১৯৯৮।

৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ মুশকিলাতুল ফাক্‌র অয়াকাইফা আলাজাহাল ইসলাম (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রো) ৬ষ্ঠ সংস্করণ, হিঃ ১৪১৫/ খৃ. ১৯৯৫।

৫. সুলায়মান ইবনে আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি ঃ সুনান আবি দাউদ (মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি. দিল্লী)।

৬. ইবনে হাযম আল-মুহাল্লী ঃ শারহু আলা মিনহাজ আত-তালিবীন, কায়রো।

৭. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর, পাকিস্তান), খৃ. ১৯৮১।

৮. ইমাম আবূ হানীফা (রা) ঃ আল-ফিকহুল আক্‌বার (ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক অনূদিত, ই ফা বা), খৃ. ২০০২।

৯. এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী), খৃ. ১৯৯৯।

১০. আব্দুল্লাহ ফারুক ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা), দ্বিতীয় সংস্করণ, খৃ. ১৯৮৩।

১১. এম. উমর চাপরা ঃ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (অনূ. ড. মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), খৃ. ২০০০/ হি. ১৪২১।

১২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঃ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ৩য় সংস্করণ, খৃ. ২০০৩/ হি. ১৪২৪।

১৩. আবু হামিদ লতিফ ঃ শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্যাপিরাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, খৃ. ২০০৩।

১৪. রুশিদান ইসলাম রহমান ঃ দারিদ্র ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৭।

১৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ঃ শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতি (খায়রুণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় প্রকাশ), হিঃ ১৪২৩/খৃ. ২০০২।

১৬. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন ঃ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা), খৃ. ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. Hanswehr ঃ A Dictionary of Modern Written Arabic, Macdonald Events Ltd. London, 1980.

১৮. আল-হোসাইন ইবনে মোহাম্মদ আল ইসফাহানী ঃ আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মুস্তফা আলবানী আলহালাবী ওয়া আলাদুহু, মিশর), হি. ১৩৮১।

১৯. জিবরান মাসউদ ঃ আররাইদ (দারুল ইসলাম লিল মালাঈন, বৈরূত), ১ম খণ্ড, খৃ. ১৯৮১।

২০. আবুল ফজল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মানজুর ঃ লিসানুল আরব (দারু সাদির, তা. বি, বৈরূত) ২য় খণ্ড।

২১. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব মাজদুদ্দীন আল-ফিরূজাবাদী ঃ আলকামূসু আলমুহীত আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ, তা. বি. (বৈরূত), ৪র্থ খণ্ড।

২২. মুহম্মদ ইবনে আশ্‌শাওকানী ঃ নাইলুল আওতার শারহু মুনতাকিল আকবার (মাকতাবা দারিত তুরাছ, কায়রো) ৪র্থ খণ্ড, হি. ১৩৪৭।

২৩. হাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-কাহলানি ঃ সুবুলস্ সালাম শারহু বুলুগিল মারাম মিন জামঈ আদিল্ল্যাতিল আহকাম (দারু ইহ্‌য়াইত্‌তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত,২য় খণ্ড হি. ১৩৭৯/ খৃ. ১৯৬০।

২৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ ফিকহুয্ যাকাত (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রোঃ ২১ তম সংস্করন), ১ম খণ্ড, হি. ১৪১৪/খৃ. ১৯৯৪।

২৫. আবদুর রহমান আল জাযিরী ঃ কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়া (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত), ১ম খণ্ড, হি. ১৪০৬/ খৃ. ১৯৮৬।

২৬. আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-ফাররা আল বাগাবী ঃ কিতাবুয্ যাকাত মিনাত্ তাহ্‌জীব (দারুল বোখারী, বারিদ, হি. ১৪১৩/খৃ. ১৯৯৩।

২৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ঃ ইসলামের অর্থনীতি (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা) ৭ম প্রকাশ, হি. ১৪১৯/খৃ. ১৯৯৮।

২৮. আল-ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী ঃ বাদাইউস্ সানাইউ (মাকতাবা রশীদিয়া, পাকিস্তান), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, হি. ১৪১০/খৃ. ১৯৯০, পৃ. ৩৯।

২৯. Zohurul Islam ঃ Islamic Economics (Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka), 1st Ed, 1997.

৩০. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী ঃ আল কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা (অনূ. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ই ফা বা, ঢাকা) খৃ. ২০০৩/ হি. ১৪২৪, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. Salem Azzam ঃ Islam and Contemporary Society (London: Islamic Council of Europe), 1982.

৩২. আব্দুল খালেক ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা), খৃ. ১৯৮৭।

৩৩. মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ ঃ যাকাতের শর'য়ী গুরুত্ব ও অবদান (ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ই ফা বা, ঢাকা), খৃ. ২০০৩/ হিঃ ১৪২৪।

৩৪. ইমাম আবূ বকর ইবনে মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী ঃ বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারায়িই, দারুল কিতাব, বৈরূত, ২য় খণ্ড, খৃ. ১৪০২/ হি. ১৯৮২।

৩৫. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী, ৩য় সংস্করণ ২০০১।

৩৬. ড. এম. এ. মান্নান, ঃ ইসলামী অর্থনীতিঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), খৃ. ১৯৮৩।

৩৭. ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ ইসলামের যাকাত বিধান (বাংলা অনুঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ই ফা বা), দুই খণ্ড।

৩৮. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ঃ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ (ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), দ্বিতীয় সংস্করণ, হিঃ ১৪২১/খৃ. ২০০০।

৩৯. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ সহীহ্ মুসলিম (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস্ সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব), হিঃ ১৪২১/ খৃ. ২০০০।

৪০. সুলাইমান ইবনুল আশ্য়াস ঃ সুনান আবূ দাউদ (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, হি. ১৪২১/ খৃ. ২০০০।

৪১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ আত্-তিরমিযী ঃ জামে আত্-তিরমিযী (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আলকুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব), হি. ১৪২১/ খৃ. ২০০০

৪২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ঃ সহীহ আল-বুখারী (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব), হি. ১৪২১/ খৃ. ২০০০।

৪৩. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে 'উশর' বাংলাদেশ পেক্ষিত (ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৯/ হি. ১৪১৯।

৪৪. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী ঃ কিতাবুল হুজ্জাত আলা আহলিল মদীনা, হায়দ্রাবাদ, হি. ১৩৮৫।

৪৫. শাহ্ আব্দুল হান্নান ঃ ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কৌশল, (আল-আমীন প্রকাশন, ঢাকা), খৃ. ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. আবদুল খালেক ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত (ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ই ফা বা, ঢাকা), খৃ. ২০০৩, পৃ. ৮১।

৪৭. ইমাম ইবনে তায়মিয়া ঃ ফিকহুয্ যাকাত ওয়াস-সিয়াম (দারুল ফিকর আল-আরাবী, বৈরূত), হি. ১৪১২/ খৃ. ১৯৯২।

৪৮. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহিমুল কুরআন (মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, দিল্লী), ২২ সংস্করণ, উর্দূ, খৃ. ১৯৮২।

৪৯. ফারিশতা জ.দ. যায়াস ঃ 'ল এন্ড ফিলসফি অব যাকাহ্ (অনূ. হুমায়ুন খানঃ যাকাতের আইন ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খৃ. ১৯৮৪।

৫০. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ঃ ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খৃ. ১৯৯৮।

৫১. এ. জি. এম বদরুদ্দুজা ঃ যাকাতের ব্যবহারিক বিধান (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৮৯।

৫২. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইকোনমিক সিষ্টেম অব ইসলাম (ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর), খৃ. ১৯৮৪, পৃ. ২২৯।

৫৩. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ্ ঃ আল-হিদায়া (অনূ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা), ১ম খণ্ড, খৃ. ১৯৯৮।

৫৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ সহীহ মুসলিম, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি. ২য় খণ্ড।

৫৫. সুলাইমান ইবনুল আশ্য়াছ ঃ সুনান আবূ দাউদ, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি.।

৫৬. ড. আব্দুল করিম জায়দান ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৩।

৫৭. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (অনূ. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), ৮ম প্রকাশ, খৃ. ২০০১।

৫৮. এম.এ. মান্নান ঃ Islamic Economics theory and practice (শাহ্ মোহাম্মাদ আশরাফ পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্থান) খৃ. ১৯৮৩।

৫৯. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন ঃ যাকাত কি ও কেন (ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা), পঞ্চম সংস্করণ, খৃ. ২০০০।

৬০. এম. জহুরুল ইসলাম ঃ আল-যাকাত (বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউ অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), হিঃ ১৪১৯/খৃ. ১৯৯৯।

৬১. দেওয়ান আলী হায়দার আলমগীর ঃ দারিদ্র বিমোচণে গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা (জিগাতলা, ঢাকা), খৃ. ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. এম. উমর চাপরা ঃ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা), হি. ১৯২১, খৃ. ২০০০।

৬৩. হাফেজ নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বাকর আল-হায়সামী ঃ মাযমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত, লেবানন)।

৬৪. আবূ বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী ঃ আস-সুনানল কুবরা (হায়দারাবাদ, ১ম সংস্করণ), ৫ম খণ্ড, হি. ১৩৪৪, খৃ. ১৯২৫।

৬৫. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ (ইফাবা, ২২তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ) হি. ১৪১৭/ খৃ. ১৯৯৬।

৬৬. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী আবূ আবদুল্লাহ ঃ তাফসীরুল কবীর (৩য় সংস্করণ, বৈরূত), ২য় খণ্ড।

৬৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী ঃ সুনান ইবনে মাজাহ, (মাওসুআতুল হাদীসিশ শরীফ আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ, ৩য় সংস্করণ), হি. ১৪২১/খৃ.২০০৩।

৬৮. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী ঃ সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (বাংলা অনূ. আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা), ৬ষ্ঠ প্রকাশ, হিঃ ১৪১৯/ খৃ. ২০০০।

৬৯. ইমাম অহমাদ ইবনে হাম্বল ঃ মুসনাদে আহমাদ, বাইতুল আফকার আদদাওলিয়া, রিয়াদ, সৌদী আরব, হি. ১৪১৯/ খৃ. ১৯৯৮।

৭০. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার ঃ আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সমূহ (বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউড অব ইসলামিক থ্যট), হি. ১৪২২ / খৃ. ২০০১।

৭১. মোঃ হারুনুর রশীদ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যক্রমঃ একটি সমীক্ষা (ই ফা বা, ঢাকা), হি. ১৪২৫/খৃ. ২০০৪।

৭২. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ঈমান ও ইসলাম (ই ফা বা, ঢাকা), হি. ১৪২৫/খৃ. ২০০৪।

৭৩. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান ঃ ইসলামী শ্রমনীতি (আশা পাবলিকেশন্স, ঢাকা), হি. ১৪১৮/ খৃ. ১৯৯৭।

৭৪. আব্দুস শহীদ নাসিম ঃ যাকাত সাওম ই'তেকাফ (শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা), ২য় সংস্করণ, ডিসেম্বর-১৯৯৭।

৭৫. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), হি. ১৪২১/খৃ. ২০০১।

৭৬. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী ঃ আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাজিল কুরআনিল কারীম (ইনতিশারাত ইসলাম, তেহরান), হি. ১৪১১/ খৃ. ১৯৯১।

৭৭. ড. হাসান জামান ঃ ইসলামী অর্থনীতিঃ ই ফা বা, ঢাকা ৩য় মুদ্রণ,

Dhaka University Institutional Repository

হিঃ ১৪০২/ খৃ. ১৯৮১।

৭৮. মুহাম্মদ আসাদ ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি (অনূ. শাহেদ আলী, ই ফা বা, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ) হি. ১৪০৬/ খৃ. ১৯৮৬।

৭৯. সম্পাদনা কমিটি ঃ আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম (ই ফা বা, গবেষণা বিভাগ), হি. ১৪২৩ / খৃ. ২০০২।

৮০. সম্পাদনা পরিষদ ঃ উন্নয়ন বিতর্ক বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০১।

৮১. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ঃ দারিদ্র বিমোচন ও মানবসেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ (ষ্টাডি পাবলিকেশন্স, ঢাকা), হি. ১৪২৩/খৃ. ২০০৩।

৮২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ অর্থনীতিতে রাসূলের (সঃ)-এর দশ দফা (রাজশাহী ষ্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন), হি. ১৪২৩/ খৃ.২০০৩।

৮৩. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আল-আশরাফী ঃ ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংকিং এর রূপরেখা (আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা), চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০১।

৮৪. Mohammad Zohurul Islam FCA ঃ Islamic Economics (Islamic Foundation Bangladesh. First Edition. May 1987.

৮৫. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্নাঙ্গ মানবজীবন (আজীম পাবলিকেশন্স, ঢাকা), হি. ১৪১৮/ খৃ. ১৯৯৭।

৮৬. মনোরঞ্জন দে ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা (মির্জাপুর, গাজীপুর, তৃতীয় মুদ্রণ), খৃ. ১৯৮৯।

৮৭. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব (ই ফা বা, রাজশাহী), হিঃ ১৪০০/ খৃ. ১৯৮০।

৮৮. ইরফান মাহমুদ রানা ঃ হযরত উমর (রা) এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা (অনূ. জয়নুল আবেদীন মজুমদার, ই ফা বা, ঢাকা), হি. ১৪১০ / খৃ. ১৯৯০।

৮৯. সম্পাদনা পরিষদ ঃ আল-কুরআনে অর্থনীতি (দুই খণ্ড) ই ফা বা, হিঃ ১৪১০ / খৃঃ ১৯৯০।

৯০. সম্পাদনা পরিষদ ঃ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূগোল (অনূ. সুবীর মজুমদার. প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত), খৃ. ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯১. সম্পাদনা পরিষদ ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন এজেন্ডা সুশীল সমাজের টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন-২০০১ (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা), প্রথম প্রকাশ ২০০৩।

৯২. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা), খৃ. ১৯৯২।

৯৩. মাওলানা হিফজুর রহমান ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (অনূ. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ই ফা বা, তৃতীয় প্রকাশ), হি. ১৪২০ / খৃ. ২০০০।

৯৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল রহীম ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, চুতর্থ প্রকাশ), হি. ১৪২৯/খৃ. ১৯৯৮।

৯৫. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঃ তা'লিমুল কুরআন (সূচনা খণ্ড) (আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ), খৃ. ১৯৯৮।

৯৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ঃ সুদ সমাজ অর্থনীতি (ইসলামিক ইকোনিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা), হি. ১৪১২/ খৃ. ১৯৯২।

৯৭. আনু মাহমুদ ঃ বাজেট: পরিকল্পনা দারিদ্র বিমোচন (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা), দ্বিতীয় প্রকাশ, খৃ. ১৯৯৮।

৯৮. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী ঃ আল-কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা (অনূ. আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা), অক্টোবর ২০০০ ইং।

৯৯. সম্পাদনা পরিষদ ঃ কুরআন পরিচিতি: ই ফা বা, হি. ১৪১৫ / খৃ. ১৯৯৫।

১০০. মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা), হি. ১৪১৮/ খৃ. ১৯৯৮।

১০১. সম্পাদনা বোর্ড ঃ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ, ই ফা বা, হি. ১৪১৭/খৃ. ১৯৯৬।

১০২. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ঃ ইসলাম পরিচয় (অনূ. মুহাম্মদ লুৎফুল হক: ই ফা বি), হি. ১৪১৬/ খৃ. ১৯৯৫।

১০৩. ইউসুফ উদ্দীন ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (১ম খণ্ড) (অনূ. মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী, ই ফা বা), হি. ১৪০৬/ খৃ. ১৯৮৬।

১০৪. সাইয়্যিদ আতহার হুসেন ঃ গৌরবময় খিলাফত (অনূ. মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, ই ফা বা), হি: ১৪২০/খৃ. ২০০০।

১০৫. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী-২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. সম্পাদনা পরিষদ ঃ সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০২।

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ই ফা বা, চতুর্থ খণ্ড।

১০৮. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ই ফা বা, ১৫ শ খণ্ড, খৃ. ১৯৯৪।

১০৯. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল- কুরতবী ঃ আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত), হি. ১৩৯৭/খৃ. ১৯৮৮।

১১০. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কাযবীনী ঃ সুনান ইবনে মাজাহ (কাদিমী কুতুবখানা, করাচী) তা. বি।

১১১. Muhammad Akram Khan ঃ An Introduction to Islamic Economics (International Institute of Islamic thought, Islamabad, Pakistan), 1994. P. 81.

১১২. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকি ঃ রাসূল (স)- এর সরকার কাঠামো (ই ফা বা, ঢাকা), ২য় সং,খৃ.২০০৪।

১১৩. এম. ওমর চাপড়া ঃ Towards A Just Monetary System (Islamic Foundation, Icicester,U K) 1985,P.141.

১১৪. আলহাজ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ঃ গমৃদ্ধি ও উন্নয়নে বাংলাদেশ (বৈশাখী প্রিন্টার্স,ঢাকা),খৃ.২০০৩।

১১৫. ইবরাহিম মাদকুর ও অন্যান্য ঃ আল-মো'জামুল ওয়াসিত (আল-মাকতাবা হোসাইনিয়া, দেওবন্দ), তা, বি।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা / গবেষণা পত্রিকা / সাময়িকী

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০১।

২. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯২।

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন ও দারিদ্র বিমোচন (স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর, ঢাকা) খৃ. ২০০৪।

৪. দারিদ্র ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস), ঢাকা, খৃ. ২০০৪।

৫. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা। একবিংশতিতম খণ্ড, খৃ. ২০০৪।

৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩।

৭. দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৭।

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৩।

৯. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, মার্চ ২০০২।

১০. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, খৃ. ২০০২-২০০৩

১১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৬৬, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৩. Thought on Economics. Vol-10, No-3 and 4, December-2002.

১৪. ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানু-জুন ২০০২।

১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, খৃ. ২০০৪।

১৬. যাকাত ফান্ড পরিচিত, যাকাত বোর্ড, বাংলাদেশ, ১৯৮৫।

১৭. বাংলাদেশ মসিজদ মিশন বুলেটিন, ঢাকা, ২০০১।

১৮. ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা, সংক্ষিপ্ত রির্পোট ২০০০-২০০১।

১৯. ওয়েলফেলয়ার প্রোগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

২২. ইসলামী ব্যাংকিং, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০০

২১. ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, দ্বিতীয় বর্ষ, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৩।

২২. দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ শে জুলাই ২০০৪ ইং।

২৩. ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ই ফা বা কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ, হি. ১৪২৪/ খৃ. ২০০৩।

২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৬৫, অক্টোবর-১৯৮০।

২৫. লিওয়া আল-ইসলাম, ম্যাগাজিন (২৯ নং প্রশ্ন), ১৯ নং সংখ্যা, ভলিউম নং-৪, হি. ১৩৭০/ খৃ. ১৯৫১।

২৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২।

২৭. পরিবেশ শিক্ষা সমাজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।